সূর্যগ্রাস

সূর্যগ্রাস

সুশীল জানা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৯

চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৫৭

প্রচ্ছদ : মনি মিত্র

দাম : তিন টাকা বার আনা

প্রকাশক : শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৯। মুদ্রাকর : শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু, জ্ঞানোদয় প্রেস, ১২নং মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

চিরতরুণ বন্ধু
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

॥ উপন্যাস ॥

বিপ্লবের ডাক—(১৮-১৯শ শতকের বিস্মৃত এক অধ্যায়)

★

মহানগরী—১ম পর্ব

★

বেলাভূমির গান

॥ গল্প ॥

গল্পময় ভারত

★

পদচিহ্ন

★

শেওলা

★

গ্রামনগর

★

ঘরের ঠিকানা

★

শ্রেষ্ঠ গল্প

★

দ্বিতীয় জীবন

১

এ সভার ইতিহাস—শহর ঘেঁষা এক পল্লীর সূর্য প্রদক্ষিণের ইতিহাস।

এক সঙ্গে এতগুলি মুখ—প্রবীণ থেকে একালের নবীনটি পর্যন্ত, মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন শিবশংকর। কেউ খ্যাতিমান, কেউ অর্থ প্রতিপত্তিতে সমাজের গণমান্য, বিদ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত—এঁরা সবাই তাঁর জীবনের দীর্ঘ সাধনার যেন এক-একটি কীর্তি চিহ্ন। যদিও এঁদের সব কোনো রকমে অনুরোধ উপরোধ করে আনা—শিবশংকর তার গূঢ় রহস্য জানেন না। একদিন এরা তাঁর ছাত্র ছিল—মাত্র এই কথাটা ভাবতে গিয়েই বুক ভরে ওঠে তাঁর। সভার এখানে ওখানে ছড়ানো এক-একটি মুখের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে এক-একটি বছর। ওই যে প্রথম সারির আধবুড়ো মুখগুলি—তাঁর প্রবীণতম ছাত্রের দল। মোক্ষদাসুন্দরী হাই স্কুলের প্রথম বছরের ছাত্র ওরা। তখন এ অঞ্চলটা শহরের উপকণ্ঠ ছাড়া কিছুই নয়। এই স্কুলের সামনের পার্কটা ছিল তখন পুকুর—তারপর মস্ত এক আমবাগান। তার ধারে পাশে কিছু কিছু গোলপাতার চালা—বস্তি। এরই মাঝখানে একটু পরিচ্ছন্ন দিক ঘেঁষে গাদাগাদি কিছু ভদ্র পরিবার। স্কুল শুরু হয়েছিল সেদিন মাত্র পঞ্চাশটি ছাত্র নিয়ে।

তারপর বছরগুলো গড়িয়ে গেল কোন দিক দিয়েঃ বালকেরা প্রবীণ হলো, হলো দশজনের একজন। এর মধ্যে বদলে গেল শহর উপকণ্ঠের মফঃস্বলী রূপ। এ অঞ্চল হয়ে গেল শহরের সেরা অঞ্চল। খানা-খাঁদ ভরিয়ে জমি হলো বাসযোগ্য, এর আমবাগানের আরণ্যক স্তব্ধতার ওপর দিয়ে ছুটে গেল নগর সভ্যতার রাজপথ। পঞ্চাশটি

মাত্র ছাত্র বেড়ে প্রথমে হলো পাঁচশ, তারপর হাজার—তারপর সকালে বিকেলে সন্ধ্যায় হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভিড়। টিনের চালা হলো কোঠা—একতলা, দোতলা—তিনতলা। অন্ধকার ভাসানো কোন আলোর বন্যা এসে পড়লো সেই একদিনের শহর ঘেঁষা গ্রামে, নথ আর নাকছাবি খসে গেল মেয়েদের নাক থেকে—ভিড় করলো পাঠশালায় ইস্কুলে, ছুটলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ...

এই গোটা পরিবর্তনটার সঙ্গে শিবশংকরের জীবন জড়িত। ছোট্ট একটা শিক্ষায়তনের মধ্যে দিয়ে যে আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল একদিন—সেখানে ছিল তাঁরও জীবন-নিংড়ানো দান।

শেষের দিকে স্বয়ং শিবশংকর কিছু বলতে উঠলেন। কিন্তু বলা হলো না। একটা আবেগের মহাপিণ্ড যেন তার গলা চেপে ধরলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরে গেল।

"ধরুন—ধরুন।"

গোটা অভিনন্দন সভা হৈ হৈ করে উঠলো। শিবশংকর পড়ে গেছেন। এমন কি সম্বিৎও হারিয়েছেন।

সভা শেষ হলো ওইখানে। কয়েকজন তরুণ ছাত্র তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো স্কুলে। কিছুক্ষণ সেবাশুশ্রূষার পর তিনি উঠে বসলেন।

স্কুলের সেক্রেটারী এবং মালিক রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমার তাঁর একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরে বললেন, "ভয় পেয়ে গেছলুম। আমাদের সময় হয়ে গেছে তো—এখন ডাক পড়লেই হলো। যাক, এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"কষ্ট!"

শিবশংকর নীরবে শুধু মাথা নাড়লেন: বোঝাতে পারবেন না—বোঝাতে পারবেন না তিনি, কষ্ট কেন—আজ বুকের মধ্যে কি আনন্দ তার!

রায় বাহাদুর বললেন, "আমার মোটর আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কষ্ট করে আর হেঁটে যাবেন না।"

শিবশংকর উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক ছাত্র গেল তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। বলা বাহুল্য—ঠিক যাওয়ার সময়ে সেক্রেটারী রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমারের মোটরটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ছেলেরা একটা রিক্সা ডেকে আনলে।

হাতে লেখা একখানা বিদায়-অভিনন্দন, এক গাছা মালা আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রায় হাজার দুই টাকা—এই নিয়ে মোক্ষদাসুন্দরী হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার শিবশংকর মুখুজ্যে অবসর পাওয়া জীবনে ঘরে এসে বসলেন। স্কুল ছিল ছোটই—এ অঞ্চলে শহর তখনো জমে ওঠেনি। তখন থেকে লেগে ছিলেন এই স্কুলে। তারপর শহর ক্রমশ জমে উঠেছে উত্তর-দক্ষিণে—স্কুলও হয়েছে বড় থেকে আরও বড় কিন্তু ছোট জীবনটা তাঁর ছোটই থেকে গেছে। যদিও শ্রম, শক্তি ও বুদ্ধি খরচ করেছেন প্রাণপাত করে। তারপর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল জীবনে। বয়স তখন সোত্তরের কাছাকাছি। সামনে অনির্দিষ্ট আবছা দিন। চোখের সামনের ঘনায়মান সন্ধ্যার মতোই।

সন্ধ্যের মুখোমুখি ছাত্ররা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল ঘরের দরোজায়। চোখ মুখ তখন তাঁর ক্লান্ত—অসুস্থ।

তবু তিনি ঘরে ঢুকলেন হাসি মুখে। মন তখনো ভরে আছে বিদায় অভিনন্দনের রচিত ভাষায় আর নানা রকম ফাঁপাই কথায়। কিন্তু তাঁর বাড়ির একতলাটা যেমন নির্জন—তেমনি ঠাণ্ডা। এখানে অভিনন্দন সভার সকলরব সম্ভাষণ নেই। গলির এক প্রান্তে শুধু কতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে হুটোপাটি করছে। ঠিক তাঁকে নয়—তাঁর হাতের মোটা মালাটা দেখেই ছুটে এলো তাঁর ছোট দুই ছেলেমেয়ে গলির এক প্রান্ত থেকে।

"কি সুন্দর মালা বাবা।" হাত বাড়ালো মিলু।

"আমাকে দাও ওটা।" লাফ দিলে বিলু।

"না—আমাকে দাও বাবা।"

অতর্কিত আক্রমণে আর টানাটানিতে মালাটা প্রায় ছেঁড়ে-ছেঁড়ে। হাত উঁচু করেও মালাটা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না—ছিঁড়ে গেল পট্ করে।

ঠাস করে চড় কষালেন ছেলেটার গালে। ছেঁড়া মালা আর ঝরা ফুল ক'টা সযত্নে কুড়িয়ে নিলেন শিবশংকর। হাঁক পাড়লেন :

"কল্যাণী!"

সাড়া নেই।

"এ-ই অবনী!"

অবনীও নেই।

"শান্তা!"

তার অস্পষ্ট গলা শোনা গেল—কিন্তু সাড়া এলো না।

"শুনছো?"

এবার সাড়া পাওয়া গেল কিছুক্ষণ বাদে। ঘরটা বড় মুখ-গোমড়া—এখানে সম্ভাষণ তো দূরের কথা—চট করে সাড়া দেওয়ারও যেন কেউ নেই। মালা-ছেঁড়া বিরক্তিতে থুৎনিটা শিবশংকরের ঝুলেই ছিল—ঘরের গুমোটভরা ঠাণ্ডা এই আবহাওয়ায় সেটা আরও কিছুটা ঝুলে পড়লো।

সাড়া দেওয়ার অনেক পরে মহামায়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হাত মুছতে মুছতে। অবাক হয়ে শিবশংকরের দিকে চেয়ে বললেন, "চেঁচাচ্ছ কেন?"

"দেখ দিকি—বাঁদরগুলো দিলে টানাটানি করে মালাটা ছিঁড়ে।" শিবশংকর মহামায়ার দিকে মালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দাও—ফুল ক'টা গেঁথে ভালো করে একটা গেরো দিয়ে দাও দিকি।"

"হ্যাঁ, আমি বুড়ো মাগী মালা গাঁথতে বসি এখন।" মহামায়া যেন বরফ জল ছিটিয়ে দিলেন। বললেন, "বুড়ো বয়সে কি তোমার মাথা-টাথা খারাপ হলো না-কি!" বলেই কিন্তু মহামায়া থম্‌কে গেলেন শিবশংকরের মারখাওয়া মুখটার দিকে চেয়ে।

শিবশংকর আঘাত খাওয়া কণ্ঠে বললেন, "কল্যাণী কোথায়?"

"সে এখন আবার থাকে কোনদিন!" মহামায়া গর্‌ গর্‌ করতে করতে মনে করিয়ে দিলেন, "সে গেছে সেই তার টাইপ না ছাই শিখতে—যেমন রোজ যায়।"

"শান্তা?"

"আর মরতে যাবে কোথায়—রান্নাঘরে।"

ইতিমধ্যেই মনে মনে যেন একেবারে নিভে গেছেন শিবশংকর। নিঃশব্দে পকেট থেকে বার করলেন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চেকটি—তুলে দিলেন মহামায়ার হাতে। শুধু বললেন, "সেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চেকটা।"

এতক্ষণে যেন সবটা মনে পড়ে গেল মহামায়ার—কাল থেকে এই লোকটার দশটা বেজে যাওয়ার তাড়া নেই: ইস্কুলে আজ বিদায়-অভিনন্দন হয়ে গেল। ওটা যেন তাঁর মনেই ছিল না।

মহামায়া হঠাৎ শিবশংকরের বিষণ্ণ করুণ বুড়ো মুখটার দিকে চেয়ে মন-মরা হয়ে যান: আজ থেকে শেষ হয়ে গেল এই লোকটার ঘড়ি-ধরা কাজ আর তড়ি-ঘড়ি। মার-খাওয়া বুড়ো মুখটার দিকে চেয়ে কি জানি মায়া হলো কি-না। গলার তিক্ততা চাপা দিয়ে যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটা সহজ সুর বেরুলো সেখান থেকে, "তোমার বিদায়-অভিনন্দন না কি বলছিলে—তা হয়ে গেল?"

"হলো বটে।" গলায় আর উত্তাপ নেই শিবশংকরের। ধীরে সুস্থে জামাটা খুলে তুলে দিলেন মহামায়ার হাতে।

মহামায়াও যে আর কি বলবেন—যেন ভেবে পেলেন না, থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো আফসোস হলো একটু মনে—পোড়া মুখটায় নরম কথা আগে যোগায়নি বলে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে করে মুখের ভাষাও যেন কেমন ত্যাড়া-বাঁকা হয়ে গেছে। কোমলতার ছোঁয়া যেন লাগতে চায় না কোনো রকমে।

সম্ভাষণ সভার বেলুনের মতো ফাঁপাই মন শিবশংকরের একেবারে চুপসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে স্তব্ধতার গুমোটের সামনে মহামায়া শুধু দাঁড়িয়েই রইলেন—সে নিস্তব্ধতাকে আর তিনি ভাঙতে পারলেন না।

ঘরের গুমোটটাকে ভেঙে দিল কল্যাণী এসে। এসেই চোখ পড়লো তার মোটা মালাগাছটার দিকে। উল্লসিত হয়ে বললে, "এইটে ফেয়ারওয়েলে তোমাকে ওরা দিলে বুঝি বাবা?—কি সুন্দর! আহা, এরি মধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছ এটাকে?" মালাটা তুলে ধরতেই ছেঁড়া প্রান্ত দুটো ঝুলে পড়লো।

কল্যাণীকে দেখে এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন শিবশংকর। মালা ছেঁড়ার ক্ষোভটা ছেলেমানুষের মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো আবার। তবু মুখে হাসি টেনে বললেন, "মিলু বিলু ছিঁড়ে দিলে টানাটানি করে। দে দিকি মা ফুল ক'টা গেঁথে একটা গেরো দিয়ে।" মহামায়ার দিকে এক লহমায় একবার চোখের কোণে তাকিয়ে শিবশংকর বললেন, "যতো হোক—শ্রদ্ধা করে দিয়েছে তো তারা।"

"নিশ্চয়ই। শ্রদ্ধা করে দিয়েছে বৈ কি। শ্রদ্ধা না করে পারে!" কল্যাণী সকলরবে বলে উঠলো, "কি না করেছ তুমি এই ইস্কুলের জন্যে! সেই টিনের চালা থেকে আজ তিনতলা বাড়ি! না খাওয়া—না ঘুম, খেটে খেটে মরেছ। আর মাইনে পেয়েছ ক'টা টাকাই বা!"

মহামায়ার হাতে ধরা তখনো সেই সারা জীবনের সঞ্চিত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চেকটি। কল্যাণীর কথায় একবার চোখ গিয়ে পড়ে সেটার ওপরে। আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহামায়া চলে গেলেন সে ঘর ছেড়ে।

কল্যাণী সোৎসাহে বললে, "তারপর? ওরা সবাই কে কি বললে বাবা—বলো সব তুমি।"

কল্যাণীর উৎসাহ আর উল্লাসে শিবশংকরের সেঁতানো উৎসাহটা আবার যেন চাঙা হয়ে ওঠে। এই দরিদ্র পরিবারটির রুদ্ধকণ্ঠ প্রাণহীন ঘরের আবহাওয়াটাকে সে তার উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে সহসা যেন উজ্জীবিত করে তোলে। হঠাৎ দেখা যায়—বাপ-বেটির উৎসাহের আর অন্ত নেই। কে কি বলেছে সে নিয়ে কল্যাণীরও যেমন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার অন্ত নেই, তেমনি শিবশংকরেরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেন মনে আছে সব। যে উত্তেজনায় মন ভরে ছিল

আজ শিবশংকরের—তা ফেটে পড়ে নতুন উৎসাহে। প্রাণভরে গল্প করেন তিনি।

সে গল্পের মাঝখানে এক সময়ে বড় ছেলে অবনী এসে যোগ দেয়, মিলু বিলু শোনে হাঁ-করে, কখন মহামায়া আর শান্তাও এসে বসে সংসারের কাজপাট শেষ করে। ছোট স্কুলটি আজ কত বড় হয়েছে—তার সঞ্চিত অর্থে আর সম্পত্তিতে! আর এ শ্রীবৃদ্ধির পেছনে আছে শিবশংকরের কত চিন্তা, কত পরিশ্রম—কত প্রাণপাত প্রচেষ্টা!—সব কথার মোদ্দা কথাটা হলো এই।

শিবশংকর বললেন, "আজ মিটিং-এ ইস্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমার মুক্তকণ্ঠে বলে গেলেন সেই সব। ঝগড়া-বিবাদ যতোই হোক—বোঝেন তো সব, কত খেটেছি ওই ইস্কুলটার জন্যে।"

কল্যাণী সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলো, "কি বললেন তিনি?"

"রায়বাহাদুর বললেন, আমার মায়ের নামে স্কুল—কিন্তু তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বল করেছেন আপনি—আপনাকে হারিয়ে স্কুল নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্তই হলো।"

কল্যাণী হেসে বললে, "এ কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমার যদুবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল?"

"না না মা—তা হয়নি, কখ্‌খনো তা হয়নি।" ঘন ঘন মাথা নেড়ে শিবশংকর একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন, "কে জানতো যদু মনে মনে অতো শ্রদ্ধা করে আমাকে! এর আগে একটা দিনের জন্যেও তো তা টের পাইনি! ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, দলাদলি হয়েছে, সেক্রেটারীর ও কানভারী করেছে কথায় কথায়—জানি, তা নিয়ে আমার যন্ত্রণারও অন্ত ছিল না। কিন্তু এইটে তো জানতুম না মা! যদু আসার সময়ে জড়িয়ে ধরে বললে—দাদা, আমি সব দিকেই ছোট—অনেক ছোট, আমাকে ক্ষমা করে যাও।" বলতে বলতে যদুবাবুর ওই ঘটনার চেয়ে সকলকে আরো অবাক করে দিয়ে শিবশংকরের চোখেই সহসা জল এসে গেল।

ছেলে মেয়ে, মায় মহামায়াও যেন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ শ্রদ্ধায় চেয়ে রইলো শিবশংকরের সহজ সরল আবেগময় মূর্তিটির দিকে।

শিবশংকর চোখ মুছে বললেন, "কত বড় ভুল থেকে ভগবান যে রক্ষা করলেন আজ—কত সহকর্মীর ওপরেই তো রাগ হয়েছে এমনি। কিন্তু আজ তাদের হৃদয়ের সাক্ষাৎ পেলুম। ওই তো রয়েছে অভিনন্দন পত্রটা—পড়ে দেখ। ভালো করে পড় দেখি অবনী।"

অভিনন্দন পত্রটার দিকে এতক্ষণ চোখ পড়েনি কারুর। পড়লেও অন্তত ওটা আর পড়ার উৎসাহ অবনীর খুব বেশী ছিল না। তবু সে গম্ভীর হয়ে ওটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলে। নিঃশব্দে মেলে ধরলে চোখের সামনে।

এই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনোভাবটা কল্যাণী নিমেষে বুঝতে পেরে সেটা ছোঁ-মেরে নিয়ে নিলে অবনীর হাত থেকে। বললে, "আমিও ভালো পড়তে পারি বাবা—শোনই-না।"—বলে একেবারে বক্তৃতার ঢঙে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল :

'সুধি!

আজ বিদায় মুহূর্তে অতীতের প্রায় অর্ধশত বৎসরের কথা স্বতঃই স্মরণে আসিতেছে। এই বিদ্যায়তনের প্রতিটি ইষ্টকের সহিত, দুর্দিনের প্রতিটি ক্ষতচিহ্নের সহিত এবং সুদিনের মহৎ কীর্তির সহিত আপনার নাম অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাই বিদায়ের ক্ষণে আমাদের হৃদয় আজ অশ্রুভারাক্রান্ত—শতধা বিদীর্ণ।' ····.

"বাস রে!" পড়তে পড়তে কল্যাণী বলে উঠলো, "কার লেখা বাবা?"

শিবশংকর বললেন, "শুনে অবাক হবি—লিখেছে ওই যদুনাথ।"

"যদুবাবু!"

"হ্যাঁ মা।" কল্যাণীর অবাক চোখের দিকে চেয়ে শিবশংকর মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, "মানুষকে এমনি ভাবেই আমরা ভুল বুঝি কল্যাণী।"

ব্যাপারটা এমনিই অপ্রত্যাশিত যে সবাই যেন তাঁর সামনে অবাক হয়ে বসে রইলো। কল্যাণী শুধু নীরবে অভিনন্দন পত্রখানি পড়ে শেষ করে রেখে দিলে টেবিলের ওপরে।

মহামায়া এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি—কিন্তু এবার কথা কইতে গিয়ে তাঁর সেই পোড়া ত্যাড়া মুখটার বাঁকা কথা ছিটকে বেরিয়ে এলো আবার। বললেন, "অতোই যদি তো ছুটি নেওয়াবার জন্যে যদুবাবুর অতো যোগসাজসই বা কেন আর একে ওকে দিয়ে অনুরোধ উপরোধই বা কেন। কি জানি বাপু!"—

এক লহমায় চটে গেলেন শিবশংকর। বললেন, "আমি ফোক্লা দাঁতে আর পড়াতে পারি না, আমি ক্লাসে ঘুমোই, আমি অংক কষাতে ভুল করি, আমি বুড়ো-হাবড়া—বলো, বলো, আরও যত সব কুচুটে কথা। ওইগুলোই হলো তোমার কাছে যতো সত্যি। বুঝলে! আর সে লোকটা, শুধু সে লোকটাই বা বলি কেন—সবাই যে আজ হায়-হায় করছে, তা কিছু না!"

কি কথায় আবার কি এসে পড়লো। অবনী ভ্রূকুটি করলে—কল্যাণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

মহামায়া বোকার মতো সহজ ভাবে বললেন, "আহা, আমি কি তাই বলছি—আমি শুধু ব্যাপারটা জানতে চাইছি।"

"তুমি থামো না মা।" কল্যাণী প্রায় জোর করে মাকে ঠেলে বার করে নিয়ে গেল।

অবনীও উঠে গেল গম্ভীর হয়ে—মায় শান্তা, মিলু ও বিলু পর্যন্ত। শিবশংকর শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বুঝবে না—এরা বুঝবে না প্রায় পঞ্চাশ বছর একটানা কর্মজীবনের পরে নতুন করে যে পরিচয় হলো পুরাতন মানুষগুলির সঙ্গে আজ—তার অগাধ আনন্দ, অপরিমেয় সুখ। আহা, তাঁর বহুদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী—যতো কর্মসহযোগীদের কোথায় যেন ছেড়ে এলেন তিনি আজ এতদিন পরে!

ঘরে ছিল শুধু কল্যাণী। তার দিকে ক্লান্ত অসহায় চোখ তুলে শিবশংকর বললেন, "তোরা বুঝবি নে—তোরা বুঝবি নে কল্যাণী।"

"আমি বুঝেছি বাবা। মা বোঝেনি—আর তিনি তোমার এ ব্যাপার বুঝবেন বা কেমন করে।" কল্যাণী বাপের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে, "আর ও সব কথা নিয়ে মাথা গরম কোরো না বাবা। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।"—

"না না—ক্লান্ত হবো কেন। এমনি মনটা খারাপ হয়ে গেল।"

কল্যাণী চোখ পাকিয়ে বললে, "ক্লান্ত হবে না! মিটিং-এর মাঝখানে মূর্চ্ছার মতো হয়েছিল তোমার—সত্যি বলবে?"

কোথা থেকে এ খবর পেল কল্যাণী! নিশ্চয়ই কোনো ছাত্র বলেছে। কল্যাণীর জেরার সামনে শিবশংকর আমতা আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ—না, মানে ঠিক মূর্চ্ছা নয়। হলো কি জানিস কল্যাণী। রায়বাহাদুরের কথা শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে দম যেন আমার বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর সবাই যখন আমাকে কিছু বলতে বললে, অমনি মাথাটা ঘুরে গেল হঠাৎ।"

কল্যাণী জেরার ভঙ্গীতে বললে, "পড়ে গেছলে। তারপর ছাত্ররা তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেছে?"

"গেছে মা।"

"তবে! চুপ করে শুয়ে থাক এখন। আর একটি কথাও বলবে না তুমি।"

কল্যাণীর এ শাসনের সামনে স্নেহকোমল দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইলেন এই দুর্বল বুড়ো মানুষটি।

২

অভিনন্দন পত্র এবং বিদায়-সভায় আভিধানিক মেজাজ আর ক'দিনই বা থাকে। ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলতে বলতে তাও পুরানো হয়ে এলো। বাপের গৌরব-কাহিনীর অমন যে অক্লান্ত শ্রোতা

কল্যাণী—সেও শিবশংকরের সহজ সরল ফাঁপাই মেজাজটাকে টিকিয়ে রাখতে পারলে না। শরীরের দিক থেকেও, প্রথম শীতের আক্রমণে কিছুটা কাবু হয়ে পড়লেন শিবশংকর। বুড়ো মানুষ—শ্লেষ্মার ধাত। তার ওপর সেই অভিনন্দন সভায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার পর থেকে তাঁর দৈহিক দুর্বলতাও যেন আর যাচ্ছে না কিছুতে। বরং বিছানায় পড়ে পড়ে টেনে নিয়ে চলেছেন সেটাকে দিনের পর দিন।

এ সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির জীবনে ছুটি হয়ে গেছে—এ মর্মান্তিক সত্যটাকে হাজার মিথ্যে দিয়েও আর ঢেকে রাখা যায় না। তেমনি আরও মর্মান্তিক ছোট দুটি ছেলেমেয়ে মিলু-বিলুর দাবি, ডাগর হয়ে ওঠা শান্তার দাবি। এর ওপর বেকার অবনী। বছরখানেক আইন পড়ার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়ে—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণ একটা ডিগ্রী নিয়ে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে সে—করতে পারছে না কিছুই। সংসারে পুঁজি মাত্র ওই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার দুই টাকা।

প্রথম দিকে মনের ফাঁপাই অবস্থায় শিবশংকর মহামায়ার সমস্ত দুশ্চিন্তা চাপা দিয়ে বলেছেন, "অতো ভাবনার কিছু নেই—থামো। তুমিই শুধু তোমার পোড়া কপালটাই দেখো—আর অন্যে তার ঈর্ষা করে। বলে—ছেলে এম. এ. পাস, বড় মেয়ে একটাকেও যতো হোক বসিয়ে রেখেছে বি. এ. পাস করিয়ে।"

"অবনী তো কিছুই করতে পারছে না, আর মেয়ে কি তোমার চাকরি করবে না-কি?" মহামায়ার ক্রোধ আর বিরক্তি চাপা থাকে না।

"নিশ্চয়ই নয়—নিশ্চয়ই নয়।" ব্যাপারটা সুবিধের দিকে যাচ্ছে না বলে সজোরে মাথা নেড়েছেন শিবশংকর। কারণ কল্যাণীর লেখাপড়া নিয়ে, উচ্চশিক্ষা নিয়ে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেছে মহামায়ার সঙ্গে। এ সবের মধ্যে তীক্ষ্ণধী মেয়েটা কান্নাকাটি করে জিতে গেছে শুধু বাপের কাছে—মায়ের কাছে নয়। কিন্তু কথায় কথায় চাকরি করা সম্পর্কে কি বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়লো সেদিন

আবার সেই মেয়েকে নিয়ে! শিবশংকর তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলে নিয়ে বললেন, "রসো—সবুর করো ছুটো দিন। বলি ছাত্র পড়িয়েও তো তোমার দুঃখ ঘোচাতে পারবো কিছুটা। ইস্কুলে না হয় ছুটি হয়ে গেল—কিন্তু শিবশংকর মুখুজ্যে বেঁচে থাকবে যতোদিন ততোদিন ছাত্ররা আর তার অভিভাবকরা কি রেহাই দেবে তাকে! ম্যাট্রিকের দরোজাটা পার হওয়ার জন্যে ধর্ণা দিতে হবে না শিবশংকরের দরোজায়?"

এ সব কথা শিবশংকরও বলেছেন বড় গলা করে এবং মহামায়াও তখনকার মতো বুঝেছেন একটা কিছু। কিন্তু দিন গেল—টিউসনী একটাও এলো না। বরং শিবশংকর গোপনে খবর পেতে লাগলেন—উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা আর তার আধুনিক অভিভাবকেরা ছোকরা মাস্টারদের দিকেই নজর দিয়েছে বেশী। সেকেলে এই বুড়ো মাস্টারটির পাশেও ঘেঁষছে না কেউ। প্রথমে ক্রোধ, তারপর অভিমান—তারপর শিবশংকর ক্ষোভে দুঃখে সব ব্যাপারে নিরাসক্ত হতে লাগলেন। তাঁর আর কালোচিত যোগ্যতা নেই—এই পুরানো কথাটা যতোই কানে আসতে লাগলো, ততোই তিনি দিন দিন মন-মরা হয়ে যেতে লাগলেন।

তবু এই মরা মন আর দুর্বল দেহ নিয়ে চাঙা হয়ে উঠে বসলেন তিনি একদিন।

শেষ পর্যন্ত এলো এক টিউসনী। স্বয়ং একজন অভিভাবকই সত্যি সত্যি একদিন তাঁর দরোজায় এসে হাজির। প্রায় তাঁরই মতো বয়স—কিছু বা কম হবে, পোশাকী ধনী মানুষ। শিবশংকর অসুস্থ শরীরটাকে টেনে তুলে গম্ভীর হয়ে তাঁকে বসালেন।

আগন্তুক বললেন, "আমার ছোট মেয়েগুলির ভার নিতে হবে আপনাকে। সেই জন্যে বিরক্ত করতে এলুম।"

"ছোট ছেলে মেয়ে!"

কি বলবেন শিবশংকর? ছোট ছেলেমেয়ে আমি পড়াই না?

কিছুক্ষণ শিবশংকর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কিন্তু শিবশংকর বুঝতে পারছেন—মহামায়া নির্ঘাৎ দরোজার আড়ালে ওৎ পেতে আছে। শিবশংকর জোর করে একটু সম্মতির হাসি হাসলেন। বললেন, "নোব বৈ কি—জীবন তো গেল এই নিয়ে।"

আগন্তুক বলে চললেন, "মেয়ে ক'টির মধ্যে একটি চোদ্দয় পা দিল—আর দুটি আরও ছোট। তা ওদের মধ্যে বড়টিকে নিয়েই ভাবনা—তাকে এই সময়েই সুশিক্ষা দিতে হবে তো। ছেলে-ছোকরা মাস্টারদের আমি বিশ্বাস করি না মশাই, আমার খোলা কথা।"

মনে মনে চটতে লাগলেন শিবশংকর—উদ্ভিন্ন তরুণীর শিক্ষার জন্যে বুড়ো মাস্টারের কাছে আসার এই মতলবে।

তিনি আরও চটে উঠলেন আগন্তুক ভদ্রলোক যখন নিজে থেকেই বললেন, "আমি তো বড় মেয়েটিকে নিয়ে মহা চিন্তাতেই পড়ে গেছলুম মশায়। তারপর যদুনাথবাবু বললেন আপনার কথা। একটি ছেলে আমার ম্যাট্রিক দেবে—সে ওঁর কাছেই পড়ে কি-না। ওঁর কাছেই শুনলুম আপনার কথা। শুনলুম—বুড়ো মানুষ, ইস্কুলও ছেড়ে দিয়েছেন আপনি"—

আর কিছু বলা হলো না—এবার রাগে ফেটে পড়লেন প্রায় শিবশংকর। বললেন, "পড়াতে পারবো না আমি।"

"সে কি! আগে যে বললেন"—

"উঠে যান আপনি। উঠে যান।"—

ভদ্রলোক হাঁ-করে তাকিয়ে রইলেন।

শিবশংকর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। এলোমেলো ভাবে বলে উঠলেন, "বলে দেবেন আপনার সেই যদুনাথকে—হাঁ, বলে দেবেন, নিচু ক্লাসের মেয়ে আমি পড়াই না। হ্যাঁ—বলে দেবেন।" বলতে বলতে শিবশংকর রাগে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরের ঘর ছেড়ে বিষম পদক্ষেপে অন্দরে প্রবেশ করলেন।

হয়তো অবাক্ ও কিছুটা বিরক্ত হয়েই ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিন্তু তাকে এড়িয়ে পালিয়ে এসেই তো রক্ষা নেই শিবশংকরের।

এসে পড়ে গেলেন মহামায়ার সামনে। কিন্তু মহামায়া কিছু বলবার আগেই ফেটে 'পড়লেন' শিবশংকর, "আমাকে অপমান! আমি বুঝি না!"

"হলো কি!" মহামায়া শুধালেন।

শিবশংকর বললেন, "এ সেই যেদোটার কাণ্ড।"

মহামায়া শুধু ক্লান্ত গলায় বললেন, "এই শুনি—তোমার যদুনাথ ভালো, এই আবার"—

"বুঝিনি আমি—হতভাগা যেদোটার শয়তানী বুঝতে পারিনি আমি। হতভাগা, ম্যাট্রিক পড়াবার বেলা তুমি আর এণ্ডিগেণ্ডি পড়াবার বেলা আমি!"

"তা ভদ্রলোক একজনকে তুমি অমনি ভাবে তাড়িয়ে দিলে! আমি আরো চা পাঠাচ্ছিলুম একটু"—

"চা! আবার চা খাবে! গলা-ধাক্কা খায়নি যে আমার কাছে"—

"ছি ছি! ভদ্রলোক"—

"রাখো তোমার ভদ্রলোক। মেয়ের উঠতি বয়সের ভয়ে এসেছে বুড়ো শিবশংকরের কাছে। সে বেলা আর ওই হারামজাদা যেদোটার ধারপাশেও নয়।"

চেঁচামেচিতে ছুটে এলো ছেলেমেয়েরা—গোলমালের গন্ধে অবনী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে ভ্রূকুটি করে। গোলমাল শান্ত হলো কল্যাণী ছুটে আসায়।

"হলো কি বাবা?"

"দেখো দিকি মা—হতভাগা যেদোটা"—

কল্যাণী বাপকে জোর করে বাইরের ঘরে ঠেলে নিয়ে চললো, "আমি জানি বাবা—সব জানি।"

শিবশংকরের গলা নরম হয়ে যায় সহসা। বললেন, "জানিস তুই!"

"জানতুম বাবা—তোমাকে বলিনি মনে কষ্ট পাবে বলে।"

"এই দেখ, তুই জানতিস—কিন্তু তোর মা জানতো না।"

"বাইরে কোথায় কি হয়—তার খবর মা কেমন করে জানবে বাবা। ছি ছি—কাঁপছো তুমি এখনো। একে শরীর তোমার ভালো নেই। চলো—শুয়ে পড়বে চলো।" কল্যাণী বাপকে খাটের উপর শুইয়ে শান্ত করে বললে, "টিউসনী-টুনি তোমাকে আর করতে হবে না বাবা। এবার তোমার ছুটি—বাস্। চুপ করে শুয়ে থাকবে।"

শিবশংকর গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কল্যাণী নীরবে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। কি ভাবতে ভাবতে শিবশংকর তলিয়ে গেলেন যেন নিজের মধ্যে—চোখ ছুটো স্বপ্ন দেখার মতো আচ্ছন্ন। হয়তো সে তাঁর সুদূর অতীতে—যখন এই দরিদ্র মানুষটার আশা আশ্বাসে ছিল অগাধ সম্ভাবনার স্বপ্ন—অথবা হয়তো তাঁর বার্ধক্যের ভাবী কালে—যখন সমস্ত স্বপ্নের শেষ হয়ে গেছে। নিজেরি অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শিবশংকর।

কল্যাণী হেসে বললে, "এখনো তুমি ওই সব যা-তা ভাবছো বাবা।"

এই মেয়েটির বেদনা-কাতর অন্তরটিকে চিরদিন যেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করতে পারেন শিবশংকর। দুঃখ ও আঘাত খাওয়া বুড়ো জীর্ণ মুখটায় জোর করে হাসি টেনে বললেন, "যা তা ভাববো কেন মা—ভাবছিলুম তোদের কথাই, এই তোরই কথা।"

"আমাকে নিয়ে তোমার খুব ভাবনা—না বাবা?"

"ভাবিই তো।" শিবশংকর একটু ম্লান হেসে বললেন, "ভাবি—তোর মতো করে সব কটিকে গড়ে তুলতে পারিনি বলে, আর হয়তো পারলুমও না—সময় ফুরিয়ে এলো।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শিবশংকর একটু থেমে আবার বললেন, "তবু আমি যতোটুকু পেরেছি—করেছি তোদের জন্যে, চেষ্টা করেছি তোদের মানুষ করতে।"

"করেছই তো, তোমার যা করবার তা সবই করেছ। এবার যা করবার তা আমাদের করতে দাও।" বলেই কল্যাণী হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে থেমে গেল মুহূর্তের জন্যে। ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে আবার, "তোমার ঋণ শোধ করবো—এ আমার কপালে কিন্তু নেই

বাবা।. হয়তো দাদা করবে কিছুটা—বড় হয়ে করবে বিলুও। আর আমি, শান্তা, মিলু—তোমার মেয়েরা, শুধু ঋণের বোঝাই বাড়িয়ে যাবো। মাঝে মাঝে নিজের অক্ষম ভাগ্যের জন্যে কান্না পায় আমার। আমি যদি তোমার ছেলে হতুম বাবা!"

এই মেয়েটার সহজ সরল কথাগুলো—তার ক্ষোভ ও আশা, শিবশংকরকে যেন ছুরির ফলার মতো বেঁধে। ওর কথার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত দুঃখের টান—যেটা বড় বেয়াড়া লাগে শিবশংকরের কানে। সব ক'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে কল্যাণী তাঁর মনের বিশেষ একটি স্থান জুড়ে আছে। শিবশংকর গভীর চোখে তাকালেন মেয়ের দিকে—যেন বুঝতে চেষ্টা করেন কল্যাণীর জীবনের গভীর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে—কোথায় ওর একটা অন্তর্বেদনা যেন লুকানো আছে। এক ঝলকে এই ভাগ্যহারা মেয়েটার গোটা জীবনটা তাঁর চোখের সামনে ঝলক দিয়ে ওঠে। কেবলি তাঁর মনে হতে থাকে—তিনি পারেননি, ওকে লেখাপড়াই শেখান আর যাই করুন—ওর অন্তর্বেদনার সামান্য লেশটুকুও মুছে দিতে পারেননি। গোঁড়া পণ্ডিতের মেয়ে মহামায়ার সঙ্গে বহুদিন বহু ঝগড়া-ঝাঁটি করে এই মেয়েটিকে পড়িয়েছেন তিনি বি. এ. পর্যন্ত—আর পারেননি, তাঁর ছুটি হয়ে গেল। তবু যতোটা পেরেছেন তিনি করেছেন প্রাণপণে। কিন্তু হঠাৎ আজ ওর বিষণ্ণ মুখ আর বেদনাঘন কথার টানে মনে হয় তাঁর—সব চেষ্টা হয়তো তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। ওই শিক্ষাদীক্ষায় শুধু মেয়েকেই নয়—যেন নিজেকেও ভোলাতে চেয়েছেন তিনি, আর কিছু নয়, আর কিছুই পারেননি। কচি মেয়ে বলে যতোই একদিন তাকে থান না পরিয়ে থাকুন, যতোই তাকে ভুলিয়ে থাকুন শিক্ষায়, বেশবাসে—এ তাঁর সেই বিধবা মেয়ে, যার বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে আর বিধবা হয়েছে পনেরোয়। বার বার তাঁর এই কথাটাই মনে হতে লাগলো—শিক্ষাই দিন আর যা দিয়েই ভোলান, বৈধব্যের দুঃখকে তিনি ভোলাতে পারেননি। তার অক্ষম ভাগ্যের বেদনার রূপ ধরে আজ সহসা সেই কথাটা বোধ করি প্রকাশ হয়ে পড়লো।

সুড়ঙ্গের মতো সুদীর্ঘ গলিটা জুড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার এখন ঘনঘোর হয়ে আসছে। মহামায়ার সঙ্গে সামান্য একটা কলহ চেঁচামেচির পর এ বাড়ির ঠাণ্ডা নিচের তলাটা তার অন্ধকারতম খান দুই ঘর আর একটু বারান্দা নিয়ে থমথম করছে। ক্রুদ্ধ মহামায়া, ঘরন্তি শান্তা, মিলু আর বিলু—সবাই যেন এর মধ্যে হারিয়ে গেছে কোথায়। পাতলা অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা-পড়া নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু বিষণ্ণ কল্যাণী বসে আছে মূর্তিমতী নিঃসঙ্গ দুঃখের মতো।

"অবনী আছ ?"

বাইরে ডাক শোনা গেল এমন সময়ে।

কল্যাণী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। একজনের গলার সাড়ায় আর একজনের চোখ মুখ কতখানি সচকিত হয়ে উঠতে পারে—তেমন সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার শিবশংকরের চোখে পড়ার কথা নয়। শিবশংকরের ধ্যানমগ্ন বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে সোৎসাহে কল্যাণী বললে, "নরেনদা এলো বোধ হয় বাবা।"

"নরেন! কোথায় ?" শিবশংকর এ ঘরের বদ্ধ গুমোটের মধ্যে হঠাৎ উৎসাহ বোধ করেন ভয়ানক। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বললেন, "ওকে ডেকে দে কল্যাণী।" শিবশংকর শুয়ে ছিলেন—উঠে বসলেন।

নরেন ঘরে এসে ঢুকতেই শিবশংকরের ব্যক্তিগত ক্ষোভ জেগে উঠলো আবার। বললেন, "যেদোটার কাণ্ড শুনেছ নরেন ?"

"বাবা!" কল্যাণী ভ্রূকুটি করলে।

শিবশংকর লজ্জা পেয়েই যেন বললেন, "আচ্ছা থাক ও-সব কথা, থাক ও হতচ্ছাড়াদের কথা।"

অবনীর বন্ধু নরেন, শিবশংকরের পুরানো ছাত্রও—অতএব যদুনাথের নামের সঙ্গে আগে থেকেই সে পরিচিত, পরিচিত সে শিবশংকরের হঠাৎ ফেটে-পড়া ক্রোধের সঙ্গেও। কল্যাণীর ভ্রূকুটি এবং শিবশংকরের ক্রোধ থেকে কিছুটা সে আঁচ করে নিলে সহজেই। একটু হেসে বললে, "আপনার ছুটি হয়ে গেছে—ব্যাস্। ওদের সঙ্গে আপনার আর সম্পর্কই বা কি।"

"ঠিক—সম্পর্কই বা কি।" শিবশংকর মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক বলেছ।"

"স্কুলের কোনো কথাতেই আর আপনার থাকা উচিত নয় মাস্টার মশায়।" নরেন বললে, "দলাদলির মধ্যে পড়ে অকারণ শুধু আপনি আঘাত পাবেন।"

"ঠিক বলেছে নরেন—ইচ্ছে ক'রে ক'রেই ওরা সবাই যেন আমাকে আঘাত দেয়।" শিবশংকর বললেন, "তোমরা আমার ছাত্র —তোমরা তো জানো, এই স্কুলের জন্যে আমি কি না করেছি। জীবনপাত করেছি নিজের।"

"আর না—এবার ছুটি আপনার। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেয়ে গেছেন তো?"

"হ্যাঁ, ফেয়ারওয়েলের দিনই সেটা দিয়ে দিয়েছে।" শিবশংকর বললেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "ওই আমার সারা জীবনের সঞ্চিত ধন!"

এই বুড়ো মানুষটির বিষণ্ণ গলায় কথাটা এমনি শোনায় যে নরেন সহসা আর কোনো কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর আস্তে আস্তে বললে, "পরের ভাবনা পরের মানুষদের—ছেলে-মেয়েদের তা ভাবতে দিন মাস্টার মশায়।"

"ওই কথা কল্যাণীও বলছিল এই একটু আগে। কিন্তু কি করবে সে? চাকরি করবে?" বলে শিবশংকর জোর করে একটু হেসে উঠলেন।

"কেন করবে না?" নরেন বললে, "তবে লেখাপড়া শেখালেন কেন? স্টেনো-টাইপ শিখতেই বা পাঠালেন কেন?"

"ও তোমরা বললে—তাই। মানে"—শিবশংকর আমতা আমতা করে বললেন, "ঠিক সে চাকরি করবে, এ আমি ভাবিনে, নিজেও তখনও ভয়ানক ঝোঁক ধরলো ওটা শিখবে বলে। আর জানোই তো—ওর কোনো সাধ আমি আজ পর্যন্ত অপূরণ রাখিনি।"

"ও হলো আপনার শখ মেটানোর কথা মাস্টার মশায়—আমি বলছি প্রয়োজনের কথা, জীবন-যুদ্ধের কথা।"

"তোমাদের এ কালের ওই কথাটা মানিনে—তা নয়, মর্মে মর্মেই বুঝি।" শিবশংকর বললেন আস্তে আস্তে, "কিন্তু ওই যুদ্ধে কি মেয়েদেরও লাগাবে, ক্ষতবিক্ষত করবে নরেন? কোথায় থাকবে তোমাদের ঘরের একটু সুখ—একটু শান্তির কোণ?"

"এ কালের বাঁচার তাগিদই ওদের টেনে-হিঁচড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় মাস্টার মশায়, আমাদের পাঠানো না-পাঠানোর তোয়াক্কা রাখে না।" নরেন বললে, "কিন্তু আমি বিশেষ করে বলছি মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা। তাদের কোনো শিক্ষা, কোনো দীক্ষাই সম্পূর্ণ হবে না—যতো দিন না তারা অন্তত আত্মনির্ভর হতে শেখে।"

তর্কবাজ এ ছাত্রটির সঙ্গে তর্ক করে আনন্দ পান চিরদিন শিবশংকর—উত্তেজনা বোধ করেন। তাই ডেকে ডেকে তর্কও করেন। আজও সেই তর্কের ধারা গড়িয়ে চললো এঁকে বেঁকে—নানা পথে। নরেনের অনেক কথা হয়তো মেনেও নেন তিনি কিন্তু সবটা যখন কল্যাণীর জীবনে আরোপ করে দেখেন তখন প্রথমেই যে ভয়ংকর মুখটা চোখের ওপরে ভেসে ওঠে তা হলো গোঁড়া কুলীন পণ্ডিতের মেয়ে মহামায়ার। তারপর এগিয়ে আর ভাবতেও পারেন না। নরেনের জোরালো গলার তর্কে শিবশংকর সভয়ে বললেন, "আস্তে নরেন—আস্তে। তোমার খুড়িমা শুনে ফেলবেন।"

নরেন দমে গিয়ে চুপ করে গেল।

এই কিছুক্ষণ আগে কল্যাণীর যে বিষণ্ণ মূর্তিটি বসে ছিল শিবশংকরের সামনে—সে মূর্তিটি এখনো লেগে আছে তাঁর মনের চোখে। কোথায় যেন একটা চাপা দুঃখ লুকানো আছে মেয়েটার! নরেনের কথা ভাবতে ভাবতে শিবশংকর বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক নরেন—শিক্ষাতেই সব অন্ধকারের শেষ হয় না, কাজও চাই। অন্ধকারকে চিনতে শিখলে বিত্তের শেষ হয় হয়তো—কিন্তু

তাকে ঠেলে না বার করলে দায়িত্বের শেষ হয় না। তাই হয়তো কল্যাণী আজ এতো দুঃখ করছিল। সে দুঃখটা ঠিক কিসের জানি নে। তবে বুঝলুম একটা কিছু আছে।"

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নরেন হঠাৎ একটু সঙ্কোচ বোধ করে। সে চুপ করে রইলো।

শিবশংকর অন্যমনে বললেন, "তা হলে কল্যাণীর চাকরি করা তুমি সমর্থন করো?"

"করি বৈ কি মাস্টার মশায়।" নরেন জোর দিয়ে বললে।

শিবশংকর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কি জানি—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পেরেছি—একালে চিতা সাজিয়ে সহমরণে না হয় ওদের না-ই পাঠালুম, কিন্তু জ্বলেপুড়ে সেই ওরা মরেই, শিক্ষাদীক্ষা যা-ই দেওয়া হোক।"

শিবশংকর যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর বিষণ্ণ বিধবা মেয়েটাকে—চিরকালের সেই ভাগ্যহত অন্ধ এক জীবন-পথে অবরুদ্ধ—নিঃসঙ্গ।

এই সময় দু'পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো কল্যাণী। চা দিয়ে বাপের পাশ ঘেঁষে বসলো নিঃশব্দে।

শিবশংকর নিজের কথার রেশ টেনে আস্তে আস্তে বললেন, "জানো নরেন—আমাদের বংশের মস্ত একটা দোষ আছে? গোঁড়া কুলীন পণ্ডিতের মেয়ে মহামায়াকে বিয়ে করতে গিয়ে লেগে গেল সেই দোষ নিয়ে গোলমাল। বিয়ে প্রায় ভাঙে ভাঙে। জানোই তো—এ সব ব্যাপার তখন হামেশাই ঘটতো। সাক্ষী প্রমাণ সহ দোষ বেরিয়ে পড়লো আমাদের বংশের। আমার প্রপিতামহী সহমরণে গিয়েছিলেন—আলতা-পরা পায়ের ছাপ এখনো আছে তাঁর। কিন্তু সে খবর নাকি খাঁটি নয়। তাঁকে চিতায় তুলে দড়াদড়ি বেঁধে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চিতায় আগুন ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে এলো প্রচণ্ড ঝড়, সময়টা ছিল নাকি কাল-বৈশাখীর। ঝড়জলের ভয়ে চিতা ছেড়ে

পালালো সবাই। কিন্তু সে-সব থেমে যাওয়ার পর সবাই এসে দেখলো—বউ নেই, চিতাটা শুধু জ্বলছে ধিকি ধিকি।"

কল্যাণী সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলে, "দড়ি দিয়ে বাঁধতো কেন বাবা?"

"না বাঁধলে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণায় পালায় যদি। অবিশ্যি তার আগে তাকে সাজাতো বিয়ের কনের মতো, পায়ে দিত আলতা কপালে সিঁদুরের টিপ।"

"কি সাংঘাতিক!" কল্যাণী শিউরে উঠে বললে, "তবে যে শোনা যায়, সহমরণে যেত হাসি মুখে!"

"গেলেও দেহ থাকলে তার যন্ত্রণা কোথায় যাবে মা।" শিবশংকর বললেন, "তাই যন্ত্রণার সে আর্তনাদকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যে ঢাক-ঢোল কাঁসর বাজিয়ে উৎসবের তাণ্ডব লাগানো হতো।"

"মা গো!"—

"ওই আর্তনাদ শুনেই তো মন টলেছিল রামমোহনের, মা। আমাদের গোঁড়া কুলীনের গাঁয়ে ছুটে গেছলেন তিনি। তাঁর আকর্ষণে আমার এক পিতামহ ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন।"

কল্যাণীর মন ঘুরছে তখন কোথায় কোন সেই চিতার ধারে। বললে, "তোমার সেই প্রপিতামহীর কথা বলো বাবা। শেষ পর্যন্ত তিনি কি তা হলে পুড়ে মরেননি?"

"না মা।" শিবশংকর বললেন, "ভেবে ছাখ—কি যন্ত্রণায় ছুটে পালিয়েছে মেয়েটা। দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল—পাছে চিতা ছেড়ে পালায়। ঢাকঢোল কাঁসর বাজাতো—পাছে তার আর্তনাদ শোনা যায়। দরকার হলে মড়া-খোঁচান বাঁশের খোঁচাও পড়তো—এও শুনেছি।"

"মা গো!" কল্যাণী শিউরে উঠলো আবার।

"অবিশ্যি তাঁর আলতা-পরা পায়ের ছাপটা বাড়ির বউরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় ছুঁইয়ে এসেছে চিরকাল। উত্তরাধিকার হিসেবে ঠাকুমা দিয়ে গেছেন মায়ের হাতে, মা দিয়ে গেছেন মহামায়ার হাতে। বাড়ির বউরা জেনে এসেছে—তিনি সহমরণেই মরেছেন।"

"তা হলে মিছে কথা।" কল্যাণীর কণ্ঠে অদম্য কৌতূহল।

"তাই।" শিবশংকর বললেন, "শত্রুপক্ষের লোক বলে—সেই আধ পোড়া মেয়েটা কোন এক গোরার আশ্রয়ে কাটিয়েছিলেন বাকী জীবন।"

বেদনায় ছায়াম্লান কল্যাণীর চোখ দুটো যেন আটকে গেছে কোন সুদূর অতীতে। নরেনের মুখে কোনো কথা নেই। শুধু তার গভীর চোখে একটা চাপা উত্তেজনা।

শিবশংকর নরেনের দিকে চেয়ে বললেন, "এমনি কতো অঘটনের পর শেষকালে আইন করে উঠে গেল সতীদাহ।"

নরেন উত্তেজিত গলায় বললে, "সেইখানে কি শেষ হয়েছে আমাদের মেয়েদের দুঃখ মাস্টার মশায়। তারপর আজ পর্যন্ত কি তাদের প্রতিদিন জ্যান্ত পোড়াচ্ছি না?"

তার কথা, তার উত্তেজিত মন্তব্য চঞ্চল করে তোলে আর একজনকে—সে কল্যাণী।

শিবশংকর বললেন, "পোড়াচ্ছি নরেন—পোড়াচ্ছি তাদের প্রতিদিনের সহমরণে, তাদের বৈধব্যের যন্ত্রণায়। সে যন্ত্রণা শুনতে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তখনকার ডামাডোলে আইনও হলো বটে —কিন্তু ওই পর্যন্ত। আধুনিক কালে সমস্যাটা হয়তো পুরানো হয়ে গেছে—কিন্তু শেষ হয়নি, সমাধান হয়নি নরেন।"

"হওয়া কি উচিত নয় মাস্টার মশায়?"

কল্যাণী কেঁপে উঠলো অন্তরে।

শিবশংকর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "উচিত বৈ কি নরেন—আমাদের অন্দরমহলের অন্ধকারে সহমরণের চিতার জ্বালা আজও শেষ হয়নি, শেষ হওয়া উচিত।"

নরেন বললে, "পুরুষদের ওই ধরনের শুভেচ্ছায় অন্দরের মেয়েদের চিতা কোনো দিন কি নিভবে মাস্টার মশায়?"

কল্যাণী চঞ্চল।

শিবশংকর বললেন বিষণ্ণ গলায়, "নেভেনি তো।" বলে পলকের জন্য তার চোখ গিয়ে পড়ে কল্যাণীর দিকে।

নরেন উত্তেজিত গলায় বললে, "যাদের বাঁচার কথা—তারাই যদি বাঁচতে না চায়, বাঁচার আনন্দ আর প্রতিষ্ঠার জন্যে তারাই যতো দিন না উঠে দাঁড়ায় ততোদিন ও হাজার শুভেচ্ছায় আর আইনে কিছুই হবে না।"

নরেনের কথার প্রতিটি ঝোঁক আর তরঙ্গ কল্যাণীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে দ্রুততর করে তোলে। চোখে যেন তার কিসের দীপ্তি : বাঁচার উচ্ছ্বাস বুঝিবা।

শিবশংকর ক্লান্ত গলায় বললেন, "সেই কথাটাই আজ ভাবছিলুম নরেন। তাই বলছিলুম"—

কিন্তু তিনি আর কি বলতে যাচ্ছিলেন—তা আর শোনা হলো না। মহামায়ার গলার সাড়ায় মুখ তাঁর পাংশু হয়ে গেল।

"কল্যাণী!" ভেতর থেকে শোনা গেল মহামায়ার ঝাঁঝালো গলা, "কি করছিস তুই ওখানে?"

তটস্থ হয়ে পড়ে ঘরের সব ক'জনাই। কল্যাণী বেরিয়ে গেল নীরবে। নরেন চঞ্চল। হঠাৎ খুব অসহায় মনে হয় শিবশংকরকেও। মনে মনে তিনিই শুধু বুঝলেন—মহামায়া তাদের সমস্ত আলোচনাই শুনেছেন। এর পরে তর্ক-আলোচনা আর জমে না।

নরেন চটপট বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মহামায়া ঢুকলেন ঘরে। শিবশংকর নিশব্দে চোখ বুজলেন।

এবার শিবশংকর একা পড়ে গেলেন মহামায়ার কাছে। তাঁর অসহায়তা ঢাকবার জন্যে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে তিনি খানিকটা শুধু চেঁচামেচিই করতে পারেন মহামায়ার কথায়—চেঁচিয়ে তাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে পারেন। কিন্তু চেঁচাতে ইচ্ছে করে না আর—নিজেকে ভয়ানক ক্লান্ত মনে হয় তাঁর। সারা জীবনই তো তিনি খাড়া থেকে চেঁচামেচি করেছেন—ফল কিছুই হয়নি। সেই মুহূর্তে এইটাই বার বার মনে হতে লাগলো তাঁর।

মহামায়া শুধোলেন, "মেয়েটিকে তা হলে চাকরিতে লাগাচ্ছো?"

শিবশংকর ক্লান্ত ভাবে বললেন, "না—তেমন তো কিছু ঠিক হয়নি। তবে মনে হচ্ছে—করলোই বা চাকরি।"

"তারপর।"

"তারপর কি!"

"এই বিধবা মেয়েটির সর্বনাশ আর কত ভাবে করবে?"

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাতে শিবশংকর বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইলেন।

"অনেকটা পর্যন্ত সহ্য করেছি আমি—আর নয়।" মহামায়া কঠোর ভাবে বললেন, "ওর ওই টাইপ না ছাই শেখার পেছনে নরেনের যে একটা মতলব ছিল—এ আমার তখনই মনে হয়েছিল।"

"কি বলছো তুমি মহামায়া!" লজ্জায় ধিক্কারে শিবশংকর প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

"হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। তোমার ওই ছাত্রটির আসা-যাওয়া আমার ভালো লাগে না—ভালো লাগে না ওর কথাবার্তা। আমার সোজা কথা।"

শিবশংকর একটা নোংরামির আতঙ্কে চুপ করে রইলেন।

মহামায়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "লজ্জা করে না তোমার—সেই এক ভাগ্যবতীর আলতা-পরা পায়ের ছাপকে মিথ্যে বলে বিধবা মেয়ের কাছে গল্প করতে, ঘেন্নাও হয় না নিজের বংশের দোষ বলে তাকে জাহির করতে! চুলোয় যাক তোমার বংশের কথা—বিধবা মেয়ের সামনে যতো নোংরা কথা বলতে সংকোচ হয় না তোমার!"

শিবশংকর স্তব্ধ।

যে মহামায়া সুদূর বংশধারার পুণ্য উত্তরাধিকার হিসাবে বহন করে নিয়ে চলেছে সেই সহমৃতার আলতা-পরা পায়ের ছাপ, তার সমস্ত বিশ্বাসে আঘাত পড়েছে আজ। ক্রুদ্ধ মহামায়া বলে চললেন, "মেয়েকে বিধবার থান পরালে না—বললে, আহা কচি মেয়ে—দুটো ভালো জিনিস সাধ করে পরুক। গেল যাক। ইস্কুল কলেজে

পড়াতে লাগলে—কি-না, কিছু নিয়ে ভুলে থাকুক। তখনো চুপ করে থেকেছি। নরেন এসে মতলব দিলে টাইপ না ছাই শেখবার, তখনো কিছুই বলিনি। বাকি সর্বনাশটুকু করবার জন্য শেষ পর্যন্ত তুমিও কিনা সেই মহাপুণ্যবতীর কেচ্ছা গাইতে বসলে আজ।"

শিবশংকর আর্তনাদ করে উঠলেন, "যাও, যাও—তুমি যাও।"

আঘাতে আঘাতে কঠোর হয়ে উঠতে চাইলেও পারলেন না শিবশংকর। হ্যাঁ—মেয়ে তার বিধবা, ভাগ্য তার অবরুদ্ধ—পথ নেই ··· পথ নেই। চিরকালের বন্ধ দরোজাটাকে খুলে ঠেলে কোথায় চলে যাবে সে! কে জানে! কোথায় যাবে? দ্বিধায় দ্বন্দ্বে—ভয়ে সংশয়ে—শিবশংকরের চোখের সামনে কল্যাণীর অতীত ভবিষ্যৎ, সব একাকার হয়ে যায়। নরেনের কোনো কথা—কোনো যুক্তি আর মাথায় আসে না। সমস্ত যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে সংস্কারের মূর্ত প্রতীক ক্রুদ্ধ মহামায়ার সামনে এই সেকেলে মানুষটির নিজেকে শুধু ভয়ানক দুর্বল মনে হয়।

ঠিক তখনই পাশের একটা কোণের ঘরে হতচকিত কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। অজ্ঞাতে কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে যেন—এবং কবে থেকে পলে পলে সভ্য ও সুন্দর মানব-সমাজ থেকে পরম ঘৃণা ও ধিক্কারে তার বিদায় ঘটেছে। আজ মায়ের কথায় নিজের দিকে সে ফিরে তাকালে এবং গ্লানিতে মন তার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মহামায়ার কথাগুলো গলানো সীসার মতো তার কাণে এসে ঢুকতে লাগলো।

আর ঠিক তখনই উদাসীন চোখ মেলে সে দেখতে লাগলো—সামনের গলি দিয়ে নরেন চলে যাচ্ছে, গলির মোড় পার হয়ে গেল, আর দেখা গেল না। তখুনি তার মনে হলো—ও লোকটা যেন চিরকালের জন্যে এ বাড়ি থেকে, এ গলি থেকে একেবারে মুছে গেল। লোকটাকে যেন অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং তার কোনো অপরাধই ছিল না।

কোথায় তার অপরাধ? কোথায় তার মতলব? মহামায়ার বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি তুলে সারাটা দিন সে নিজেকে অশান্ত করে তুললে। অনেক দিনেরই কথা মনে পড়লো তার—নরেনের অনেক যাওয়া-আসার কোনো কুমতলবই তার চোখে পড়লো না। নরনারীর দেহগত—জীবনগত কামনা বোঝার বয়স তার অবশ্যই হয়েছে—কিন্তু নরেনের চোখে তার ছায়াপাত কোনোদিন হয়েছে বলে তার মনে পড়লো না। কেবলি মনে পড়তে লাগলো চির উৎসাহী, ধীর শান্ত কৌতুকপ্রিয় একটা লোককে—খানিকটা তার বাবার মতো চরিত্রের মানুষ। মনে পড়ে কলেজে পড়তে যাওয়ার প্রথম দিনটা—তার নিজের ভয়ের অন্ত নেই—কিন্তু ওই লোকটার ছিল কী উৎসাহ। তারপর কোথায় বই, কোথায় নোট, এক-একটা পরীক্ষার পর কোথায় কার কাছে পাশের নম্বর। লোকটার ছুটোছুটির অন্ত ছিল না। মা সেদিনও প্রতিবাদ তুলেছে—কিন্তু বাবা আর ওই লোকটার নির্বিচার উৎসাহে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল কল্যাণী। তাকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মায়ের চিরকেলে কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করেছে কল্যাণী, "কি হবে পড়ে!"

সে বলেছিল, "কেন—পাস করবে, ডিগ্রী পাবে। ওরে বাপরে, সেদিন কতবড় মহিলা তুমি!"

"তারপর?"

"ধরো কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়লে ভালো ভাবে এম. এ. পাস করে।"

"তারপর?"

"নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার আনন্দ এবার। কতো মেয়ে তোমার প্রেরণায় প্রেরণা পায়। তোমার কথা শোনে। সগৌরবে সেদিন খুশি মতো চলো—খুশি মতো খরচ করো। অনেকগুলো টাকা হয়তো মাইনে পাও। আমরা ধার চাইলে দাও না।"

"তারপর?"

"উঃ, আর পারছি নে।" সে হেসে বলেছিল, "আচ্ছা ধরো, তারপর—মস্ত একটা গবেষণা করে জগতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়লো মাদাম কল্যাণী। পাড়ার মেয়ে মহল তোমায় মালা দিয়ে উলুধ্বনি দিলে, ছেলেরা করলে মস্ত এক সভা। দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। লক্ষ্মী সরস্বতী দুইয়ের কৃপায় তোমার তখন তিন মহলা বাড়ি—নানা মানুষের সহায় সম্বল তুমি। আমি গেলুম একদিন দেখা করতে। দারোয়ান বাধা দিলে। তাকে ঘুষ দিয়ে যদি বা তোমার দেখা পেলুম—তুমি বললে 'গেট আউট, চিনিনে'।"

এর মধ্যে কি মতলব ছিল নরেনের। সে ভেবে পায় না।

কল্যাণী অস্বীকার করতে পারে না—জীবনের অনেক স্বপ্নের সম্বল সংগ্রহ করেছিল সে এই লোকটার অনেক রকম করে গড়ে তোলা অনেক দিনের অনেক ছবির থেকে। নাই বা হলো তার অধ্যাপনা, নাই বা হলো তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রীলাভ ও গবেষণা।

সেই লোকটা আর হয়তো আসবে না। ···

ভাবতে ভাবতে টান পড়ে যেন তার জীবনের সমগ্র সত্তায়। তার সামান্য জীবনের কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য এক প্রাঙ্গণে এই লোকটার একটা আসন পাতা হয়েছিল দৃঢ়বদ্ধ ভাবে—সেইটেকে আজ তুলতে গিয়ে টান পড়ে উপড়ে তোলা গাছের শেকড়ের মতো। তার উন্মূলিত শেকড়ের সঙ্গে চড় চড় করে আজ উঠে আসে যেন জীবনের মৃত্তিকা।

সে জানে না—এ কি তার প্রেম!

সে জানে না—গতায়ু স্বামীর বিরহ। জানে না—কারণ, মনে করে রাখার মতো বয়সে তার ও ব্যাপার ঘটেনি। তবু, আজ মায়ের বিস্ফোরণ, বাবার আর্তনাদ আর নরেনের নিঃশব্দ প্রস্থান তাকে অস্থির অশান্ত করে দিলে।

৩

কি মনে আর কি দেহে, শিবশংকর দিনের পর দিন দুর্বলই হয়ে পড়ছেন। কাজের জগতটা যেন দিনে দিনে দূরেই সরে যাচ্ছে—ক্রমশ অনেক দূরে। একটা ঔদাসীন্যের সূক্ষ্ম অন্তরাল রচনা করেছেন তিনি তাঁর চারপাশে। আর যেন ঝগড়াও করতে চান না তিনি মহামায়ার সঙ্গে। এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেন মহামায়া। সবটা কেমন যেন অন্য রকম লাগে—যেটায় তিনি ভয় পান।

মহামায়া তাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। একটা দুর্জ্ঞেয় ভবিতব্য যেন মহা অমঙ্গলের মতো ধীরে ধীরে ঘিরে আসছে এই পরিবারটিকে। অবনীকে একদিন বললেন, "কি করবি অবনী—তোর একটা চাকরি-বাকরি না হলে আর তো চলে না। ওঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কটা টাকাই বা আর আছে!"

অবনী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক ঠিক বলো দেখি—কত আছে?"

অবনীর এই রকম প্রশ্নে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন মহামায়া। একটু দ্বিধা করে বললেন, "কতোই বা আর আছে। তেমন আছে তোর ঘাড়ের ওপরে এক বোন। তারপর এতোগুলো মানুষের চিন্তা।"

"ঠিক আছে—সবটা আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি দেখ।" অবনী বললে, "চাকরি কবে যে হবে বুঝতে পারছি না মা। যুদ্ধের পরের ছাঁটাই ঝুলছে সর্বত্র। আর ছোট-খাট একটা হলেও যা হবে—তাতে না ভরবে পেট, না ভরবে মন। আমি ভাবছি ছোট-খাট একটা ব্যবসা করি।" বড় কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখা লোক অবনী—কিন্তু তার জন্যে বাড়ি থেকে আবার টাকা ঢালতে হবে শুনে মহামায়া ঘাবড়ে গেলেন।

তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, "কি ব্যবসা করবি—তাতে তোর কতো টাকা লাগবে?"

"তা হাজার খানেক যদি দাও।"

অবনী বললে বটে অবলীলায়—মহামায়ার কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, "শেষ কালে সর্বস্ব দিয়ে ভরাডুবি হবে না তো!"

"ম্যানেজ করতে জানা চাই।" অবনী বললে, "অল্প টাকায় একটা ছোট-খাট ব্যবসার কথা ভাবছি। নিজেই সব আমি দেখাশুনো করবো।"

"কি জানি বাপু—কি হবে ওতে।" মহামায়া বললেন, "যাই হোক—একটা কিছু কর।"

অবনী বললে, "বাবার কাছে কথাটা তা হলে বুঝিয়ে বলো তুমি।"

"সে তুই নিজেই বুঝিয়ে বল।"

তারপর অবনীর ব্যবসা নিয়ে শিবশংকরের ঘরে পারিবারিক একটা মিটিং বসে গেল একদিন।

ব্যবসার কথা শুনে শিবশংকর উৎসাহিত হয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "ব্যবসা! খুব ভালো। একটা জাতির উন্নতির পরিচয়, তার সমৃদ্ধির পরিচয় ওই ব্যবসায়। খুব ভালো।"

অবনী বললে, "প্ল্যান আমার ছোটই—তবে তাতে পরিবারের সবাই কাজে লাগতে পারে। কল্যাণী, শান্তা"—

শিবশংকর বললে, "ওই রকম ব্যাপার জাপানে আছে শুনেছি। খুব ভালো।"

ঔদাসীন্যের অন্তরাল থেকেও শিবশংকরের চোখের উৎসাহ-দীপ্তি ধরা পড়ে। কল্যাণী আর শান্তার কাজে লেগে যাওয়ার কথাটা ভালো লাগে শিবশংকরের। এক ধরনের আদর্শ-পাগল মানুষ, তার উত্তেজনা আজও এসে পড়ে চোখে মুখে। বললেন, "কল্যাণী আর শান্তা যদি কাজে লেগে যায় তা হলে জিনিসটা মন্দ দাঁড়ায় না বটে।" মহামায়ার দিকে চেয়ে বললেন, "কেমন—বলিনি আমি, অবনী ভেবেচিন্তে নতুন একটা কিছু করবেই।" তারপর অবনীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা ব্যবসাটা কি নিয়ে?"

অবনী বললে, "এই টেলারিং আর তার সঙ্গে একটা ধোবীখানা।"

"কি. ব্যবসা বললি?"—শিবশংকর যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপর অবনীর ব্যবসার মহৎ পরিকল্পনা শুনে ক্রমশ তাঁর মুখচোখের উৎসাহ ও দীপ্তি একেবারে নিভে গেল। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

শিবশংকরের ভাবান্তর অবনীর চোখে পড়লো না। সে তখন তার পরিকল্পনা ব্যক্ত করায় মশগুল। বলে চলেছে, "লোক একজন রাখবো মাস কয়েকের জন্যে। কল্যাণী আর শান্তা তো বসেই আছে ঘরে—ওরা যদি শেলাই কাট্‌টা শিখে নেয় ক'মাসে—তা হলে লোক পরে ছাড়িয়ে দেবো। তখন ওদিক থেকে খরচা কিছু নেই—বরং ষোলো আনাই লাভ। কল্যাণীর ওই টাইপ স্টেনোগ্রাফী শিখে আর হবে কী।" কল্যাণীর দিকে চেয়ে বললে অবনী, "কি বলিস কল্যাণী? তোর আর শান্তার শেলাই কাট-ছাঁট শিখতে লাগবেই বা ক'দিন!"

কল্যাণী মুখ ভার করে বললে, "তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো দাদা।"

কল্যাণীর ভঙ্গি ভালো লাগলো না অবনীর—সে কিছুটা দমে গিয়ে তাকালো শিবশংকরের মুখের দিকে। কারণ সে জানে, কল্যাণীর মতামত শিবশংকর কতখানি গ্রাহ্য করেন।

শিবশংকর তখন চোখ বুজে ভাবছেন। ভাবছেন—কল্যাণীর সেই হতাশ বিষণ্ণ মূর্তিটি, ভাবছেন শান্তার কথাও, ভাবছেন নরেনের সেই আত্মনির্ভরতার কথাও। আর অবনীর পরিকল্পিত এই তুচ্ছ ভবিষ্যৎ। সেইটে বড়ো বিঁধছে তাঁকে। বাঁচার মর্মান্তিক তাগিদ! তাঁর সংসারে এইটাই নির্মম সত্য। চোখ বুজে আবার সেই পুরাতন উদাসীন ক্লান্ত গলায় বললেন, "কল্যাণী শান্তা শেলাইয়ের এই সব কাজটাজ করবে—তাতে তোমার মা আবার কি বলেন দেখো।"

দুর্বল ক্লান্ত কণ্ঠে বললেও ওটা যে শিবশংকরের একটা খোঁচা—মহামায়া তা বুঝলেন। ঝাঁঝিয়ে বললেন, "তাই বলে কি মেয়েরা দোকানে বসে শেলাই করবে না-কি!"

অবনী চটপট বললে, "তার দরকার কি! ঘরে বসে শেলাই করলেই চলবে। বাকি সবটা আমি ম্যানেজ করে নেবো।" বলে আবার একবার কল্যাণীর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করলো অবনী, "কি বলিস্ কল্যাণী?"

সে-বারেও কল্যাণীর সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং সে নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শান্তাই শুধু সাগ্রহে যেচে বললে, "হবে না কেন দাদা—আমি মাসখানেকের মধ্যেই কাজ চালাবার মতো শেলাই শিখে নেবো।"

অবনীর কিন্তু মন ভরলো না।

সেদিনের পারিবারিক সভাটা হলো ওই পর্যন্তই।

কল্যাণীর পেছনে পেছনে অবনী এসে ঢুকলো তার ঘরে। তাকে একলা পেয়ে ছেঁকে ধরলে অবনী, "তুই আমার আইডিয়াটা বুঝতে পারছিস নে বোধ হয় কল্যাণী, তাই"—

কল্যাণী বিব্রত ভাবে হেসে বললে, "কে বললে বুঝতে পারছি না।"

"তবে তুই ওই রকম ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন?"

"বাঃ, এড়ালুম কোথায়! তোমার ব্যবসা—তুমি বোঝ ভালো। আমার ছাই টাইপ স্টেনোগ্রাফী"—

"আ-হা-হা, তোর টাইপ স্টেনোগ্রাফীকে খারাপ বলছে কে!"

"তুমিই বলেছ।"

"বলেছি না কি!" অবনী ম্রিয়মাণ মুখে একটু হেসে বললে, "মানে—বুঝছিস নে কল্যাণী, কিছু একটা আমাকে করতে হবে তো। কাজকর্ম তো কিছুই পাচ্ছিনে! একটা ছোট-খাট ব্যবসা যদি তবু ম্যানেজ করতে পারি।"

কল্যাণী অবনীর সেই হতাশ করুণ মুখটার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "তা করো না।"—

"কিন্তু তুই একটু জোর না দিলে আমি জোর পাইনে। আর বাবাও যে টাকা বার করবে এমন মনে হয় না।"

"আমার দফা তুমি সেরে দিয়েছ।" কল্যাণী বললে, "কবে তোমার ব্যবসা হবে জানিনে কিন্তু মা এ মাসে নির্ঘাৎ আমার টাইপের স্কুলের মাইনেটি বন্ধ করে দেবে।"

"কখ্খনো না—কখ্খনো বন্ধ করতে দেবো না।" অবনী সকলরবে বলে উঠলো, "তোর টাইপ স্টেনোগ্রাফী খুব ভালো—ও একটা কত বড় মহান্ বিষয়! তুই শুধু আমার আইডিয়াটার দিকে একটু নজর দে ভাই।"

লঘু কথাবার্তার মধ্যেও একটা হতাশার ছোঁয়া আছে অবনীর কথায়। সেটা বড় কানে লাগে কল্যাণীর। তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকালো অবনীর দিকে। মুখে তার বেকারের অবিন্যস্ত ভাব, চোখে একটা বিষণ্ণ আগ্রহ, রোগা মুখে কদিনের দাড়ি, গায়ে কলার-ছেঁড়া শার্ট—সবটা মিলে কল্যাণীর মনকে নাড়া দেয় জোরে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে—আজকের মতোই ওরা ভাইবোন দাঁড়িয়েছে সেখানে পাশাপাশি, মুখে হাসি—সাজ-পোশাক কনভোকেশনের, আজ থেকে মাত্র বছর দুই আগে যেদিন কল্যাণী নিতে গিয়েছিল বি. এ. ডিগ্রী আর অবনী নিতে গিয়েছিল তার এম. এ. ডিগ্রী। কি জানি পোড়া চেহারা তার হয়েছে কি রকম, কিন্তু অবনী বদলে গেছে কতটা! কোথায় সেই তার মুখের দীপ্তি আর কল্পনার উচ্ছ্বাস! ···মিলিয়ে দেখে কল্যাণী, চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

কল্যাণীর দৃষ্টি অনুসরণ করে অবনীও স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। আস্তে আস্তে বললে, "কি দেখছিস ছবিতে।"

"সেদিন আর আজকের দিন।" কল্যাণী ম্লান হেসে বললে, "মিলিয়ে দেখছি। তখন কি ভাবতে—কি বলতে তুমি, মনে আছে?"

"সে সব দিন চলে গেছে—সব কি আর মনে আছে।"

"আমার মনে আছে।" কল্যাণী করুণ হেসে বললে, "সেই গঙ্গার ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা বাড়ি, পেছনে একটু বাগান—তোমার সেই সাহিত্য-সঙ্গীতের চর্চা—আর স্বচ্ছন্দে চলার মতো একটা চাকরি।"—

অবনী হাসলো। মনে পড়েছে বটে। কবে কোথায় যেন কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে একটা স্বপ্ন চোখ ভরে এনেছিল অবনী। ছোট্ট একটু বাড়ি নদীর ধার ঘেঁষে, চাকরি করবে ওরা ভাই-বোন, বিয়ে করবে না অবনী। জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে দু' জনে অনাবিল এক শান্তিপ্রবাহে। ···

অবনী বললে, "আর তুই কি ভাবতিস ? সে-ও আমি ভুলিনি। কোথায় গেল তোর এম. এ. ডিগ্রী—মেয়ে কলেজের অধ্যাপনা—ইতিহাসের গবেষণা !"

হায় রে, সূর্যস্নাত সে কোন এক স্বপ্নের পৃথিবী আর জীবন-তৃষ্ণা। অন্ধকারে মলিন ঠাণ্ডা এই ঘরটার কোণে সবটা যেন চেয়ে আছে এখনো করুণ চোখে।

কল্যাণী ম্লান মুখে হাসলে একটু। বললে, "চুলোয় যাক সে-সব দাদা, তোমার জামা তৈরীর দোকান কর, আপাতত দর্জিগিরিই করি।"

"ঠাট্টা করছিস নে তো ?"

"ঠাট্টা কেন করবো দাদা।" কল্যাণী একটা মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে, "দু' জনে স্বপ্নও দেখেছিলুম একদিন ছেলেমানুষের মতো। তখনো ঠাট্টা করিনি কেউ কারুকে। আর আজ কষ্টের সংসার চালাবার সময় ঠাট্টা করবো তোমাকে—এমন মুখে আগুন আমার।"

অবনী হেসে বললে, "মনে এবার সাহস পাচ্ছি কল্যাণী।"

"যা করবার—চটপট করো।" কল্যাণী বললে, "বাবার শরীর দিন দিন কেবল ভেঙেই পড়ছে। দেখছো তো ?"

"সব দেখছি কল্যাণী। আর কিছু করতে পারছিনে বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। যাক—নরেনটার সঙ্গে এখন একটু পরামর্শ করে কাজে নেমে পড়ি।"

আবার সেই নরেন ! সেদিনের ঘটনার পর আর সে আসেনি। তার কথা উঠে পড়ায় কল্যাণী কেমন বিব্রত বোধ করে। লজ্জা আর সঙ্কোচ বোধ করে—তার গড়ে তোলা গগনচুম্বী স্বপ্নগুলোর সঙ্গে

অবনীর প্রস্তাব অত্যন্ত হাস্যকরভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে। বললে, "তাঁকে আবার এর মধ্যে কেন দাদা।"

"এই একটু পরামর্শ"—

"থাক গে। ও তুমিই যা হয় করো।"

বিদায় হোক স্বপ্নের স্বপ্নকথা, আর তার স্রষ্টা নরেন। এখন দরিদ্র সংসারটার ভাঙা চাকার তলায় নিজেকে সে সমর্পন করে দেবে।

৪

দেহে আর মনে শিবশংকর ভেঙে পড়ছেন দ্রুতই এবং সেই ভাঙার অন্তরালে এবার সত্যিকারের অবসরের সুযোগ যেন আসছে শিবশংকরের।

শীত ক্রমশ জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তিনি কাবু হয়ে পড়তে লাগলেন বেশী করে। আর ব্যবহারিক জীবনে ঠোক্কর খেতে খেতে অবসরের কোণ নিতে লাগলেন এবার। আধুনিক শিক্ষাবিধিতে যোগ্যতা তাঁর সেকেলে—অতএব চাহিদা নেই একালে। হার হয়ে গেল তাঁর সেখানে—হার হয়ে গেল নিজের সংসারেও। না পথ খুঁজে পেলেন সেখানে মহামায়াকে নিয়ে—না কল্যাণীকে নিয়ে। আশ্রয় নিলেন শেষে স্তবকবচমালায় আর কর্মযোগ বাদ দিয়ে গীতার আর সব যোগে। রাখতে শুরু করলেন গোঁফ দাঁড়ি আর রচনা করলেন চারপাশে এমন একটা নির্বিকল্প ঔদাসীন্যের অন্তরাল—যেখানে মহামায়ার ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ বাণও আর লক্ষ্যভেদ করতে পারে না।

তবু, রূপবর্ণহীন এ উদাসীন জগতে কখনো কখনো ফিরে আসে তাঁর অভিজ্ঞান। ক্লান্ত মন্থর কণ্ঠে তখন থেমে আসে গীতার শ্লোক। পাতা ওলটাতে ভুলে যান। নিঃশব্দ অপরাহ্নে গলির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন হয়তো জানালা দিয়ে—যদিও সে জানালা দিয়ে না দেখা যায় বৃহৎ জগত আর না দেখা যায় রাজপথের জনস্রোত। হয়তো

কখনো কখনো জানালা দিয়ে দেখা যায় চলন্ত দু-চারটে পা—দেখা যায় না পুরো মানুষটাও। তবু মানুষের পা তো! সেই চলন্ত পা অনুসরণ করে লক্ষ্যসীমারও বাইরে কখনো কখনো গিয়ে পড়েন কর্মমুখর মানুষের জগতে। সবাই কাজ করছে সেখানে—দুরন্তগতি কর্মপ্রবাহ, জড়ো হয়েছে যেন জগতের যতো মানুষ—শুধু শিবশংকর আজ সেখানে অনুপস্থিত। কতগুলো মুখ ভাসে চোখের সামনে, চেনা-অচেনার ভিড়ের মধ্যে—তাঁর সহকর্মীদের মুখ ··· সেই শত্রু যদুনাথ। · ছাত্ররা। ··· এমন সময় টিফিনের ঘণ্টা শেষ হলো না? ··· কে পড়াচ্ছে সেই উত্তরের ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে?

··· অতএব এ-বি-সি একটি ত্রিভুজ—না না, একটি চতুষ্কোণ—উঁহু বৃত্ত—না না, কিছুই না—কিছুই না। সবটা ধোঁয়াটে। মিথ্যে। ব্যর্থ! ... মায়া! মা ফলেষু কদাচন ··· মা ফলেষু ···

মাথা ঠুকে শুয়ে রইলেন শিবশংকর—কেমন যেন ঝিমোনি লাগছে। কতক্ষণ পড়েছিলেন খেয়াল নেই। কল্যাণী এসে ডাকলো, "বাবা!"

শিবশংকর ক্লান্ত কণ্ঠে সাড়া দিলেন।

"কি বিড় বিড় করছো?"

শিবশংকর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছু না রে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "আমি একটু চলতে ফিরতে পারলে আমাদের গলিটার বাইরে একটু আমায় নিয়ে যাস তো মা।"

"নিশ্চয়ই। তোমাকে নিয়ে তখন রোজ বেড়াতে যাবো। একটু ভালো হয়ে ওঠো।"

শিবশংকর কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা হ্যাঁরে—কেউ আসে না?"

"কার কথা বলছো বাবা?"

"এই—এই ধর, যদুনাথ।" যেন চিরকালের সেই শত্রু যদুনাথের নামটাই আজ শুধু মনে পড়ে গেল শিবশংকরের।

"নাঃ—আর আসবেন তিনি কোন মুখে বাবা?"

কল্যাণী বাপকে খুশি করবার জন্যেই বোধ হয় জোর দিয়ে বললে কথাটা—কিন্তু শিবশংকর খুশি হলেন না। কেমন করে জানবে কল্যাণী—কর্মহীন শিবশংকর আজ ভিক্ষুকের মতো চেয়ে আছেন সুদূর কর্মোন্মত্ত জগৎটার দিকে। কিন্তু সেখান থেকে সেই শত্রু যদুনাথও আজ আর কোনো ছলে আসে না। শিবশংকর একেবারে বিস্মৃত—পরিত্যক্ত, আবর্জনার মতো। শিবশংকর আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গেলেন।

কল্যাণী বললে, "এই শীতটা গেলেই তুমি ভালো হয়ে উঠবে বাবা—তোমার কবিরাজ বলেছেন। শুধু এই ঠাণ্ডাটায় বড় কাবু করে ফেলেছে তোমাকে।"

কি জানি এ শীত কাটবে কি না! শিবশংকর শীতের পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোকটুকুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। সেখানে যেন পড়তে লাগলেন কি একটা অদৃশ্য লেখা।

কল্যাণী বললে, "এবার তোমার বিকেলের ওষুধটা খাওয়ার সময় হলো বাবা। ওষুধটা আনি।"

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক দফায় চলেছে কবিরাজীর চিকিৎসাধারা। কিন্তু কিছুই যে হচ্ছে না—এটা ভালো করে বুঝতে পারছেন মহামায়া। তাঁর অসন্তোষ ও ক্রোধের স্ফুরিত মুখটা দিনে দিনে শুকিয়ে আসছে দুশ্চিন্তায়—আশংকায়। শেষ পর্যন্ত একদিন কবিরাজী ছেড়ে শুরু হলো সস্তার চিকিৎসা ধারা হোমিওপ্যাথী। কিন্তু তাতেও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। এলোপ্যাথীর দিকে ভয়ে যেতে চান না মহামায়া—খরচ-খরচা বড্ড বেশী। এদিকে একটু একটু করে খরচ হচ্ছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কড়ি এবং শিবশংকরের অসুস্থতার বাড়াবাড়িতে আপাতত মুলতুবী আছে অবনীর ব্যবসার প্রস্তাব।

অবনীকে মহামায়া শুধোলেন একদিন ভয়ে ভয়ে, "কিছুই তো বুঝতে পারছিনে অবনী। কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথীতে হলো না তো কিছুই। শেষ পর্যন্ত কি এলোপ্যাথী দেখবি ?"

অবনী চটে বললে, "আমি আগেই জানতুম, এই রকম বিভ্রাট একটা বাধাবে। নিজে তুমি সব ভালো বোঝ—এই তোমার ভাব। অথচ ম্যানেজ করতে পার না কিছুই।"

দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মহামায়া। বললেন, "বেশ তো—কর না যা করবার। আমি একা আর ভাবতে পারছিনে।"

"ভাববার কথা বলেছ কোনোদিন?—সব আগলে রেখে নিজেই করেছ এবং গোলমাল করেছ।" অবনী বললে শেষ কালে, "বেশ, এখন সরে দাঁড়াও—ম্যানেজ করে দিচ্ছি আমি।"

এর পরে শুরু হলো অবনীর ব্যবস্থাপনা।

পরের দিনই অবনী পরামর্শের জন্যে কবিরাজ ডাকলো, হোমিওপ্যাথ ডাকলো এবং এলোপ্যাথ একজনকেও ডেকে আনলো। নিজে সে তর্ক করলে যতোটা পারলো এবং শেষ পর্যন্ত সকলের বিরুদ্ধে সকলকে চটিয়ে দিয়ে একটা বিভ্রাট বাধিয়ে তুললে। সবাই প্রায় অপমানিত হয়ে রাগ করে চলে গেল।

কল্যাণী বললে, "এ কি আরম্ভ করলে দাদা!"

অবনী বললে, "ঠিক আছে—সবটা বোঝা গেল—পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের মতামত থেকে। এখন একজন বড় ডাক্তার এনে দেখানো দরকার মনে হচ্ছে, ওসব ছুটকো-ছাটকার সাধ্য নয়।"

শেষতক একজন বড় এলোপ্যাথও এলো—দেখলো শুনলো সব। তারপর গম্ভীর ভাবে ব্যবস্থা দিল এই বলে যে, মিছিমিছি রোগীকে ব্যস্ত না করে শান্তিতে শেষ হতে দেওয়াই উচিত।

"কোনো চিকিৎসা?"—অবনী ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"চিকিৎসার চেয়ে ওঁর মন অনেক জোরে ছুটে চলেছে এখন এ পৃথিবী ছেড়ে।"

"রোগটা কি?"

"চাকুরে মানুষের অবসর—বড় মর্মান্তিক। হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়। অবসর নেওয়ার পর প্রায় ক্ষেত্রেই দেহে মনে ভেঙে পড়েন সবাই। তাই হঠাৎ মরার ভাগটা এই সময়ে খুব বেশি।"

"তা হলে"—অবনী বোকার মতো মাথা চুলকোতে লাগলো।

"তা হলে আর কি! এখন যে কটা দিন থাকেন—ওই পর্যন্ত।" ডাক্তার বললে, "পারলে একটু ঘুরেটুরে বেড়াবেন। শীতটা গেলে অবিশ্যি চাঙা হয়ে উঠবেন একটু।"

কিন্তু শীতের শেষ তখনও অনেক দূর। পাতা ঝরছে রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমারের বাগানের উঁচু শিমুল গাছটা থেকে। সেই শিমুল গাছটার ডালপালার ফাঁক দিয়ে মোক্ষদাসুন্দরী হাই স্কুলের চিলকোঠার একটু আভাস পাওয়া যায় মাত্র। সেই দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন শিবশংকর—তাঁর অর্থহীন দৃষ্টির সামনে ঝরে ঝরে পড়ে উঁচু শিমুল গাছের পাতাগুলো। কি দেখেন সেখানে কে জানে—দিনের আলো শেষ হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

কল্যাণী এলো জানালা বন্ধ করতে।

শিবশংকর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, "থাক মা আর একটু। ওই দিক দিয়ে বাইরের জগৎটাকে তবু একটু দেখতে পাই।"

"ঠাণ্ডা আসবে যে বাবা।" বলে কল্যাণী বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বসলো।

শিবশংকর কোনো কথা বললেন না। সেই জানালার ছোট ফাঁকটুকুতে ধরা পড়া এক চিলতে আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্য মনে বলে উঠলেন, "হলো না—কিছুই হলো না। তখন তোর দাদা যদি আইনটা পড়তে পারতো—আজ আর তাকে ওই তুচ্ছ ব্যবসার কথা ভাবতে হতো না। টাকা-পয়সার অভাবে পারলুম না তখন।" ...

কল্যাণী বলে উঠলো, "আবার তুমি ওই সব কথা ভাবছো বাবা!"

"ভাবিয়ে যে দেয় মা। মাঝে মাঝে ভাবি—এ কোন হতভাগা কালে এসে আমার মরণ হচ্ছে।" এই আধমরা মানুষটির অন্তরের চাপা একটা আলোড়ন তাঁর সমস্ত দুর্বলতাকে ঠেলে বেরিয়ে আসে বাইরে। দুর্বল শীর্ণ হাতে চেপে ধরেন কল্যাণীর একটা হাত। কেমন একটা আচ্ছন্ন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বলেন, "জীবন শুরু

করেছিলাম দুঃখকে মাথায় তুলে নিয়ে। আশা ছিল—সব দুঃখের একদিন শেষ হবে। শিক্ষায় দীক্ষায় শ্রীতে সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ একটা কালের নতুন মানুষ দেখে মরতে পারবো। কিন্তু এ কী!—তোদের চোখে হতাশা, তোদের চোখে আমার সেই দুঃখের জীবনের ক্ষুধা আর অপমৃত্যুর ছায়া! ··শেষ হলো কই—সে দুঃস্বপ্নের জীবন শেষ হলো কই!"

চোখ জ্বলে ওঠে কল্যাণীর। গলা কাঁপে তার। নিরুপায় এই বুড়ো মানুষটির অবরুদ্ধ উত্তেজনা যেন তার বুকের গোপন আশা আর আশ্বাসকে সহসা উদ্দীপ্ত করে তোলে। উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ায় কল্যাণী। সহসা সে সেই একদিনের মতো সক্ষোভে আবার বলে ওঠে, "কেন আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মালুম না বাবা! আমি ছুটতুম—আমি দেখতুম—আমি লড়তুম, তোমার সংসারের চাকাটাকে আমি এমনি করে থেমে যেতে দিতুম না! আমি হার মানতুম না কিছুতেই।"

শিবশংকর শুধু দম চেপে আস্তে আস্তে বললেন, "হার মানিসনে কল্যাণী।"

"কিন্তু অন্ধ ভাগ্যের এ কি দেয়াল আমার চারিদিকে!" দীপ্ত চোখ কল্যাণীর হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে নিরুপায় নিরুদ্ধ নারী-ভাগ্যের অশ্রুতে। সে বললে, "মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিদিন আমি ঘেন্নায় মরে যাই। মনে হয়—কেন আমি এই ঘেন্নার জীবন নিয়ে জন্মেছিলুম!"

শিবশংকর তেমনি আস্তে আস্তে বললেন, "জন্ম জন্ম ধরে তাই ওরা ভাবতে শিখেছে। কিন্তু মনের দুর্বলতার চেয়ে বড় বিষ আর নেই কল্যাণী। মনে রাখিস—পৃথিবীতে যতো অত্যাচার হয়ে গেছে—তার চারভাগের তিন ভাগ শুধু মেয়েদেরই ওপরে। নিজেকে কঠিন করিস—সমস্ত আঘাতের জন্যে তৈরি করিস। অতীতের সেই লজ্জার কাছে মাথা নীচু করিস নে মা কিছুতেই। কোনো দ্বিধা—কোনো তুচ্ছতায়"—

"আমি পারি না।"—রুদ্ধ আবেগে কল্যাণী প্রায় কেঁদে ফেললে। বাবার শিক্ষা দীক্ষা আর আদর্শ তার অবরুদ্ধ জীবনের আলো, তার স্বপ্নে দেখা আনন্দের মতো। কিন্তু মহামায়ার সংস্কার তাকে রাহুর মতো গ্রাস করে আছে। আজ শিবশংকরের কথায় আবার সে তার স্বপ্নে দেখা আশা আর আশ্বাসগুলোকে যেন সেই মুহূর্তে ফিরে পায় —তাই আনন্দে, উত্তেজনায় আর আবেগে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলে।

শিবশংকর তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, "পারতে হবে।"

কল্যাণী বললে, "কিন্তু মায়ের সংস্কার যে"—

শিবশংকর বাধা দিয়ে বললেন, "তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।"

এর পর কেউ আর কোনো কথা বলে না। কল্যাণী বসে রইলো ধ্যানমগ্নের মতো। চোখে তার কোন দুর্জ্ঞেয় এক জীবনের স্বপ্ন—অস্পষ্ট আর উন্মথিত।

বাইরে তখন শীতের সন্ধ্যা কুয়াশায় আর অন্ধকারে ঘনঘোর হয়ে এসেছে। তবু সেই অন্ধকারের দিকে শিবশংকর চোখ মেলে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। মহাশূন্যের সে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অজানা ভাবীকালের মতো রহস্যময় এক অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই মোক্ষদাসুন্দরী হাই স্কুলের চিলকোঠার আভাস, সেই উঁচু শিমুল গাছটা আর তার নিরবচ্ছিন্ন পাতা ঝরা। তবু সেই অন্ধকারের দিকে শিবশংকর চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, "ডাক্তার কি বলে গেল রে কল্যাণী ?"

"শীতটা গেলেই তুমি ভালো হয়ে উঠবে বাবা।"

"হুঁ।" বলে শিবশংকর চুপ করে গেলেন।

তারপর এমনি চুপ করে দিনের পর দিন শীতের পাতা ঝরা দেখতে লাগলেন শিবশংকর।

৬

শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরাও শেষ হলো না সেই শিমুল গাছটার। শীত কাটবারও প্রয়োজন হলো না—প্রয়োজন হলো না কোনো ডাক্তারেরও। নিজের অবসরের জীবনটা শিবশংকর একদিন নিজেই নিঃশব্দে বুঝেসুজে নিয়ে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কবে কোন এক পল্লীর অন্ধকারে আলোর ইতিহাস রচনা করেছিলেন তিনি—ভাবী ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে কি-না কে জানে। তবে তাঁর নিজের ঘরে যে বিপর্যয়ের অন্ধকার—বর্তমান তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রইলো।

আসন্ন দুর্দিন আর কূলহারা দুশ্চিন্তার মধ্যে এ দরিদ্র পরিবারটির যেন শোকেরও অবকাশ নেই। সেকাল একালের যুগসন্ধির মানুষটি চলে গেল তার শেষ ছুটি নিয়ে। এবার একালের ভার পড়লো একালেরই ওপর। কিন্তু একালের মানুষ তো অবনী। তার মুখের দিকে চেয়ে মহামায়া কোনো সাহস পান না। তার সেই ব্যবসার কথাটা পারিবারিক বিপর্যয়ের ঝড়ে চাপা পড়েছিল—সেটাকে আবার টেনে তোলবার ইচ্ছে মহামায়ার মোটেই ছিল না। না থাকলেও অন্য পথ যে আর কোন দিকে, সেটাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত একদিন ভয়ে ভয়ে শুধোলেন অবনীকে, "কি করবি অবনী! আমি যে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিনে ভেবে বাবা।"

অবনী বললে, "ব্যবসাটা এবার শুরু করে দি' মা। কতো টাকা আর হাতে আছে বলো দেখি?"

"সামান্যই—সে আর শেষ হতে কতক্ষণ।" মহামায়া সভয়ে বললেন, "কিন্তু ওই তো সর্বস্ব।"

"ওই সর্বস্বকে এখুনি কাজে না লাগালে অবস্থাটা যে আরও খারাপ হবে মা। যতো দেরি করবে—ততোই যে অবস্থা সঙিন।"

যতো হোক, অবনী পুরুষ মানুষ। মহামায়া যতো জবরদস্তই হোন, পুরুষ মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার ওপরে চিরকাল তাঁর অগাধ

বিশ্বাস। এই জায়গাটায় তাঁর নারীত্বের সংস্কার তাঁকে দুর্বল করে রেখেছে। তাই শেষ পর্যন্ত মহামায়া একদিন ভয়ে ভয়ে এ পরিবারের সব পুঁজিটাই তুলে দিলেন অবনীর হাতে। বললেন, "দেখিস বাপু—যা করবার ভেবে চিন্তে করিস।"

"দেখোই না—কি করি।" অবনী বললে, "পুঁজি কম ঠিকই—তবে এরই মধ্যে সব ম্যানেজ করে নিচ্ছি আমি।"

তারপর অবনী 'ম্যানেজ' করতে লেগে গেল। মিলু-বিলুর খাতা চেয়ে হিসেব আর কাটাকুটি করলে কয়েক দিন, এ পাড়ায় ঘরের জন্যে ছোটাছুটি করলে সকাল-সন্ধ্যে, ধোপা ডেকে রেট্ কষলে, সেলাই-মেসিন কোম্পানীর সঙ্গে শুরু করে দিলে ইন্স্টলমেণ্টে কল নেওয়ার চিঠিপত্র লেখালেখি। হাজার টাকা মাত্র পুঁজি নিয়ে হিসেব করতে বসলো সে প্রায় হাজার বার।

নরেন এলো একদিন। ইতিমধ্যে বিলুর হস্তাক্ষর খাতার প্রায় পুরোটাই হিসেব-নিকেশ আর কাটাকুটিতে ভরে গেছে। নরেন বললে, "করছো কি অবনী!"

"ব'সো ব'সো।" হিসেবের খাতা থেকে মুখ না তুলেই অবনী বললে, "পুঁজি কম কিনা—তা এটা কাটলে ওটা হয় না, ওটা কাটলে এটা হয় না। একটা দোকান ঘর নিতেই সেলামী এ্যাডভান্স করতে চলে যাচ্ছে তোমার কতগুলো টাকা। ধোপাও আগাম চাইছে। তাছাড়া সেলাই-কলটা নিতেও টাকা জমা দিতে হচ্ছে মোটা রকম। তারপর আছে তোমার কিছু আসবাবপত্তর। একটু ঝলক-জেল্লা না হলে আবার আজকালের খদ্দের আসবে না। যুগের মন যোগাতে হবে তো।" ব্যবসার মূল রহস্যটা একেবারে যেন ফাঁস করে দিয়ে অবনী হাসতে লাগলো হেঁ-হেঁ করে।

"কল্যাণীর কাছে কাল শুনলুম সব। তাই ছুটে এলুম। তা তোমার ব্যবসা—বোঝ হয়তো তুমি ভালোই।" নরেন বললে, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ও বাদ দাও।"

"বাদ দেবো! কেন বাদ দেবো?" এতদিনের এতগুলো পৃষ্ঠা-জোড়া হিসেব-নিকেশের সামনে হতাশ আর ক্রুদ্ধ হয়ে অবনী জ্বলন্ত চোখে তাকালো নরেনের দিকে।

নরেন শুধু বললে, "বড্ড একরোখা ঝুঁকি বলে মনে হচ্ছে অবনী।"

ইংরেজী একটা প্রবাদবাক্য আউড়ে অবনী বললে, "ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না। চাকরিতেই পচছে যারা তারা এই ঝুঁকির উত্তেজনা যে কি—বুঝবে না। আর গোটা জাতটাই তো গেল চাকরি-চাকরি করে। কিছু বললেই বলবে—মূলধন বড় অল্প। আরে হিসেব করে ছাখ—ওতেই ম্যানেজ করা যায় কিনা।"

"কি জানি অবনী—করো তোমাদের ম্যানেজ।" নরেন হাসতে হাসতে বললে, "চাকরি করি বলে গালাগাল দিচ্ছ—দাও। তবে তোমার হিসেবের বহর দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে—কোথাও গোলমাল আছে।"

"গোলমাল আছে! কখ্খনো না। দেখাও।"—অবনী বিলুর হস্তাক্ষরের খাতা টেনে নরেনকে যেন চ্যালেঞ্জ করে বসলো। বললে, "দেখাও। রেশন দোকানে খোঁজ করে জেনেছি কম-সে কম চার-শ' কার্ড আছে এ এলাকায়। সে-জায়গায় ৩৬৫ দিনে বছর। প্রতি জনে ছটো করে জামা বানালেও দাঁড়ায় গে তোমার—"

"থামো, থামো অবনী।" নরেন বিব্রত ভাবে বললে, "ও হিসেব তোমার হুরস্ত ঠিক, মানছি আমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আসলেই গলদ আছে একটা।"

মহামায়া পাশের ঘর থেকে শুনছিলেন ওদের কথা। নরেন আর কল্যাণীর যে কোথাও দেখা হয়েছে—এবং কল্যাণী তাকে বলেছে অবনীর ব্যবসার কথা, এ ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভালো লাগার কথা নয়। নরেন যে আজকাল আসে না—এতে তিনি কিছুটা স্বস্তিও বোধ করেন। তবু নরেনকে যতোই অপছন্দ করুন, এই ব্যবসার ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারীর কথাগুলো বলছে সে—সেগুলো তার কাছে মনের মতো লাগছে। মহামায়া এ ঘরে এসে ঢুকলেন।

নরেনকে বললেন, "কি জানি বাবা—কি করছে ও। সর্বস্ব আমি তুলে দিয়েছি ওর হাতে। আমিও তো বলেছিলুম আগে—বরং একটা চাকরি-বাকরি ভালো করে খোঁজ।"

আর যায় কোথায়। অবনী লাফাতে লাগলো ক্রোধে—টেবিলে ঘুঁষি মেরে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে প্রায়।

"কি বোঝ তোমরা ব্যবসার। এমনি করে গোল্লায় গেছে গোটা জাতটা। ··· এমনি করে জগতে আজ" ··· জগত-ব্যাপার অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, ব্যক্তির মুক্তি ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথায় অবনী গলা ফাটাতে লাগলো।

নরেন হাত জোড় করে বাধা দিয়ে বললে, "দোহাই ভাই, থামো তুমি। যা খুশি করো। আমি আর কিছু বলছিনে। অসবার্ট কোম্পানীর কেরানী আমি—নিতান্তই আদার ব্যাপারী।"

এই ভয়ানক ঝুঁকি থেকে অবনীকে নিবৃত্ত করা তো গেলই না অধিকন্তু আরও বেশী সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং আর কিছুমাত্র দেরি ও দ্বিধা না করে তার ব্যবসার প্ল্যান 'ম্যানেজ' করতে নেমে পড়লো।

বড় রাস্তার কাছাকাছি গলির মোড়ের দিকে একটা ঘর ঠিক হয়ে গেল—ধোপা ঠিক হয়ে গেল। সেলাই কল এলো, ঠিক হলো একজন সেলাই জানা লোকের—আসবাবপত্র সাজানো হলো। মস্ত সাইনবোর্ড উঠলো 'সুবেশ'-এর। ব্যবসা শুরু হয়ে গেল অবনীর।

কিন্তু জাঁকিয়ে শুরু হলো বটে—হ্যাণ্ডবিলও ছড়ানো হলো হাজারখানেক, তবে খদ্দেরের ভিড় শুরু হলো না প্রত্যাশা মাফিক। বড় রাস্তার মানুষ ঢুকলো না গলিতে এবং গলির মানুষ প্রথমে ধার-বাকি চাইলে—যারা পেল তারা রইলো, যারা পেল না তারা চলে গেল গলির বাইরে। অবনীর সমস্ত হিসেব-নিকেশ ও পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে দর্জিখানাটা জমলো না বটে—তবে ধোবীখানাটা জমে উঠলো কিছুদিনের মধ্যে। অবনী তাতেই খুশি।

এমন দিনে এসে পড়লো সুধার এক চিঠি। সে আর এক কানা গলির মেয়ে—চিঠিতে যেন জীবনের পথ খুঁজে খুঁজে এসে পড়লো অবনীদের কানা গলিতে।

চিঠিখানা হাতে করে ধোবীখানার ভিড় আর গোলমালের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল অবনী। সহসা তার মনে হয়—কবেকার একটা স্বপ্নে দেখা হারানো জীবন যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে কাঁপছে। চিঠি তো নয়—একটা জীবন্ত কামনা, বিশ বছরের একটা মেয়ে তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর গভীর হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

অবনী চঞ্চল।

দুপুরের দিকে সময় করে ছুটলো সে আর এক কানা গলিতে।

দরোজার কড়া নাড়ার আগেই সেটা খুলে গেল। সামনে সুধা। মেয়েটির বয়স হবে হয়তো বিশ-একুশ, কিন্তু চোখে চল্লিশের মন্থর প্রাজ্ঞতা। ওর গভীর কালো চোখে বয়সের স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতা ক্লান্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে যেন।

হঠাৎ দুটো হাত আর দুটো হাতকে পরম আবেগে চেপে ধরে। দুটো পরুষ মুঠোর আশ্রয়ে কেঁপে ওঠে দুটো রোগা রোগা হাত।

অবনী ডাকলো, "সুধা!"

সুধা আস্তে আস্তে বললে, "দাঁড়িয়েছিলুম—যদি আসো।"

অবনী লঘুভাবে বললে, "আর যদি না আসতুম।"

"দাঁড়িয়েই থাকতুম।" সুধা একটু ম্লান হেসে বললে, "এমনি কতোদিনই তো থেকেছি।"

কথাটা আঘাত দেয় অবনীকে। প্রসঙ্গ বদলে সে তাই বললে, "কই—তোমার মামা-মামী কই, ছেলেমেয়েরা"—

"সবাই নেমন্তন্নে গেছেন।" সুধা বললে, "তাই তোমাকে চিঠি লিখেছি—কয়েকটা কথা বলবো বলে।"

সুধার ভারি ভারি কথা, ভঙ্গিটাও কেমন থমথমে। আসন্ন একটা বেয়াড়া কিছুর ভয়ে তাড়াতাড়ি সে বলে উঠলো, "কিছুদিন নানা

ঝামেলায় বিব্রত ছিলুম সুধা। আসতে পারিনি।" তারপর সোৎসাহে বলে ফেললে, "জানো সুধা—একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছি।"

ব্যবসা! হঠাৎ সুধার ম্লান মরা গলাতেও উৎসাহের ছোঁয়া লাগে। ওই একটা কথা যেন তার বিষণ্ণ চোখের ওপর থেকে মস্ত একটা কালো পর্দা সরিয়ে দিল। সুধা বললে, "ও মা, সে আবার কবে থেকে হলো?"

অবনী বললে, "তাই নিয়েই তো মেতে ছিলুম কিছু দিন। যাই হোক, ব্যবসাটা জমে উঠেছে।"

"কি ব্যবসা?"

"কি জানি, তুমি শুনে আবার কি বলবে।" অবনী বললে, "একটা ধোবীখানা আর তার সঙ্গে টেলারিং।"

সুধা নিঃশব্দে একটু হাসলো।

অবনী সক্ষোভে বললে, "হাসলে যে? তোমারও পছন্দ হলো না বুঝি!"

সুধা বললে, "তোমার ওই ব্যবসার কথা শুনে মামা কালই না তোমার কাছে ধার করতে ছোটেন। এদিকে এঁদের চরম অবস্থা।"

সুধার কথায় লঘু আবহাওয়াটা আবার গুমোটে ভরে আসে।

সুধা বললে, "তুমি কালই একবার মামা-মামীর সঙ্গে দেখা করো।"

"কেন সুধা—ব্যাপার কি?"

"তুমি দেখা করো না—আসো না, ওঁরা ভাবেন—তুমি এড়িয়ে পালাচ্ছ।"

"কেন তাঁরা ও কথা ভাবেন?" অবনী যেন খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো, "একদিন তোমার দাদার মৃত্যুশয্যার পাশে আমি তোমার ভার নিয়েছিলুম—তোমার মামা-মামীকেও তো নিশ্চিন্ত হতে বলেছি।"—

"তারপর ছ'বছর কেটে গেছে।" সুধা আস্তে আস্তে বললে।

"জানি সুধা।" অবনী বললে, "কিন্তু তুমি তো জানো—এর মধ্যে আমি কিছুই সুবিধে করে উঠতে পারিনি।"

"বোঝ না তুমি, এ সংসারে গলগ্রহ হয়ে আমারও যে দিন কাটে না। মাঝে মাঝে ভাবি—এর চেয়ে মরণ ভালো।"

"সুধা!" অবনী একটা হাত চেপে ধরে সুধার। আস্তে আস্তে বললে, "জানো তুমি—বেকার অবনী মুখুজ্যের দিনগুলো কেমন করে কেটে গেছে এতোদিন? কাজের জন্যে দিনের পর দিন ঘুরে মরেছি হন্যে কুকুরের মতো—আর রাতের পর রাত ধরে মেলে দিয়েছি আমার স্বপ্নের সংসারটুকু। মনে মনে ঘর গড়েছি সে এক নেই-রাজ্যে। সে যে কতো কথা—তার খবর কেউ জানে না।"

একটা পঁচিশ বছরের বেকার যুবকের সে স্বপ্নসৌধ রচনার খবর কেউ জানে না। নিষ্ফল স্বপ্নের মতোই সেটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এত ব্যর্থ সেটা। আশ্চর্য, তবু সেখানে জীবন্ত প্রেম আছে, হৃৎপিণ্ডের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত রক্তপ্রবাহ আছে, স্বপ্ন আছে তবু—আছে দুরন্ত কামনা। মানুষ কতো বড় যাদুকর স্রষ্টা কে জানে। আজ তার সেই সৃষ্টির যাদুদণ্ডের স্পর্শে গভীর কোন স্বপ্নের ছায়াপাত হয় সুধার আচ্ছন্ন দুটো চোখেও। বুক কাঁপে তার—ঠোঁট কাঁপে। স্বপ্নের মতো কথাগুলো যেন কোন মিলন মুহূর্তকে আসন্ন করে তুলে। একটা পরম আবেশে দেহের সমস্ত গ্রন্থিগুলো যেন গলে গলে পড়তে চায়—চোখ হয়ে আসে ঝাপসা।

অবনী তখনও বলেছিল, "তুমিও বি. এ. পাশ করবে—তারপর চাকরি-বাকরি জুটে যাবে একটা। তারপর তুমি আর আমি—আর আমাদের ছোট্ট সংসারটুকু।"

শেষকালে অবনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "সব উলটেপালটে গেল সুধা। সাধ আর স্বপ্নগুলো আমার আজও হারিয়ে যায়নি। এখন ব্যবসাটা জমে উঠছে আস্তে আস্তে। আর একটু জমে উঠুক। তারপর হতভাগা অবনী মুখুজ্যের লক্ষ্মীলাভ।"

সুধার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস। একটা আবেগকে চেপে আস্তে আস্তে সে বললে, "তবু মামা-মামীর সঙ্গে তুমি একটু দেখা করো।"

নতুন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে সেদিন ফিরে এলো অবনী। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার সামান্য ব্যবসাটুকুতে।

মাসখানেক চলার পর ধোবীখানাটা যখন জমলো ভালো ভাবে—কাপড়-চোপড় আসতে লাগলো বেশী বেশী—তখন হঠাৎ একদিন কাপড়ের বোঝা নিয়ে ধোপা সেই যে গেল—এলো না আর। অবনী পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। কিন্তু বৃথা সবই—ধোপার পাত্তা পাওয়া গেল না। কেবল বাকি কাপড় ও জামার রসিদ নিয়ে চেনা-অচেনা মানুষ ধাওয়া করতে লাগলো বাড়ি পর্যন্ত : হয় তাদের কাপড় ফেরৎ দেওয়া হোক—না হয় কাপড়ের দাম।

সে-সব কিছু কিছু প্রাণপণে মিটিয়ে অবনী গুম হয়ে ঘরে এসে বসলো। সেলাই কলের কোম্পানী ইন্‌স্টলমেণ্টের টাকা না পেয়ে টেনে বার করে নিয়ে গেল কল। মাস দুই ভাড়া না পেয়ে বাড়ি-ওয়ালা আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়ে গেল। অবনী একেবারে স্তব্ধ। আর মহামায়াকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরলো একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য!

কল্যাণী প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, "এ কি হলো মা! কি হবে এখন!"

মহামায়া উদাসীন ভাবে শুধু বললেন, "তোমাদের সংসার তোমরা বোঝ মা। আমি আর কিছু জানি না।"

"কিন্তু তুমি না বুঝলে—না শক্ত হলে—"

"আর শক্ত হওয়ার কি আছে বল তো আমাকে।" মহামায়া প্রায় কেঁদে ফেললেন।

এ পরিবারের আর কোথাও কিছু নেই। অখ্যাত আমতলা লেনের পূর্ব-পুরুষের ভদ্রাসনটুকু এক পুরুষ আগেই ভাড়াটে বাড়িতে হয়ে গেছে রূপান্তরিত। সোনাদানা নিঃশেষ, চাকরি-বাকরি নেই—পুঁজি যেটুকু ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। সামনে অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত দিন।

এমন দুর্দিনে নরেনকে মনে পড়লো মহামায়ার। একদিন হঠাৎ বললেন, "নরেন তো কৈ আর আসে না কল্যাণী!"

"ডেকে পাঠাবো মা!" কল্যাণীর ব্যাকুল আগ্রহ চাপা থাকে না।

কিন্তু আগ্রহের সে ব্যাকুলতায় মহামায়া কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মেয়েটার মুখের দিকে। তাঁর সন্দেহ সংশয়, তাঁর দ্বিধা আর সংকোচ প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘূর্ণাবেগে আলোড়িত হতে লাগলো চোখের সামনে। কানে তাঁর তীক্ষ্ণ হয়ে বেজেছে নরেনকে ডেকে পাঠানোর জন্যে কল্যাণীর প্রবল আগ্রহ, বুক কেঁপে উঠেছে অজানা আশংকায় হঠাৎ উজ্জ্বল মেয়ের মুখটার দিকে চেয়ে। ভয় পেয়েছেন কিন্তু উপায় কী; এরই মধ্যে দিয়ে তাঁকে পথ কেটে যেতে হবে। আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মহামায়া বললেন, "ডেকে পাঠা একবার তবে।"

৬

পরের দিন নরেন এলো অফিস ফেরতা। তখন প্রায় সন্ধ্যা। ধোঁয়ায় আর অন্ধকারে গলিটা ঘনঘোর হয়ে আছে। ঘরের ভেতরে ততোধিক গুমোট। তারই মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে অবনী। যুদ্ধের একটা মারাত্মক পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর একটা জেনারেলের মতো মুখে গাম্ভীর্য তার—যেন সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে নিমগ্ন। কদিন খেউরি হয়নি—মুখে গজানো দাড়ি গোঁফ। মাথার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তার চিহ্নস্বরূপ অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল।

নরেন তাকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বললে, "এ কি মূর্তি অবনী—তোমার ব্যবসার শোকচিহ্ন না-কি?"

অবনী আজ চটলো না। বরং হেসে বললে, "ছেলেবেলায় ঈসপের গল্পে পড়েছিলুম—একটা আধ-মরা সিংহকে একদা একটা গাধা সগর্বে লাথি মেরেছিল।"

"ভাখো তা হলে—গাধা হলেও লাথিটা তার লাথিই।" বলে নরেন দরাজ গলায় হা-হা করে হাসতে লাগলো।

সে হাসি তির্যক বেগে গিয়ে ঢুকলো অন্দরে।

কল্যাণী সচকিত হয়ে বললে, "মা, নরেন দা' এসেছে বোধ হচ্ছে।"

সেই উচ্ছ্বসিত আগ্রহ কণ্ঠে—মহামায়া যাতে ভয় পান চিরদিন। কেঁপে ওঠে তাঁর জপের মালা ধরা হাত—দোষ দেন ভাগ্যের। মহামায়া সংযত কণ্ঠে বললেন, "আমি যাচ্ছি—তুই একটু চা তৈরি কর।"

"চা তৈরীই আছে মা—দাদার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলুম।" কল্যাণী যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

মহামায়া কঠিন গলায় ডাকলেন, "শোন।"

কল্যাণী ঘুরে দাঁড়ালো।

মহামায়া হুকুম দিলেন, "তুই রান্নাঘরে যা—শান্তাকে পাঠিয়ে দে।"

কল্যাণীর চোখে সহজ জিজ্ঞাসা। মুখে ওর বোকা-বোকা ভাব। কিন্তু মহামায়ার মনের হদিস সে পায়নি কোনদিন—আজও পেল না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে সে শুধু দেখলো, শান্তাকে ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়ে হঠাৎ ধোপ দুরস্ত করতে লেগে গেছেন মা। শান্তা তাঁর ঘরস্থি মেয়ে। বার দুই ম্যাট্রিকটা পাশ করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত লেগে গেছে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের চাকা ঠেলতে। বয়স হলো ওর উনিশ-কুড়ি। সে যেন বুক চেপে বসে আছে মহামায়ার। আপাতত তাঁর চিন্তা, নরেনকে দিয়ে এ মেয়েটার যদি একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যায়।

সাদাসিধে একটু সাজগোছ করে দিয়ে শান্তার হাতে মহামায়া বাইরে চা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একটু বাদে নিজেও গেলেন পেছনে পেছনে।

এদিকে রান্নাঘরের এক কোণ থেকে কল্যাণী উৎকর্ণ হয়ে রইলো ভাগ্যহীন এ পরিবারের ভাগ্যের জল্পনা-কল্পনা শোনবার জন্যে।

কিন্তু জল্পনা-কল্পনার মধ্যে শোনা যায় শুধু মহামায়ার একঘেয়ে গলার কাঁদুনিই, ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো বহুদিনের শোনা

—বহুদিনের পুনরাবৃত্তি : কবে দশ বছরের মেয়েটি বউ হয়ে ঢুকেছিলেন এই পরিবারে—সেদিন থেকে জ্বলেপুড়ে খাক হতে হতে এসে পৌঁছেচেন বর্তমানের নিঃস্বতায়। এই তাঁর ভাগ্য!

কিন্তু পথ কোথায়—পথ কোথায় বলো! ··· পাশের ঘর থেকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে রইলো কল্যাণী।

নরেন জিজ্ঞেস করলে, "এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জের কোনো খবর পেলে নাকি অবনী?"

"সবটা জোচ্চুরি—ধোঁকা।" অবনী উত্তরে গালাগাল দিয়ে উঠলো।

"আর তোমার সেই জাতীয় ব্যাঙ্কের খবর? তোমাকে তো ওরা আশা দিয়েছিল।"

"তা দিয়েছিল বটে তবে এখন হাজার হাজার মানুষকে আমার চেয়েও বেশী হতাশ করে লালবাতিটা পুরোপুরি ভাবেই জ্বেলেছে।"

কিছুক্ষণ কারুর আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

কিন্তু বলো—বলো, পিছলানো জীবন—অনিশ্চিত দিন—আর দুরন্ত ক্ষুধার সামনে পথ কোথায় বলো। ··· কোনো একটা নতুন কথা শোনবার জন্যে কল্যাণীর সমস্ত চেতনা সেই মুহূর্তে উৎকণ্ঠিত।

নরেন বললে, "একটা কথা মনে আসছে খুড়িমা—কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না আপনাকে।"

"বলো নরেন—সব খুলে বলো!" আর্তনাদের মতো শোনায় মহামায়ার গলা, "বলো—কাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে এখন কি করি—কোথায় যাই!"—

নরেন একটু ইতস্তত করে বললে, "আমাদের অফিসের টাইপিস্ট অসুস্থ—মাস দুই ছুটি নেবে শুনেছি। তার জায়গায় এক্ষুনি লোক দরকার হবে। আমি বলি কি—কল্যাণী একটা দরখাস্ত করে দিক। তুমি কি বলো অবনী?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়।" অবনী হঠাৎ একটা পথ পেয়ে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে, "কল্যাণী যদি আপাতত পেয়ে যায়

চাকরিটা তা হলে আমি একটু দম নেওয়ার সময় পাই। তারপরে সবটা আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো।”

নরেন বললে, “ভেতর থেকে যাকে যা ধরবার বা বলবার—তা আমি প্রাণপনে করবো। আর কল্যাণীর এ কাজটা হতে খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। টাইপের স্পিড তো ওর ভালোই—তার ওপর ও স্টেনো, চাই কি ওকে পাকাপাকি নিয়ে নিতেও পারে।”

ও কথায় হঠাৎ বুক কেঁপে ওঠে কেন কল্যাণীর? শুধু বুক নয়—সর্বাঙ্গ কাঁপছে যেন। কান খাড়া করে রইলো মহামায়ার উত্তর শোনবার জন্যে।

কিন্তু মহামায়া কপাল চাপড়ে বললেন, “শেষ পর্যন্ত কপালে আমার এও লেখা ছিল!”

“ও সব আজে-বাজে কথা রাখো দেখি।” অবনী খ্যার খ্যার করে বললে, “আমরা তোমার কপালে তো শুধুই শনিগ্রহ।—যতো সব!”—

“ওরে, তোর একটা চাকরি হলে কি আমি আর এই কথা বলতুম! শেষ কালে কি-না মেয়ে”—

“মেয়েদেরই এখন চাকরির সুবিধে-টুবিধে কিছু আছে তবু। আমাদের ওই ঘোরাঘুরিই সার।” অবনী নরেনকে বললে, “আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছি, বুঝলে নরেন। আমি ভাবছি—এবার বাড়িতেই কাপড়-কাচা কল একটা কিনে নামবো আর একবার।”—

“দোহাই অবনী! ওটা বরং আর কারুকে দিয়ে কিনিয়ে তুমি সেখানে একটা চাকরির চেষ্টা করো।” বলে নরেন হেসে উঠলো আবার হা-হা করে।

অবনী এবার চটে গেল, “ঠাট্টা বিদ্রূপ করছো—করো! সব জিনিসটা ম্যানেজ করতে পারলে দেখিয়ে দেবো আমি। বুঝলে, শুধু এবার একটা—একটা কাপড়-কাচা কল, তারপর দেখে নেবে ওই জোচ্চোর ধোবী ব্যাটাদের।”

অবনীর প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে নরেন বললে, "তা হলে কল্যাণী একটা দরখাস্ত করুক খুড়িমা?"

মহামায়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আমি এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না নরেন। তোমাকে আমি পরে বলবো।"

শান্তাকে নিয়ে মহামায়া যখন ফিরে এলেন বাইরের ঘর থেকে—কল্যাণী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেল। মহামায়ার মুখে মস্ত বড় একটা পরাজয়ের গ্লানি আঁকা। গোঁড়া পণ্ডিত বংশের মেয়ে সেই মহামায়ার যেন এ মূর্তি নয়—তার একটা জড়ো করা ভাঙাচুরো টুকরো। কল্যাণী বিরস মুখে সভয়ে চেয়ে রইলো মায়ের কালো মুখটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "নরেনদা কি বললে মা।"

"সে কি বলবে—তা কি তুমি জানো না বাছা!"

কল্যাণী ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে তার সাহস হলো না।

মহামায়া সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হার হয়ে গেছে—হার হয়ে গেছে তাঁর নির্মম কালের কাছে, হার হয়ে গেছে নরেনের কাছে। কঠিন মুখে চোখ বুজে শুধু ভাবতে লাগলেন—দুরন্ত কাল আর ভাগ্যবিপর্যয়কে তিনি পবিত্র সতীধর্মের বেড়া দিয়ে আর রুখতে পারলেন না বোধ করি।

৭

মহামায়া যে-কদিন পারলেন মুখ বুজে রইলেন। আর মনে মনে ডাকতে লাগলেন যতো রাজ্যের দেবদেবীকে—ঠাকুর, অবনীর একটা চাকরি জুটিয়ে দাও। কল্যাণীর চাকরির দরখাস্ত সম্পর্কে একটা কথাও আর তুললেন না।

তাঁর শোয়ার ঘরের এক কোণে সাজানো ইষ্টদেবতার পট—ধূপ-দীপ পুষ্পমাল্যের পবিত্র স্থানটুকু, জীবনের শেষ অবলম্বন। তার সামনে চোখ বুজে জপে বসেন তিনি। কিন্তু জপ আর হয় না—চোখ বুজলেই দেখেন, এ নিষ্ঠুর সংসার—নিষ্ঠুর কাল তাঁর শান্ত সমাহিত নির্বোধ জগৎটাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। কোনো অবলম্বন আর তিনি খুঁজে পান না।

বড় দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর পুরানো কালের কথা—যখন সংসার বহনের এ তীব্রতা ছিল না। শ্বশুর করতেন ভাগবৎ পাঠ—এ অঞ্চলের সেরা কথক। বাপের বাড়ির মতই এ বাড়িতেও টোল-সংস্কৃতির ধারা ছিল প্রবাহিত। শিবশংকরও সেই ধারারই মানুষ—কেবল নিজের একান্ত চেষ্টায় লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়ে পড়ে বি. এ. পর্যন্ত পাস করেছিলেন। সেও আর কবে—মহামায়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অনেক পরে।

মহামায়া প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ি এলো—এ অঞ্চল তখন গ্রামেরই সামিল। শ্বশুর বিরজাশংকর এখানে ওখানে ভাগবৎ পাঠ করে বেড়ান, অবসর সময়ে দু-একটি ছাত্রকে ভারতের পুরা ঐতিহ্যের মর্ম ব্যাখ্যা করে শোনান। ঘরে নিত্য বিগ্রহের পূজা—তার আয়োজন ও উপকরণ সংগ্রহ আর সংসারের নিত্য কর্তব্য, মেয়েরা এই নিয়েই ব্যস্ত। আর এ সংসারে মেয়ে বলতে তো মাত্র দু'জন—মা আনন্দময়ী এবং বউ মহামায়া। বহির্বিশ্বের কোনো আলোড়ন বা আঘাত সংঘাত তাদের স্পর্শমাত্র করেনি। কি শান্ত সমাহিত পবিত্র একটি পরিবেশ জড়িয়ে ছিল সর্বত্র! ক্রোশখানেক উত্তরে তখন মহানগরীর নতুন শড়ক এসে থমকে ছিল তার কোলাহল আর ক্লেদ, তার ম্লেচ্ছাচার আর অপবিত্রতা নিয়ে।

এমন দিনে অঘোর পণ্ডিতের বিধবা সারদামনি কোথায় না কোথায় চলে গেল।

পাড়ার মাতব্বর ব্রাহ্মণ সমাজ জড়ো হয়ে এলো বিরজাশংকরের কাছে। শাস্তি বিধানের কোলাহল উঠলো বৈঠকখানা ঘরে।

বিরজাশংকর মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু শাস্তি দেবে কাকে ?"

তাই তো, হতভাগী মেয়েটার তিনকুলে কেউই এমন নেই যে তার ঘাড়ে ধরে টেনে এনে একটা গুরুতর শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় !

কিন্তু সকলের মুখে প্রশ্ন : মেয়েটা গেল কোথায় ? দেবদ্বিজে তার অতো ভক্তি, বিরজাশংকরের ভাগবৎ শ্রবণে তার এমন নিষ্ঠা— যার জন্যে স্বয়ং বিরজাশংকর তার বাড়ি পর্যন্ত যেতেন, ধর্মে অচলা নিষ্ঠার জন্য উপদেশাদি দিতেন—সে সব দু' পায়ে দলে দিয়ে মেয়েটা কোথায় না কোথায় পালালো !

তরুণী বিধবা, ছেলেপুলে নেই—কারুর সঙ্গেই সে পাপ নিশ্চয়ই পালিয়েছে। নেতা-সমাজ নিরুদ্ধ ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল।

তার এই পালানোর খবরটা মহামায়া বলেছিল শিবশংকরকে। শুনে শিবশংকর কট্ কট্ করে বলে উঠেছিলেন, "আমি মরে গেলে তোমারও ওই হাল হবে।"

ছি ছি ছি—মহামায়া কানে আঙুল দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল। এ লোকের মুখে কোনো বাঁধন নেই—পাপ কথা উচ্চারণ করতে এক লহমাও বাধে না।

সেইদিন রাতেই শিবশংকর তাকে বুঝিয়েছিলেন, "বাংলা লেখা-পড়া যখন জানোই তখন একটু একটু করে ইংরেজিও পড়। পড়াশোনা একটু করা ভালো।"

"পড়বো কখন !" মহামায়া হেসেছিল।

শিবশংকর বলেছিলেন, "কেন, এই রাতের বেলা—আমি যখন পড়ি। ধরো, এমনি করে পড়ে পড়ে তুমি ম্যাট্রিকটা পাস করে ফেললে। তখন যদি আমি মরেও যাই—তোমার কোনো ভয় নেই।"

"আবার সেই কথা ! ছি ছি ছি।" মহামায়া শিবশংকরের মুখ চেপে ধরেছিল।

শিবশংকর তাকে আদর করে বলেছিলেন, "না হয় নাই মরলুম—ধরো তোমার বিপদ আপদও কিছু হলো না, কিন্তু লেখাপড়া শিখতে

দোষ কি!' নিজের ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবে—আরও পাঁচটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারবে। তোমার বাপের পণ্ডিত বংশ—তুমিও সেই বংশের মেয়ে, বিদ্যাদান করবে, এ কত্তো আনন্দের কথা।"

শিবশংকরের জবরদস্তিতে রাত্রে ঘরের দরোজা বন্ধ করে শুরু হলো মহামায়ার লেখাপড়া। শিবশংকর রাত্রি জেগে জেগে পড়েন। আপাতত তার সে লেখাপড়া মুলতুবি রইলো। মহামায়ার এই পড়াশোনার কথা কেউ জানলো না। কারণ, এ খবর জানলে কড়া মানুষ বিরজাশংকরের মনের ভাব যে কি রকম হবে, তা শিবশংকর ভালো করেই জানতেন। তবু তাঁর উৎসাহের শেষ নেই। মহামায়াকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মতলব ঠিক করলেন—মহামায়া যাতে তার বাপের বাড়ি থেকে নিশ্চিন্তে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারে। সেই ভাবে তিনি হাজির হলেন মহামায়ার বাবা আদিত্যমোহনের কাছে।

ব্যাপার শুনে আদিত্যমোহন রুষ্ট হয়ে উঠলেন, "কী—শেষ পর্যন্ত পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে ম্লেচ্ছ শিক্ষাদীক্ষা! বিবিয়ানার আর বাকি রইল কি!"

মহামায়ার পুঁথিপত্র ছিঁড়েপুড়ে তক্ষুনি তাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুরবাড়ি, "এমন মেয়ের মুখও আর দেখতে চাইনে।" বলে বেয়াইকে তিনি সবিস্তারে চিঠি লিখে দিলেন।

বিরজাশংকর সে চিঠি পড়ে বলেছিলেন—"আসছে, পাপের কাল ঘনিয়ে আসছে। নইলে আমারই বাড়িতে এই কাণ্ড ঘটতে যাবে কেন?"

শিবশংকর নিঃশব্দে গা ঢাকা দিলেন। ব্যাপারটা শিবশংকরকে এতটাই আঘাত দিয়েছিল যে, রাত্রে লুকিয়েচুরিয়ে নিজের পড়াশোনার পাটও তিনি তুলে দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে।

তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছিল আবার বিরজাশংকরের মৃত্যুর পর। তখন তিনি মোক্ষদাসুন্দরী হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা নিয়ে মেতে উঠেছেন—

এ অঞ্চলের প্রথম ইংরেজী স্কুল। ভাগবৎ পাঠ ও কথকতার ধারা শেষ হয়ে গেল বিরজাশংকরের সঙ্গে সঙ্গে।

তবু ঘরের আবহাওয়ায় তখনও ছিল পবিত্র শান্ত একটি পরিবেশ। মনে পড়ে বিধবা শ্বাশুড়ী আনন্দময়ীর করুণ পবিত্র মুখটি—মনে পড়ে তাঁর ব্রত-উপবাসক্লিষ্ট জীবন ও সংযত নিয়মনিষ্ঠা। দিনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে তাঁর পাতিব্রত্য প্রকাশ পেত। স্বামীর পরিত্যক্ত খড়মজোড়া পুজো করতেন, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি—ছড়ি-ছাতা উড়ুনি রোজ ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রাখতেন, তাঁর পরিত্যক্ত পুঁথিপত্রে পেতেন না জানি কোন হারানো মানুষটির স্পর্শ। তাঁর ফেলে যাওয়া একটি কুটো কাগজও তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সযত্নে গুছিয়ে তুলে রাখতেন নিজের বাক্সে। মহামায়া লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছে—কখনো কখনো শ্বাশুড়ি ঠাকরুন দুপুর বেলা ঘর বন্ধ করে সেগুলি খুলে খুলে দেখতেন। লেখাপড়া তিনি একেবারে জানতেন না—তবু সেই মৃত মানুষটির হস্তাক্ষরে তিনি কি স্পর্শ পেতেন কি জানি। অতবড় কুলীনের একটি মাত্র স্ত্রী—এ তাঁর গর্ব ছিল ভারি, যখন কুলীনেরা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করতো। বিধবা আনন্দময়ীর বিষণ্ণ মুখে ছিল স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমের গর্ব।

বিরজাশংকরের মৃত্যুর মাসখানেক পরে তাঁর নামে কতকগুলো চিঠি আসতে লাগলো কোথা থেকে। কি চিঠি না কি চিঠি—মহামায়ার কৌতূহল ছিল না বড় একটা। সে শুধু দেখতো—চিঠি এলে শিবশংকর সেদিন সারাদিন কেমন বিচলিত হয়ে থাকতেন, চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন সঙ্গে সঙ্গে।

একদিন আনন্দময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তোমার শ্বশুরের নামে কার চিঠি আসে বৌমা?”

মহামায়া নির্বোধভাবে বলেছিল, “কি জানি মা, বাবার নামে আসে—এই পর্যন্ত জানি।”

“কি চিঠি না কি চিঠি সে ছিঁড়ে ফেলে!” আনন্দময়ী ম্রিয়মাণ হয়ে বলেছিলেন, “এবার চিঠি এলে আমায় বলো তো।”

চিঠি সম্পর্কে শিবশংকরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে শুধু কঠিন মুখে বলতো, "ও সে কিছু না।"

ভারি কৌতূহল মহামায়ার। একদিন আবার এলো সেই চিঠি। শিবশংকরের হাতে পড়ার আগেই মহামায়া সেটাকে করায়ত্ত করে একেবারে গিয়ে তুলে দিল আনন্দময়ীর হাতে।

আনন্দময়ী বললেন, "তুমি তো পড়তে জান বাছা—পড়ো তো।"

মহামায়া চিঠি পড়তে লাগলো। কিন্তু পড়ে শেষ করার আগে ভয়ে বিস্ময়ে লজ্জায় থেমে থেমে গেল কয়েকবার। কাশী থেকে কে একটি মেয়ে চিঠি লিখছে—প্রথমে কাকুতি মিনতি, তারপর ভীতি প্রদর্শন। বিরজাশংকর মাসিক ভাতা নিয়মিত পাঠায় তো ভালো, নইলে কলকাতায় গিয়ে সব কুকীর্তি সে ফাঁস করে দেবে।

আনন্দময়ীর চোখে জিজ্ঞাসা—দৃষ্টি প্রখর। সে মুখের দিকে মহামায়া সভয়ে চেয়ে ছিল।

আনন্দময়ী বললে, "কে লিখেছে?—তার নাম?"

মহামায়ার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কয়েকবার ঢোক গিলে বলেছিল, "সারদামনি।"

"কে!" জিজ্ঞেস করা তো নয়—আনন্দময়ী হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

মহামায়া মুখ নিচু করে বসেছিল—কম্পিত হাতে চিঠিটা ধরা। আনন্দমী সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে বলে উঠেছিলেন, "দেখি চিঠিটা।"

অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা তিনি দেখলেন। তারপর বললেন, "দেখো তো বউ মা—এই চিঠিগুলো।" বলে তাঁর বাক্স থেকে সযত্নে গচ্ছিত কতকগুলো খাম টেনে বার করলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে—ওই রকম বড় বড় হাতের ছাঁদে লেখা চিঠি খানকয়েক যেন আমি ওর মধ্যে দেখেছি। দেখ তো।"—

মহামায়া কম্পিত হাতে চিঠিগুলো ঘেঁটেছিল। তার সবগুলোই প্রায় আনন্দময়ীকে লেখা—আনন্দময়ীর ব্যাক্সে সযত্নে গচ্ছিত হয়ে অতীতের এক প্রেম ও নিষ্ঠার স্মৃতি বহন করছে। তার মধ্যে থেকে

বেরিয়ে পড়লো শুধু কঠিন বিদ্রূপের মতো খান দুই চিঠি—যা সারদামনির লেখা। বিরজাশংকরের পুঁথিপত্রের ভেতর থেকে পেয়ে গেছেন—অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ স্বামীর পবিত্র স্মৃতি বলে তাকে গুছিয়েও রেখেছেন। তার একখানা চিঠিতে ছিল সারদামনির দেশত্যাগের কলঙ্কিত কাহিনী, কাশীর কোন স্নানের ঘাটে এক পুত্র প্রসবের কথা এবং তাকে রক্ষা করার করুণ আবেদন: সে শিশু পথের শিশু হলেও তার পিতা পুণ্যবান বিরজাশংকর।

পড়তে পড়তে মহামায়ার গলা শুকিয়ে কাঠ।

মনে পড়ে, সেই চিঠি দু'খানা হাতে করে আনন্দময়ী পাথরের মতো বসে ছিলেন বহুক্ষণ।

তারপর সে চিঠির প্রসঙ্গ মহামায়া আর জানেন না। কিন্তু এটা ভালো করে জানেন—আনন্দময়ীর মুখ থেকে সেই পবিত্র স্নিগ্ধ আলোটি কোনোদিন সরে যায়নি। সেই নিষ্ঠা, সংযম এবং পাতিব্রত্যের শুচিস্নিগ্ধ আলোটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষর-জ্ঞানহীন সেই নারীর মুখে কেমন প্রদীপ্ত হয়ে ফুটে ছিল। মহামায়া হাত জোড় করে মনে মনে বারবার প্রণাম করেন সেই সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি পতিব্রতার উদ্দেশে। আর নিজেকে অভিসম্পাত দেন—আজ কোন এক অশুভ কালে এসে তাঁকে চরম দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। কোথায় গেল নারীর পবিত্র গৃহকোণ, কোথায় গেল তার সতীধর্মের আচারনিষ্ঠা ও মহিমা—আজ বিধবা কল্যাণীকে যেতে হবে কি-না চাকরি করতে! মনে মনে ডাকতে লাগলেন তিনি—হে ভগবান, তার আগে যেন তাঁর মরণ হয়।

কিন্তু পোড়া মরণ আর হয় কই! নিঃসম্বল কপর্দকহীন সংসারে জ্যান্তই মরতে হয় হাজার বার। একদিন সকাল থেকে তিনি জপের মালা নিয়ে কাঠ মেরে বসে রইলেন। ঘরে একটা ক্ষুদকুঁড়োও নেই। উনুনে আগুন ধরলো না। কিছুটা বেলা পর্যন্ত মুখ বুজে রইলো সবাই। মিলু আর বিলু কয়েকবার মুখ শুকনো করে ঘুরে গেল

মায়ের পাথর মূর্তির সামনে দিয়ে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো গিয়ে কল্যাণীর সামনে।

"দিদি ভাই, ক্ষিদে পেয়েছে।"

কল্যাণী মুখ শুকনো করে গিয়ে দাঁড়ালো অবনীর ঘরে। সে তখন আকাশ-পাতাল ভাবছে। কল্যাণী বললে, "দাদা, কিছু ধারটার না করে আনলে যে চলে না। ঘরে কিছুই নেই!"

"দেখি—কোথায় পাই।" অবনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠলো। তারপর বললে, "হ্যাঁরে, তোর সেই দরখাস্ত করার কি হলো? নরেন যে বলেছিল!"—

"মাকে সে কথা বলবে কে দাদা!" কল্যাণী বিরস মুখে বললে, "ও সে হবে না—ধরে নাও।"

"হবে না! অমনি বললেই হলো—হবে না।" মুহূর্তে অবনী স্বভাবসিদ্ধ ভাবে জ্বলে উঠলো, "ঘরের কোণে বসে বসে গোঁয়ার্তুমি!" —বলে সে ক্ষিপ্তবেগে গিয়ে দাঁড়ালো মহামায়ার সামনে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, "তুমি পেয়েছে কি বলো দেখি! কল্যাণীকে দরখাস্ত করতে দিচ্ছ না কেন?"

মহামায়া প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওরে, ও যদি তোর দরখাস্ত হতো"—

মহামায়ার কথা শেষ হলো না—অবনী প্রায় চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলে, "মেয়ে চাকরি করলে তোমার মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে গেল। যত্তো সব! মরো এবার সব তবে।"—বলে সে যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল।

দুঃসহ ক্ষুধার্ত একটা দুপুর—কি দীর্ঘ বলে মনে হয়। মিলু বিলু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে অথবা নেতিয়ে পড়েছে খালি পেটে। ওদের মাথার কাছে বসে আছে কল্যাণী—চোখে কখন জলের ধারা নেমেছিল, শুকিয়ে গেছে, আছে শুধু দাগটা। মহামায়া চেয়ে আছেন প্রখর চোখে—কে জানে চেয়ে আছেন কোথায়! তাঁর সেই

শান্ত সমাহিত অতীতে না দুজ্ঞেয় অশুভ এক ভবিষ্যতে। বিকেলের ক্লান্ত ছায়া নামছে এ গলিতে বড় আস্তে আস্তে—বিলম্বিত করুণ মূর্চ্ছনায়।

শান্তা ভয়ে ভয়ে মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে বললে, "এবেলা তা হলে কি হবে মা।"

শুকনো গলায় মহামায়া বললেন, "তোর দাদাকে জিজ্ঞেস করগে যা বাছা। তার সংসার—সেই বুঝুক এখন।"

শান্তা বললে, "সে তো সেই চেঁচামেচি করে বেরিয়ে গেছে কোথায় কে জানে! সে টাকা ধার করবে কোথায় না কোথায়—পেলে তবে রান্না! এত দেরী হচ্ছে যখন—হয়তো পায় নি।"—

সামনে সবে বিকেল। তারপর সুদীর্ঘ ক্ষুধার্ত রাত্রি।

বিলুটা চীৎকার করে উঠেছে আবার।...

নেই নেই—কিছু নেই আর এই দরিদ্র পরিবারটার। আছে শুধু অনটন, শিশুর ক্ষুধা, সমর্থ যুবকের কর্মহীনতা আর অরক্ষণীয়ার দীর্ঘশ্বাস।

মহামায়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন! হতাশ গলায় বললেন, "আমি কি করবো মা—একটু অপেক্ষা করে দেখো।" আর মনে মনে মাথা কুটতে লাগলেন—হে ভগবান ··· হে শংকরী। ···

জপের মালা সজোরে ঘুরতে লাগলো মহামায়ার হাতে।

অবনী ঘরে ফিরলো প্রায় সন্ধ্যের মুখোমুখি—হাতে বাজারের থলে।

শান্তা তাকে দেখে বলে উঠলো, "বাব্বাঃ, যা হোক তুমি এলে!"

অবনী তার সহজ গলায় বললে, "তুই বুঝবিনে। বেকার দেখলে পরম বন্ধুও ছুটে গিয়ে ট্রাম ধরে। তার ওপরে আবার ধার।"

অবনীর সাড়া পেয়ে কল্যাণী এসে দাঁড়ালো ঘর থেকে। তার পেছনে পেছনে এসে দাঁড়ালো মিলু আর বিলু। মহামায়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জপের মালা সুদ্ধ কপালে হাত ঠেকালেন।

অবনী বললে, "কোথাও ধার পেলুম না—শেষকালে নরেনকে গিয়ে ধরলুম অফিসে।" বলে পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ

বের করলো। কল্যাণীর দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই যে তোর দরখাস্ত—নরেন অফিস থেকে একেবারে টাইপ করে দিয়েছে। সই করে রাখ—কাল এসে সে নিয়ে যাবে।" বলে সে মহামায়ার দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা চলে গেল বাইরের ঘরে।

কল্যাণী তাকালো মহামায়ার নিরুপায় স্তব্ধ মুখটার দিকে। আস্তে আস্তে বললে, "সই করবো মা?"

মহামায়া তাকালেন তার দিকে হতাশ চোখ তুলে। তাকালেন একবার সারাদিনের ক্ষুধার্ত মিলু বিলুর মুখের দিকে। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলেন—পারলেন না। মন বললে তার—নেই নেই, কোনো পথ নেই, কোন উপায় নেই। আনন্দময়ীর কালের মানুষ তিনি—এসে পড়েছেন অভিশপ্ত এ কালের অপবিত্র অশান্তির মধ্যে।

সই করবার সম্মতিটুকু দিয়ে তিনি আর যেন বসে থাকতে পারলেন না সেখানে। উঠে চলে গেলেন।

কল্যাণী নিজের ঘরে এসে দরখাস্তটা পড়ে দেখলে একবার। কি জানি কেন, বুকটা কাঁপছে তার দুর্ দুর্ করে। অন্য আর একটা জীবনের সম্ভাবনায় মন তার বিচলিত। কেবলি মনে পড়তে লাগলো তার একটা লোককে—যে তার লেখাপড়ার পেছনে জুগিয়েছে নানা উৎসাহ, এঁকেছে কতদিন কতো আনন্দে ভরা জীবনের ছবির পর ছবি। শুধু তাই নয়—আজ সেই জীবনে তাকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্যে নিজে লিখেছে এই দরখাস্ত। অনুপস্থিত সেই লোকটার জন্যে মন তার ভরে ওঠে একান্ত কৃতজ্ঞতায়।

কে জানে চাকরি তার হবে কি না, তবু বহুদিনের স্বপ্নে দেখা মুক্ত-সচ্ছন্দ জীবন একটা তার সমস্ত আসন্ন আনন্দ নিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। পড়ে থাকে সই, সামনে টাইপ করা দরখাস্ত খানা মেলে ধরে হারিয়ে যায় মনের নানা কথায়। মায়ের সংস্কার, নরেন সম্পর্কে তাঁর একদিনকার সেই বিশ্রী মন্তব্য—সবগুলোকে ছাপিয়ে ওঠে তার আনন্দ। আর সে-আনন্দের মাঝখানে বার বার করে বলে সে—

একটা লোকের উৎসাহে, উপকারে, সহৃদয়তায় ধন্য হয়ে গেল সে। প্রতিদানে কিছুই তো চায়নি সে। কিন্তু যদি চায়—যদি সে এসে দাঁড়ায় তার সামনে আজ। ··· কেঁপে ওঠে কল্যাণী। সভয়ে তাকায় দরোজার দিকে। কার পায়ের শব্দ যেন।

না, মা নয়—দাদা।

অবনী বললে, "কি রে, সামনে দরখাস্ত নিয়ে ধ্যানে বসেছিস না কি! সই করেছিস?"

কল্যাণী সলজ্জে বললে, 'দিচ্ছি দাদা।"

"অত ভাবছিলি কি?"

কল্যাণী রাগ করে বললে, "যাও, সব কথা তোমাকে বলতে হবে না কি!"

অবনী বললে, "কি জানি ভাই, বেকার মানুষ। যেমন করে বসেছিলি—যেন অফিসেরই চেয়ার আলো করে বসে আছিস—মনে হলো, এই বুঝি বেয়ারা বলে ভুল করে বসিস্—এই অবনী, ফাইল লে যাও।"

৮

সামান্য একটা ইন্টারভিউর পর শেষ পর্যন্ত চাকরি হয়ে গেল কল্যাণীর।

চাকরিতে যোগ দেওয়ার দিন নরেন এলো কল্যাণীকে নিতে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রক্তোচ্ছ্বাসে অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠলো কল্যাণীর মুখটা। তাই দেখে আবার বুক কেঁপে উঠলো মহামায়ার।

কল্যাণীকে ডেকে আনলেন মহামায়া—তাঁর বাক্সপ্যাঁটরা হাতড়ে বার করলেন সযত্নে রক্ষিত তুলোট কাগজে তোলা আলতা-পরা পায়ের ছাপ একখানা! ঘর-ভাঙা আলোর বন্যার মাঝখানে তাঁর শেষ অবলম্বন—সামান্য একটু তৃণখণ্ড। কল্যাণীকে ডেকে নিয়ে ঘরে দরোজা দিলেন।

কল্যাণী অবাক হয়ে বললে, "কি মা!"

"আয়—বোস।"

মহামায়া নিজে কাগজখানা কপালে ঠেকালেন আগে—তারপর আস্তে আস্তে মেলে ধরলেন কল্যাণীর চোখের সামনে।

কল্যাণী সকৌতূহলে ঝুঁকে পড়লো কাগজখানার ওপরে। বহুদিনের শোনা ব্যাপার ঝিকিয়ে উঠলো চোখের সামনে। আবেগে বলে উঠলো, "মাগো—কি সুন্দর ছোট্ট পা দুখানি মা!"

"হ্যাঁ। শুনেছি মাত্র চোদ্দবছরের মেয়ে ছিলেন।"

সব কথাই শুনেছে কল্যাণী বাপের মুখ থেকে। এ ছাপের পেছনে যে নৃশংস কাহিনী একটা লুকিয়ে আছে—সেইটে মুহূর্তে ঝলকে উঠে যেন চোখের সামনে। কল্যাণীর ঠোঁট থেকে শুধু অস্ফুট একটা শব্দ খসে পড়লো :

"উঃ!"

মহামায়া বিচলিত হলেন কল্যাণীর চোখ মুখের ভঙ্গী দেখে। তবু নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে বললেন, "সতীধর্ম কি সহজ মা! এ পারে কেবল মহা পুণ্যবতীরাই।"

কল্যাণীর মনও সেই মুহূর্তে বিচলিত—আলোড়িত। ফস করে বলে ফেললে, "উনি নাকি শেষ পর্যন্ত পুড়ে মরেননি!"

"মিছে কথা—শত্রুদের বানানো কথা ও সব।"

কল্যাণী চুপ করে রইলো।

মহামায়া বললেন, "আমার পুণ্যাত্মা সত্যবাদী শাশুড়ী আমাকে মিছে কথা বলে যাননি—তাঁর শাশুড়ীও তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে বলে যাননি নিশ্চয়। তোমরা লেখাপড়াই শেখো আর চাকরিই করো বা যতো বড়ই হও—মেয়েদের জীবনে এই দুটো পায়ের চেয়ে বড় আর কিছু নেই মা। এই কথাটি মনে রেখো।"

কল্যাণী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো মায়ের তদ্গত মুখের দিকে।

মহামায়া কাগজখানা কল্যাণীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, "আমার মণি মানিক নেই কল্যাণী—ছিল এই পরম ধনটুকু। তোর হাতে দিলুম—জীবনে এর সম্মান রাখিস। এই দু-খানা আলতা-পরা পা-ই তোকে জীবনে সত্যিকারের পথটি দেখাবে।"

এতো কথা বলার পরেও মহামায়ার অস্বস্তি গেল না। কল্যাণীর ভাবলেশহীন মুখটার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো—সবটা বোধ হয় বলা হলো না। মৃত স্বামীর জন্যে বিধবার নিষ্ঠাব্রতের ধ্যান যে কি—শিবশংকর তা শেখাবার সুযোগ মহামায়াকে কোনোদিনই দেননি। সে যেন এ বাড়ির একটি কুমারী মেয়ে—শান্তারই মতো। তার জীবনে বিয়ের ব্যাপারটা যেমন ক্ষণস্থায়ী—তেমনি আকস্মিক।

সেইটে এবার মনে করিয়ে দিয়ে মহামায়া বললেন, "বিধবার জীবনে ওই দু-খানা পায়ের চেয়ে বড় আশ্রয় আর কিছুই নেই কল্যাণী। সহমরণের ভাগ্য একালের মেয়েদের আর নেই ঠিক। তাই আমার বিধবা শাশুড়ী বলতেন—বিধবাদের বেঁচে থেকেই সারাজীবন এই সহমরণের ব্রত পালন করতে হয়।"

শিবশংকর যাকে বলতেন—দগ্ধে দগ্ধে মারা। ··· মনে পড়ে গেল কল্যাণীর সেই কথাটা। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো জ্বালাই তো তার মনে নেই! কবে প্রথম কৈশোরে কি একটা ঘটনা ঘটেছিল—আজ চব্বিশ বছর বয়সে তার জন্যে দুঃখ বেদনার লেশমাত্র নেই তার মনে। জীবন তার কি—কি তার ভবিষ্যৎ, কোথায় তার বেদনা—ঘরের কোণে বসে এ নিয়ে সে ভাবেনি কোনদিন। স্কুল কলেজের মারফৎ, বাইরের আরও পাঁচটা পরিবেশের মারফৎ আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নের একটা পৃথিবীতে তাকে ছোটার সুযোগ দিয়ে গেছেন শিবশংকর। বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্ন-দেখা সে জীবন হয়তো বড় করুণ একটা পরিণতিতে এসে ঠেকেছে, তবু মন তার মরে যায়নি। বরং আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ মনটা আজ তার বেরিয়ে পড়েছে আরও বাইরে—কর্মমুখর পৃথিবীতে। দুঃখ বেদনা তো নেইই—বরং একটা দুর্জ্জেয় আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে সে আজ। এ শুধু কোনো একটা অফিসে চাকরি মাত্র নয়—

এ যেন তার জীবনে একটা অজ্ঞাতপূর্ব অভিযান। কোন একটা অজ্ঞাত রাজ্য তার সমস্ত বিস্ময় ও সমৃদ্ধি নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

তাই মহামায়া যখন বললেন, "বুঝি—বিধবা হয়ে যে কি জ্বালা মা—কি দুঃখ তোর"—

মহামায়ার কথা শেষ হলো না—কল্যাণী মায়ের মনের ভাব না বুঝেই ফস করে বলে ফেললে, "আমার কোনো দুঃখ নেই মা। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। দেখো না—তোমার আর একটা ছেলের মতোই তোমার দুঃখু ঘোচাবো আমি।"

তারপরে মহামায়া যে কি বলবেন আর কি করবেন—ভেবে পেলেন না। জপের মালাটা কেবল দ্রুত ঘুরতে লাগলো কম্পিত হাতে।

বাইরে থেকে এই সময়ে নরেন হাঁক পাড়লো, "কই কল্যাণী, হলো? দিলে—প্রথম দিনটাতেই দিলে দেরী করে।"

"আমি যাই মা।" বলে কল্যাণী ছিটকে বেরিয়ে গেল।

অবনী কি একটা ঠাট্টা করলে। বাড়ি থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল নরেন আর কল্যাণী।

কোন এক দুরন্ত আলোকোচ্ছ্বাসে উদ্‌ভাসিত কল্যাণীর মুখটার দিকে মহামায়া চোখ তুলে আর তাকাতে পারলেন না। কেবলি তাঁর মনে হতে লাগলো—এ মেয়েটা তাঁর ঘরের কোণের সেই শান্ত বাহির-ভীরু মেয়ে নয়, এ অন্য আর কেউ।

মহামায়া নিজের ঘরে দরোজা বন্ধ করে মাথা কুটতে লাগলেন তাঁর ঠাকুরের কাছে। আর একটি মেয়ে পেছন থেকে দেখতে লাগলো ওদের কুটিল চোখে—সে শান্তা। তার সবটাই নিঃশব্দ—গোপন। শুধু অবনীই একা চেঁচামেচি করে শুভেচ্ছা জানালে এবং প্রকাশ্যেই বলে বসলে আবার, "বর দিচ্ছি—চাকরিতে উন্নতি হোক তোর। জয় হোক। শুধু কাপড়-কাচা কল একটা কিনে দিস আমাকে সুবিধে মতো। ওই ব্যাটা জোচ্চোরদের একবার"—

সারাটা দিন মহামায়ার বড় অস্বস্তিতে কাটলো। ঘরের দরোজা বন্ধ করে তাঁর ইষ্ট-দেবতার কাছে তিনি কতো কি যে চাইলেন তার সীমা ও শেষ নেই।

সেদিন বিকেলে যখন অফিস থেকে ফিরে এলো কল্যাণী—মহামায়া তাকিয়ে দেখলেন তার মুখের দিকে। কোথায় সারা দিনের অফিস-খাটা ক্লান্তি, কোথায় বা শ্রান্তির চিহ্ন একটু—বরং দিনের শেষে, মনে হয়, যতো রাজ্যের দিনের আলোয় যেন মুখ চোখ ভরে ঘরে ফিরে এলো সে। সে আলো যেন আতঙ্কের মতো অসূর্যম্পশ্যা মহামায়ার কাছে।

কল্যাণীকে দেখে অবনীই শুধু সকলরবে বলে উঠলো আবার, "মুখটা যে তোর খুশীতে টলমল করছে রে কল্যাণী। কোথায় সারাদিন খেটেখুটে ঘরে ফিরবি দোয়াতের মতো মুখ করে!"

"যাও।" কল্যাণী সলজ্জে হেসে বললে, "আমার আঙুলের ডগাগুলো টনটন করছে—এতো টাইপ করেছি আজ। প্রথম দিনেই ওরা বোধ হয় যাচাই করে নিলে।"

"হারিসনি তো?"

"ইস—হারবো কেন?"

বিজয়িনী! মুখে ওর বিজয়িনীর দীপ্তি।

অবনী বললে, "তারপর,—তোর অফিসের গল্প কর। শুনে তবু কান সার্থক করুক বেকার অবনী।"

অবনী একাই সকলরবে ঘরের ঠাণ্ডা নীরবতাটাকে ভেঙে মুখর করে তুললো। সেখানে না সাড়া পাওয়া গেল মহামায়ার—না শান্তার। অবনীর সঙ্গে সঙ্গে শুধু নানান বায়নায় চেঁচামেচি করতে লাগলো মিলু আর বিলু।

"আমার জুতো কিনে দিস দিদি।"

"আমার বুস সার্ট একটা।"

"আর আমার ভয়েলের জামা একটা।'—

"ওরে হবে হবে—মাসের মাইনেটা পাই তো আগে।" কল্যাণী হেসে বললে, "সব হবে—সব কিনে দেবো।"

বিলু বললে, "মিলুর যে তুটো জিনিস হলো দিদি।"

"তবে তোরও তুটো হবে।" বলে বিলুকে কোলের দিকে টেনে নিলে কল্যাণী।

অবনী হেসে বললে, "তোর মাইনে কতো রে কল্যাণী?"

কল্যাণী অবনীর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু করুণ ভাবে হাসলো। বললে, "কেন? সব কিনতে পারবো না বুঝি!"

"না—তাই বলছিলুম।" অবনী অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলে।

ব্যাপারটা বোধ করি গোলমেলে মনে হলো বিলুর। সন্দেহ ভরে বললে, "দিবি তো দিদি কিনে?"

"ওরে দেবো দেবো।"—

আজ সহস্র ধারায়, স্নেহে সাধে প্রীতিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় সে। সে আজ পরিপূর্ণ—কোন একটা অজ্ঞাত উৎসের মুখ যেন খুলে গেছে তার অন্তরের গভীরে। জীবন বহনের সমস্ত গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণতাকে সে আজ যেন সহস্রধারায় পরিপ্লাবিত করে দেবে।

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুমোতে পারলো না সে। নানান কথায় জাগিয়ে রাখলো অবনীকেও। সে সব কথা—কবেকার সেই ছাত্রজীবনের আশা-আকাজ্ক্ষা স্বপ্নের কথা—সবে আলোর আমন্ত্রণ এসেছে যখন তরুণ জীবন ভরে।

কল্যাণী বললে, "সেই একদিনের কথা মনে পড়ে দাদা, যেদিন বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে এলাম। তুমি বললে"—

কি বলেছিল অবনী, কিছুই মনে নেই। চোখ বুজে শুধু বললে, "হুঁ।"

"ইস—তুমি ঘুমোচ্ছ।"

অবনী হাই তুলে বললে, "তোর চাকরি হয়েছে আজ—চোখে ঘুম নেই। কিন্তু বেকার অবনী মুখুজ্যের যদি ঘুম পায়—যদি তার

কিছুই না মনে পড়ে—যদি তার অতীত ভবিষ্যৎ বলে কিছুই না থাকে—তবে তার দোষ কি।”

চুপ করে রইলো কল্যাণী। নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বদলে গেছে—অনেক কিছু যেন বদলে গেছে আজ। বদলে গেছে অবনী—দুঃসময়ের নানা আঘাতে হারিয়ে গেছে তার স্বপ্নের উত্তেজনা। পড়ে আছে শুধু সহজ আবেগের একটা মানুষ। বদলে গেছে কল্যাণীরও সেই স্বপ্ন দেখা গৃহপরিবেশ। শিবশংকর নেই—যেন একটা সুখ ও আনন্দের নির্ভরতা নেই আজ। তবু সহস্রধারায় সে আজ উচ্ছ্বসিত। আনন্দ ও বেদনায় মেশানো একটা মন নিয়ে একা জেগে রইলো সে অনেকক্ষণ। আর ছটফট করতে লাগলো সে তার সেই জেগে থাকা মনটিকে নিয়ে। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে ছাদে গেল। ঘুমন্ত মহানগরীর দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। কেবলি মনে হতে লাগলো তার—এখানকার কর্মচঞ্চল বিরাট জনস্রোতে ভেসে পড়েছে আজ সে। সামনে নতুন এক জীবনের মহাসাগর। আশ্চর্য, সে রাতের আনন্দে—নরেনকে তার একবার মনেও পড়লো না। তার চেয়ে—সেই সহৃদয় একটি পুরুষের চেয়ে তার শেকল ছেঁড়া নারী-মনে বহুদিন পরে লেগেছে নতুন একটা জীবনের নেশা।

৯

সংসারের অচল চাকাটা যাই হোক চলতে শুরু করেছে—এতে স্বস্তি হয়তো আছে মহামায়ার কিন্তু সুখ নেই। বড় ভয়ার্ত করুণ চোখ দুটো মেলে তাঁকে দেখতে হয়—কোনো কোনো দিন এক সঙ্গেই অফিস থেকে ফেরে নরেন আর কল্যাণী। আর কল্যাণী যেন উপচে পড়ছে আনন্দে—সুখে। চুলোয় যাক বিধবার বেশবাস—সে তো তার বাপই ঘুচিয়ে গেছে—অধিকন্তু এখন ছিমছাম একটা আকর্ষণীয় শোভনতাও এসে লেগেছে তার সাজপোশাকে। এ নাকি কেতাদুরস্ত অফিসের পোশাক। এই পোশাক সম্পর্কে মহামায়া ম্লানভাবে একটু

কথাও তুলেছিলেন একদিন। কল্যাণী হেসে বলেছিল, "কি করি মা, অফিস যে চায়।"

মহামায়া বলেছিলেন, "কিন্তু পাড়ার বুড়োবুড়িরা যে নিন্দে করে।"

নরেন হেসে বলেছিল, "ওর সঙ্গে আরও ক'টি মেয়ে কাজ করে খুড়ি মা—তাদের পোশাকের বাহার যদি দেখতেন। ফিরিংগি মেয়েদের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

মহামায়া চুপ করে গেছেন। আর একটি কথাও তোলেননি কোনদিন। শুধু যেন দম চেপে অপেক্ষা করছেন মনে মনে—অবনীর একটা কিছু হয়ে গেলেই হয়। কিন্তু সে যে কোথায় কি করে, তার কোনো পাত্তা মহামায়া পান না।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ ডাক-পিয়নের আবির্ভাবে মহামায়া কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। চিঠি অবনীর নামে—কে জানে চাকরীর চিঠি কি-না। মহামায়া বাইরের ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন—একটা খাম ছিঁড়ে অবনী চিঠি পড়ছে এক-মনে।

মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে—চাকরি-বাকরির কিছু খবর এলো?"

অবনী তাড়াতাড়ি চিঠিটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে অন্যমনস্কের মতো বললে শুধু, "হুঁ।"

তারপর জামাটা টেনে গায়ে দিয়ে অবনী তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। মহামায়া নিজের ঘরে গিয়ে ইষ্ট-দেবতার উদ্দেশ্যে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। হে ঈশ্বর! অবনীর একটা চাকরি হয়ে গেলে হয়। স্বস্তি পান তিনি—বন্ধ করে দেন কল্যাণীর অফিস।

কিন্তু কোনো অফিসের দরোজায় নয়—অবনী হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো সেই আর এক কানা গলির এক বাড়ির দরোজায়। কড়া নেড়ে ডাকবার আগেই দরোজা খুলে দাঁড়ালো সুধা।

অবনী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তার স্বাভাবিক সতেজ গলায় বলে উঠলো, "ব্যাপার কি সুধা! হঠাৎ তোমার এ কী চিঠি"—

সুধা শুধু ঠোঁটের ওপর তর্জনী চাপা দিয়ে অবনীকে চুপ করবার ইঙ্গিত করলে। অবনী আরও যেন ঘাবড়ে গেল। বললে, "ব্যাপার কি!"

"বলছি—বোস।" সুধা ভেতরের দিকের দরোজাটা এঁটে দিয়ে এসে বললে, "সকলের সামনে সব কথা বলা যায় না। দুপুরের দিকে মামীমা ঘুমোয়—তাই আসতে বলেছি।"

অবনী আশ্বস্ত হলো। বললে, "আমি ভাবলুম—কি না কি! যা তোমার চিঠি।"

সুধা বললে, "কিন্তু কি লিখবো আমি। কেমন করে বলবো তোমাকে—কি ভাবে দিন কাটছে আমার। মামা আমাকে নিয়ে জুয়া খেলতে নেমেছেন।"

"জুয়া! মানে?"

"হ্যাঁ—জুয়াই।" সুধা বললে, "এতদিন ওঁদের গলগ্রহ হয়ে ছিলুম।—আমি ওঁদের মস্ত বড় একটা বোঝা—এই কথটাই শুনে আসছিলুম। তিন কুলে যার কেউ নেই"—

"ও সব তো পুরানো কথা—বলেনই।" অবনী অধৈর্য হয়ে বললে।

"হ্যাঁ, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আদর বেড়ে গেল আমার।"

"বাঃ, ভালোই তো।" অবনী সহজভাবে বলে উঠলো।

"প্রথমটা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম—আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন মামা একজনের সঙ্গে।"

অবনী ভ্রূকুটি করলে এবার।

"খুব বড় লোক শুনেছি।" সুধা বললে, "বয়সও বেশী নয়—বছর বত্রিশ হবে। ভদ্রলোক নিজেই নিজের অভিভাবক—আমাকে দয়া করে বিয়ে করতে ভারি উৎসুক।"

গম্ভীর হতে হতে অবনীর নিচের চোয়ালটা প্রায় ঝুলে পড়েছে এতক্ষণে। বললে, "তোমার মত কি?"

"আমার মত। মামা মামী তো বলেন—এ আমার সৌভাগ্য!"

এর পরে অবনী যে কি বলবে বুঝে পেল না। চুপ করে রইলো।

সুধা তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে, "কিন্তু আমার সৌভাগ্যের মস্ত কথাটা শুনে ফেলেছি আমি কাল রাত্তিরে আড়ি পেতে। যে ভদ্রলোক বিয়ে করবেন তাঁর থাইসিস।"

"বলছো কি!" একটা সহজ প্রতিবাদের কথা পেয়ে অবনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

"আস্তে। মামীমা উঠে পড়লে আমার সব কথা হয়তো আর বলা হবে না।" সুধার চোখে মুখে আতঙ্ক।

"ব্যাপার কি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে সুধা! এমন ভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে কথা বলছ—যেন ওঁরা তোমার উপর পাহারাও বসিয়েছেন।" অবনী বললে, "একটু খুলে বলো সব ব্যাপারটা।"

"পাহারা বসিয়েছেন বৈ কি, নইলে আমার আগের চিঠি তুমি অনেক আগেই পেতে।" সুধা বললে, "সে চিঠি ওঁরা ঝিয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলছেন।"

অবনী অসংযত হয়ে বললে, "কিন্তু থাইসিসের কথা—জানেন তোমার মামা?"

"জানেন বৈকি।—হিসেব করেই তিনি এগোচ্ছেন আমার আর তাঁর ভাগ্য গড়বার জন্যে।"

"কি রকম!"

"ভদ্রলোক ক'দিনই বা আর বাঁচবেন। আমি বিধবা হয়ে তাঁর বিপুল সম্পত্তি নিয়ে সেই তো আবার ফিরে আসবো মামার সংসারে। আমার তিন কূলে আর অভিভাবক বলতে আছে কে।"

"এ সব কি বলছো তুমি!"

"মামার হিসেবটাই বলছি।"

"আর তোমরা মামীমা?"

"নিতান্ত মেয়েমানুষ বলেই হয়তো প্রথমটায় আর একটা মেয়ের পরিণাম চিন্তা করে হঠাৎ শিউরে উঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর

এ গরীব সংসারের হিসেব নিকেশ মামা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভালো করে।"

"এ অসম্ভব—এ একটা কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!" অবনী ফেটে পড়লো আবার।

সুধা সচকিত হয়ে বললে, "আস্তে কথা বলো। দোহাই তোমার। এর পরে বলে যাও—আমি কি করবো।"

অবনী সোজাসুজি বললে, "বাধা দেবে—প্রতিবাদ করবে।"

"ওঁদের আশ্রয়ে থেকে ওঁদেরি বিরোধিতা করবো? কতদিন করবো!" সুধা নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দুটো চোখ মেলে ক্লান্ত ভাবে অবনীর দিকে চেয়ে রইলো।

সে চোখে আছে যে প্রার্থনা, যে নির্ভরের প্রত্যাশা—অবনীকে তা যেন মুহূর্তে ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু ততোধিক হতাশ চোখে তাকালো সে সুধার দিকে। আস্তে আস্তে নিজেকে কোনোরকমে সংযত করে সে হতাশ কণ্ঠে বললে, "আমার সে ব্যবসা ফেলে হয়ে গেছে সুধা। এবার যেমন করে হোক, একটা চাকরি যোগাড় করে নিই আমি, থামো।"

এ সেই চিরকালের পুরুষের আশ্বাস—সুদৃঢ়, নির্ভরশীল। কিন্তু তবু যথেষ্ট সুদৃঢ় নয়। গলায় ছিল না বোধ করি ততোখানি জোর, চোখে ছিল না ততোখানি দ্যুতি—যার ওপরে মেয়েরা চিরকাল গড়েছে ঘরের কোণের ভিৎ। কিন্তু বেকার অবনী কর্মমুখর এ নগরীর কাজের দরোজায় ঢুঁ মেরে মেরে হতাশ হয়ে গেছে।

সেই হতাশার কিছুটা সুর ছিল বোধ হয় তার কথায়। সুধা তাই বললে, "কিন্তু কবে হবে তোমার কাজ। যদি কিছু না হয়"—

মেয়েদের নির্ভর প্রত্যাশী যে গলার স্বর আর যে চোখের দৃষ্টি পুরুষের বুকের রক্তকে চিরকাল চঞ্চল করে তুলেছে—তেমনি কথাগুলো সুধার, তেমনি অসহায় দৃষ্টি তার। অবনী বিচলিত কণ্ঠে বললে, "যেমন করে হোক, আগে একটা কাজ যোগাড় করে নিই আমি, থামো। সবটা ম্যানেজ করে নেবো তারপর। অন্তত সামান্য

কিছু টাকার একটা বরাদ্দ না করতে পারলে এদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবো তোমাকে!"

সুধা যেন আঘাত পেল। বললে, "তোমার টাকাটাই কি সব!"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অবনী স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো সুধার দিকে।

সেখানে অশ্রুভারানত একটি হৃদয় আর আত্মনিমজ্জিত একটি প্রেম এই কঠিন দুর্মূল্য শহরের সমস্ত নিষ্ঠুর আর্থিক নিয়মকে অস্বীকার করে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

না, অবনী তাকে এড়াতে পারে না। হোক বেকার, তবু তার পুরুষসত্তায় জাগে আনন্দ। আস্তে আস্তে অবনী বললে, "দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারবো জানি, তবু ভয় পাই সুধা— তোমাকে বিপদে ফেলবো হয়তো।"

"আমি ভয় পাইনে।" সুধা আস্তে আস্তে বললে, "আর আমি কিছু ভাবতে পারছিনে—কি করবো! তোমার অবস্থাও বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু কি করবো আমি—কেমন করে তোমাকে সাহায্য করবো বলে দাও আমাকে। তোমার বোনের মতো যোগ্যতা আমার নেই—তবু তোমার সঙ্গে আমি উপোস করতে পারবো। সে-ও আমার স্বর্গ।"

অবনী শক্ত মুঠোতে ওর দুটো হাত চেপে ধরলে। তার সহজ আবেগে বললে, "হবে সুধা—আর ক'টা দিন সবুর করো। তোমার যেটুকু যোগ্যতা আছে তাই দিয়ে কারুর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও তো পড়াতে পারবে!"

"তা হয়তো পারবো। তাই যোগাড় করে দাও আমাকে একটা— পালিয়ে বাঁচি আমি এখান থেকে। তাই দাও আমাকে।"—

এমন একটা আগ্রহ ফুটে ওঠে সুধার গলায় যে অবনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো—মুখে কোনো কথা যোগালো না তার। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "সব ঠিক করে নিচ্ছি। আর একটু সবুর করো।"

"আবার কবে আসবে তুমি?"

"সুধা! ..."

ভেতর থেকে এমন সময়ে ডাক ভেসে এলো সুধার মামীমায়ের।

সুধা সচকিতে বললে, "এবার যাও। মামী মা"—

অবনী চিন্তিত। বললে, "মনে হচ্ছে—একটু দেখা করে যাই।"

"না।" সুধা ভয়ার্ত হয়ে বললে, "তাতে আমার যন্ত্রণা বাড়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। তুমি যাও। সব ব্যবস্থা করো।" নিঃশব্দে অবনীকে দ্রুত বিদায় করে দিয়ে সুধা বাইরের দরোজা বন্ধ করে দিল।

গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অবনী। বলে তো এলো সে সুধাকে অনেক কথা। কিন্তু কোথায় কি করবে সে! অফিসে অফিসে ঝুলছে মন্দা বাজারের ছাঁটাই। পর পর গোটা তিনেক নামকরা ব্যাঙ্ক কারবার গুটিয়ে দরোজা বন্ধ করেছে। আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জে চাকরি-প্রত্যাশীর সুদীর্ঘ ক্লান্ত সারি। মহানগরীর কাজের কেন্দ্র ডালহাউসী স্কোয়ারের অলিগলি সে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে গেল।

বড় রাস্তার ওপরে এসে সে থম্‌কে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘ মিছিল চলে গেল সামনে দিয়ে—কণ্ঠে ছাঁটাই বন্ধের আর্তনাদ। চেয়ে রইলো সে শূন্য চোখে।—সামনে অদূরে কোন অসূর্যম্পশ্যা ঘোমটা ঢাকা একটি বউ এক চিল্‌তে ছায়ার কোণে দুটি রোগা রোগা হাত শুধু মেলে রেখেছে, একহাতে একটি শাঁখা আর লোহা। সামনের পাতা আঁচলে মাস আষ্টেকের একটা শিশু হাত পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। অবনী এগোলো অন্য মনে। বাস স্টপের সামনে গোটা কয়েক কাচ্চা-বাচ্চা ভিক্ষের কলরবে মোড়টাকে সরগম করে তুলেছে। ওরই একপাশে একটি জ্যোতিষী হাতের ছাপমর্কা ছোট্ট একটা সাইন-বোর্ড তুলে ফুটপাতে খড়ি পেতে বসে আছে বকধার্মিকের মতো। তার সাইনবোর্ডে লেখা—ভাগ্য গণনা করুন। অবনী লালদীঘিতে ঢুকলো—লাল কাঁকর ঢালা পথের পাশে গাছের ছায়া আর ফুলের কেয়ারী। যেতে যেতে চোখ পড়ে তার—ফুলের কেয়ারীর মধ্যে

একটা লোক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, পরণে একটা সুতোরও বালাই নেই। মরে গেছে না-কি লোকটা! আহা, ইংরেজ প্রভুর সাজানো বাগান—তার মধ্যে ও হতচ্ছাড়ার লাস! হায়রে রাজধানী —তার বহু যৌবন-স্বপ্ন ও কল্পনার কলকাতা!

ক্লান্ত দুটো পা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে কার্জন পার্কের মোড়ে এসে। হতাশ চোখে হয়তো আবছা স্বপ্নের মতো ভেসে উঠেছিল সহসা সুধার শান্ত বিষণ্ণ মুখটা। গায়ের ওপরে এমন সময় হুড়মুড় করে এসে পড়লো একটা রেসকোর্সের টিপ্‌স্‌ বেচা হকার:

"টিপ্‌স্‌ ··· টিপ্‌স্‌ বাবু ··· রেস কোর্স"···

লোকটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়—জুয়া ··· সবটা জুয়া। সুধার মামা সদানন্দ বাবু জুয়া খেলছেন সুধার ভাগ্য নিয়ে—জুয়া খেলছে যেন সে-ও আর একজনের জীবন নিয়ে তার জীবনে, জুয়া খেলছে তার প্রেম—তার যৌবন নিয়ে। ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট, বর্ণহীন আর নিষ্ঠুর। যৌবনধর্ম আর জীবন অর্থের শাসন মানে না কেন!

অদূরে ফুটপাথের গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ইলেকট্রিক সুইচের বাক্স—তার পাঁশুটে রঙটা বিষণ্ণ কান্নার মতো মনে পড়িয়ে দেয় সুধার মুখটাকে, তার চিঠিটাকে—মনে পড়িয়ে দেয় তার করুণ মিনতিকে।

অন্যমনে সুইচ বাক্সটার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো অবনী। চোখ পড়লো কল্যাণীর দিকে। অমন বেমক্কা জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন সে!

অবনী জিজ্ঞেস করলো, "কি রে—এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

হঠাৎ রক্তের উচ্ছ্বাসে কল্যাণীর সারা মুখটা যেন অপরূপ হয়ে উঠলো। বললো, "নরেনদা'র জন্য অপেক্ষা করছি। দাঁড়াতে বললে —তো দেখো কতক্ষণ কেটে গেল। দাঁড়াও দাদা—যাব এক সঙ্গে।"

অবনী দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ ফস করে বলে ফেললে সে, "হ্যাঁ রে—তোদের অফিসে কাজটাজ আর খালি নেই?"

"কোথায় কাজ দাদা।" কল্যাণী বললে, "আমাদের অফিস তো আজ গরম—ছাঁটাইয়ের গুজব শোনা যাচ্ছে।"

অবনী একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। তাকালো কল্যাণীর মুখের দিকে একবার। রক্তের উচ্ছ্বাসটুকু তখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি তার মুখ থেকে। অফিস ফেরতা ভিড়ের মাঝখানে কার্জন পার্কের খাপছাড়া এক কোণে অপেক্ষমান স্বতন্ত্র একটি সুখী মুখ। বকুল ফুলগুলো ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে তার চারপাশে। বকুল ঝরার সময়। কোন মাস এটা! তার দিন, মাস, বছর—সব কেমন যেন একাকার হয়ে গেছে।

সারাদিনের পরিশ্রান্ত ঘরমুখো ভিড়ের দিকে চেয়ে অবনী দাঁড়িয়ে রইলো কল্যাণীর পাশে। পাশের লজ্জারক্তিম মেয়েটির মনে যে ভাবনাই থাক, এই মুহূর্তে অবনীর মন একেবারে খালি হয়ে গেছে। মাত্র একটি মেয়ের প্রেম—অবনীর ঘর গড়ার মূলধন। কিন্তু সেই ঘর গড়ার আগের মুহূর্তে অবনী মুখুজ্যে নামক একটি বেকার যুবকের সমস্ত মেধা আর বুদ্ধি যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে একেবারে। ভিত্তিহীন জীবন আর অভিশপ্ত জীবন-কামনা—এ কোন পথহীন স্বপ্নহীন যৌবন অবনীর সামনে!

কল্যাণী বললে, "দেখো—নরেনদা এখনও এলো না।"

অবনী ফিরে তাকালো কল্যাণীর দিকে। অস্থিরতা প্রকাশের লজ্জায় কল্যাণী নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়। আর সেই লজ্জা পাওয়া মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে অবনীর মনে হয়—আগের চেয়ে কল্যাণীকে যেন অনেক বেশী সুন্দর লাগছে। এতদিন কোথায় কি একটা অভাব ছিল যেন—সেখানে লেগেছে এখন পুর্ণতার ছোঁয়া। তার নিজের ছন্নছাড়া বেকার জীবনে অসম্পুর্ণতা ও শ্রীহীনতার যতো বোঝাই থাক, এই মুহূর্তে কল্যাণীর লজ্জা-রাঙা মুখের পুর্ণতার আভাসখানি যেমন তাকে একটু ঈর্ষিত করে তোলে তেমনি একটা ভালোলাগাও ছেয়ে যায় সারা মনে।

অবনী বললে, "তোরা বুঝি রোজ অফিস থেকে বেরিয়ে এইখানে দেখা করিস?"

কল্যাণী অধিকতর লজ্জা পেয়ে "হাঁ—না" করে অনেক রকম ভাবে কি যে বললে—তার সবটা অর্থবোধ না হলেও এই কথাটা

স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তার একান্ত নিজের একটা জীবন ও জগৎ আজ নানাভাবে মানা স্বাদে ও গন্ধে ভরে উঠেছে।

খানিক বাদে নরেন এলো হন্তদন্ত হয়ে এবং অপ্রত্যাশিত অবনীকে দেখে কিছুটা যেন বিস্মিত হলো। বললে, "তুমি যে!"

অবনী হেসে বললে, "আমার দোষ নেই। কল্যাণীই জোর করে ধরে রাখলে ভাই। নইলে বেকার মানুষ—ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম রাস্তায় রাস্তায়।"

"তোমাকে এখন খোঁয়াড়ে দেওয়া দরকার।" বলে নরেন হা-হা করে হেসে উঠলো। বললো, "চলো—বাসে ভীড় বাড়বে। ফিরতে কষ্ট হবে।"

ওরা এগোলে। অবনী কি একটা বলি বলি করছিল—শেষ পর্যন্ত বলে ফেললে। বললে, "তোমাদের চায়ের আড্ডাটাড্ডা নেই কোথাও—চা খাও না অফিস থেকে বেরিয়ে?"

ওর প্রশ্নের ধরনে আবার লজ্জা পায় কল্যাণী। নরেন সহজভাবে বললে, "আছে একটা বটে। তুমি চা খাবে?"

কল্যাণী বললে, "একেবারে বাড়ি গিয়েই খাবো—চলো বাস ধরি।"

অবনী গম্ভীর ভাবে বললে, "ভয় নেই তোর—তোদের ঘাঁটিতে কোনদিন আর যাবো না। পকেটে পয়সা নেই কিন্তু মনটা বহুক্ষণ চা-চা করছে। তাই বলছিলুম"—

নরেন হেসে বললে, "আলবৎ চা খাবে। আমাদের ঘাঁটিতে তুমি রোজ এসো ভাই—অফিসের পরে আড্ডাটা জমবে ভালো।"

এ আড্ডা অফিসের পরে শুধু কোনো চা-খানাতেই নয়, বাড়িতেও চলে তার শেষটুকু। নরেন রোজই আসে অফিস ফেরতা। সঙ্গে কল্যাণী আর বেকার অবনী। নানা আলোচনায়, তর্কে, কলরবে বাইরের ঘর মুখরিত। শিবশংকরের পর এ বাড়িতে নতুন মানুষদের নতুন বৈঠক বসে। কি নিয়ে, কাগজে বেরুনো কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে যে ওরা বৈঠকে চেঁচামেচি করে অথবা মুহুর্মুহু রাজা-মন্ত্রী

নাকচ করে দেয়—মহামায়া তার বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। তিনি শুধু বোঝেন—ঘরের মেয়ে কল্যাণী বাইরে চলে গেছে, তার চেঁচামেচিও কম শোনা যায় না। আর অবনী, সে চিরকালের সংসার-উদাসীন —আজকাল সে ঔদাসীন্য বেড়েছে বই কমে নি। মহামায়া বেশ বুঝতে পারেন—তার বড় ছেলেমেয়ে দুটি একেবারে তার নাগাল ছাড়া হয়ে গেছে। তাদের খবর শুধু তারাই জানে।

সেদিন শান্তা রান্নাঘরের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ কি দিদির ছুটি মা! এখনও স্নানে গেল না!"

সেই সময়ে গরম তর্কের ধারাটা সাময়িক মুলতুবী রেখে অবনী একবার ভেতরে এসে ঢুকেছিল। মহামায়া তাকে লক্ষ্য করে শান্তার কথার জবাব দিলে, "ওই ওঁকে জিজ্ঞেস করো বাছা। তাঁর খবর—উনিই জানেন ভালো।"

অবনী মুখ ফিরিয়ে বললে, "কি ?"

শান্তা জিজ্ঞেস করলে, "দিদির কি আজ ছুটি ?"

"ছুটি—ছুটি—ছুটি।" অবনী ব্যস্ত হয়ে যেতে যেতে বললে, "ওদের অফিসের এক অংশীদার মারা গেছে।" বলে সে কবেকার একটা পুরানো খবরের কাগজের সন্ধানে চলে গেল।

মহামায়া বললেন, "ওই শোনো।"

শান্তা বিরক্ত হয়ে বললে, "ছুটি তো আগে বললেই হয়। আমি সেই সাতসকাল থেকে উঠে খেটে মরছি।" রান্নাঘরের গরমে ঝলসে যাওয়া মুখখানা তার বিতৃষ্ণায় আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। রান্নাঘর ছেড়ে যেতে যেতে গজ্ গজ্ করে বললে, "চাকরি করে মাথা কিনেছেন।"

মহামায়া বোঝেন সব। এবং সংকট এলে তাঁর হাতে জপের মালাটা বরং জোরেই ঘোরে। সেদিনও সেটা তেমনি ঘুরতে থাকে।

১০

সময়ের বিরুদ্ধে, পরিবেশ ও এ সংসারের মানুষগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেন শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সবটা ক্রমশ মেনে নিয়েছেন মহামায়া—যেমন মেনে নিয়েছেন কল্যাণীর চাকরি, তেমনি মেনে নিয়েছেন অবনীর নোঙরহীন বেকারীও। তবু খোঁচা দেয় মাঝে মাঝে মনের সাধগুলো। মন পোড়ে মানুষের—কিন্তু সাধ স্বপ্ন পুড়ে শেষ হয় কই!

মহামায়ার চোখ এড়ায় না—অবনীর চোখগুলো দিন দিন ঢুকে যাচ্ছে ভেতরের দিকে, এমন কি কমে এসেছে তার অকারণ উত্তেজনা ও চেঁচামেচি—কেমন অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। বেশবাসেও প্রকট হয়ে উঠছে দিন দিন দারিদ্র্য ও মালিন্য। গায়ের সার্টটা ছিঁড়ছে এখানে ওখানে, পায়ের স্যাণ্ডেলটার অবস্থাও তথৈবচ। এ শহরের কর্মব্যস্ত সারা দুপুরটা বেকার অবনী ঘুরে ঘুরে কাটায় কোথায়—ফিরে আসে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঠিক অফিস ফেরতা মানুষদের মতোই।

সেদিন মহামায়া দেখলেন—তাড়াতাড়ি ফিরে এলো অবনী। কল্যাণী ফেরেনি তখনও—না তার সঙ্গে নরেন। মহামায়া লক্ষ্য করলেন—অবনীর মুখে চোখে দীপ্তিহীন হতাশা যেন বড় তীব্র হয়ে উঠেছে সেদিন। কোনো রকমে গায়ের ছেঁড়া সার্টটা খুলে ফেলে শুয়ে পড়লো সে টানটান হয়ে, চোখ আর কপাল আঁকড়ে ধরলো দুই বাহুতে। নিষ্ঠুর দিনের সুতীক্ষ্ণ প্রহার থেকে সে যেন আড়াল করতে চাইছে নিজেকে।

"অবনী!" মহামায়া ডাকলেন।

অবনী চোখ না খুলেই বললে, "বলো।"

"হলো কি তোর।" মহামায়া শুধোলেন, "শরীর খারাপ?"

"না।" ছোট্ট একটু উত্তর অবনীর।

অবনীর কাটা কাটা কথায় মহামায়ার কৌতূহল কোনো দিনই যেমন মেটেনি, আজও মিটলো না। কি তার চাকরি আর কি তার শরীর—দুটো সম্পর্কেই মহামায়ার আগ্রহ সমান। কিন্তু অবনী একভাবে শুয়েই রইলো। মহামায়া অগত্যা একাই টেনে নিয়ে চললেন তাঁর কথার ধারা।

"শরীর মন—দুই-ই তোর খারাপ যাচ্ছে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি।" মহামায়া বললেন, "আমারও আর ভালো লাগছে না বাপু মন-মেজাজ। কোথায় ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবো—ঘর করবো বউ নিয়ে, সে বোধকরি কপালে আর জুটলো না।"

অবনী নীরব। যে কথাগুলোকে এই মুহূর্তে এড়াতে চাইছে অবনী—ঠিক সেই কথাগুলোই পেড়ে বসে মহামায়া হা-হুতাশ করতে আরম্ভ করে দিলেন।

মহামায়া লম্বা এক ফিরিস্তি দিয়ে চললেন—কোথায় কার ছেলের বিয়ে হলো, পণ-যৌতুকে কে কত টাকা আনলো ঘরে—এই সব কথা। শেষকালে আফসোস করে বললেন, "আমিও ভাবি—আমারও কেন এমন হয় না! যাই হোক একটা চাকরি-বাকরি করতিস—ঘরে আসতো লক্ষ্মী একটি বউ। সত্যি বলতে কি—সব দুঃখ আমার ঘুচে যেতো। তা এমনি আমার ভবি যে"—বলে থামলেন মহামায়া।

অবনীর তখনও কোনো সাড়া নেই।

কিন্তু ক্ষোভ তাঁর অন্তর নিংড়ানো, সাধ-আহ্লাদ তাঁর বুকের মমতায় গড়া—সেগুলো একান্তই তাঁর গৃহকোণের স্বপ্ন। বাইরের পৃথিবীতে—অবনীর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে কি হলো না হলো, তাতে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হয় না।

শেষ পর্যন্ত নিজের সাধ-আহ্লাদের কথা ছেড়ে দিয়ে অদম্য কৌতূহলে মহামায়া জিজ্ঞেস করে বসলেন, "সেদিন যে কি চিঠি এলো দুপুর বেলা—তাতে চাকরি-বাকরির কিছু সুবিধে-টুবিধে হলো?"

"নাঃ।" বলে অবনী চুপ করে গেল আবার।

ক্ষোভে মহামায়া বললেন, "কি যে তোর কপাল! মেয়েছেলে-গুলোর চাকরি-বাকরি হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তোর কিছু আর হলো না।"

পৌরুষে ঘা লাগলেও অবনী বিকৃত মুখটাকে চেপে বললে, "নতুন নতুন মেয়েদের একটু সুবিধে হচ্ছে বটে—আর ছু দিন সবুর করো, দেখবে মজা।"

"কি জানি বাপু।" মহামায়া ভালোমানুষের মতো বললেন, "তোর কিছু একটা হলে বেঁচে যাই আমি।"

"কি করি বলো, চাকরি কি আমি বানাবো।" মহামায়ার শুভেচ্ছা এবার জ্বালা ধরিয়ে দিলে অবনীর মনে।

এর ওপরে মহামায়া আবার তাঁর ভালোমানুষি সাদাসিদে ভাবে বললেন, "তুই ঠিক লোক-জনকে ভালো করে ধরতে পারিস নে মনে হয়।"

অবনীর আর সহ্য হলো না—চিৎকার করে উঠলো। সটান উঠে দাঁড়িয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিলে, "তিষ্ঠোতে দেবে না একটু ঘরে! তো সোজা বলো না কেন—বেরিয়ে যাই! চাকরি তোমার জন্যে আমি বানাবো—বুঝলে?"

"তাই বানা—সংসার চালা।" কিসে কি হলো—মহামায়া আঘাত পেলেন তাঁর অত্যন্ত দুর্বল একটা জায়গায়।—সে হলো কল্যাণীর চাকরি। বলে উঠলেন তেতো গলায়, "মেয়ে চাকরি করে খাওয়াচ্ছে—বংশের মান-মর্যাদা তো গেছে। কিন্তু তাতেও তো পেট ভরে না। আবার চোটপাট করে চেঁচাতেও তোর লজ্জা করে না!"

পুরুষ-শাসিত একটা সমাজের পুরুষের মনে কথাগুলো ধারালো ছুরির মতো কেটে কেটে বসবে বৈ কি! অবনী ছেঁড়া সার্টটা ফের টেনে গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল—এমন সময় দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালো কল্যাণী। এক হাতে ঝুলছে ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্য হাতে কাগজের একটা প্যাকেট। তাকে পাশ কাটিয়ে গোঁ-ভরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো অবনী—কল্যাণী দরোজা আগলে দাঁড়ালো।

অবনী বললে "সর—রাস্তা ছাড়।"

"হয়েছে—ঘরে চলো।" কল্যাণী হেসে বললে, "হলো কি?"

"হবে আবার কি—আমি বসে বসে তোর হাড়-ভাঙা খাটুনির অন্ন ধ্বংস করছি।"

"ঝগড়া লাগিয়েছ মায়ের সঙ্গে তো!" কল্যাণী ফের হেসে বললে, "বসবে চলো—খবর আছে। তুমি যাও মা—একটু চায়ের জল বসিয়ে দাও।"

কে জানে চাকরির খবর-টবর হলেও হতে পারে।

অবনী খবরের লোভে ফের খাটের ওপর এসে বসলো—বললে, "বল কি খবর।"

"থামো থামো—মাথা ঠাণ্ডা করো আগে।" কল্যাণী বললে, "মায়ের সঙ্গে খামাখা কেন যে ঝগড়া করো দাদা—দেখতুম, বাবাকেও এমনি। কিন্তু কি লাভ বলো তো!"

"আরে দেখ দিকি, চাকরি কি আমি বানাবো!"

"বাইরের ছুনিয়ার খবর মা কি বুঝবে বলো।" কল্যাণী বললে, "এই তো শুনছি—আমাদের অফিসেও ছাঁটাইয়ের তোড়জোড় না-কি চলছে। তার কি বোঝাবে তুমি মাকে!"

"চুলোয় যাক—বল তোর খবর।"

"আসছি আমি—বোসো।"

অবনী ফের শুয়ে পড়লো টান-টান হয়ে। হ্যাঁ, মাথাটা ধরেই আছে তার। কপালটাকে আঁকড়ে ধরলো আবার।

অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলো কল্যাণী দু-হাতে দু-পেয়ালা চা নিয়ে। বগলে তার সেই কাগজের মোড়কটি। অবনীর সামনে একটা পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে বসলো অবনীর মাথার কাছে। বললে, "মাথা ধরেছে না-কি দাদা?"

"ধরবে কি—ওটা নেই-ই বলে মনে হচ্ছে রে।"

অবনী উঠে বসতে যাচ্ছিলো, কল্যাণী তার মাথাটা ধরে শুইয়ে দিল আবার। বললে, "শুয়ে শুয়ে চা খাও—আমি মাথা টিপে দিই।"

"ওরে বাপ্‌রে, অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে তুই মাথা টিপতে বসবি আমার—তারপর মা এসে মাথাটা আমার আস্ত খেয়ে ফেলুক।"

কল্যাণী হেসে ফেললে। মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বললে, "বাস রে, ঝগড়ার গরম যায়নি এখনো তোমার!"

অবনী আর কোনো কথা বললে না—নীরবে চোখ বুজে কল্যাণীর চুল টানার আরামটুকু উপভোগ করতে করতে একবার বললে শুধু, "আঃ, মাথাটা বড্ড ধরেছে রে কল্যাণী।" মাথার আরামে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে অবনী আবার চোখ বুজলো।

"তবে—দেখো। কোথায় ঘুরেছ সারা দুপুর টো-টো করে তার ঠিক নেই।" তারপর কল্যাণী অবনীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তার অত্যন্ত একটা দুর্বল স্থানে নাড়া দিয়ে বললে, "চাকরি-বাকরির চিন্তা বাদ দাও তুমি দাদা—বরং তুমি একটা ব্যবসার কথাই ভাবো।"

কিন্তু সে ব্যবসার কথায় অবনীও আজ হাসলো।

কল্যাণী বললে, "হাসলে যে! তুমি যা রগচটা—ও চাকরি করা তোমার পোষাবে না।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে।" অবনী বললে, "কিন্তু কি খবর একটা দিবি বললি যে"—

"এই নাও।" এতক্ষণের বগল দাবাই কাগজের প্যাকেটটা তুলে দিল অবনীর হাতে।

অবনী খুলতে খুলতে বললে—"এটা কি রে!" তারপর প্যাকেটটা খুলে চোখ তার থমকে গেল। প্যাকেট থেকে বেরিয়েছে একটা নতুন সার্ট আর এক জোড়া নতুন স্যাণ্ডেল।

"এটা কি করেছিস কল্যাণী!" অবনী বললে, "তুই কি আমাকে বাড়িতে টিকতে দিবিনে?"

কল্যাণী হাসি মুখে বললে, "এ মাস থেকে মাইনে আমার তিরিশ টাকা বেড়ে গেছে দাদা, আর চাকরিটাও পাকা হয়ে গেল।"

"তা তো হলো, কিন্তু এ ভালো করিসনি। বরং শাস্তার কাপড়-চোপড় দরকার ছিল—মিলু বিলুর বইপত্তর"—

"সে সব হবে। তোমার কিছু নেই—অথচ তোমাকে বাইরে বেরুতে হয়। চুপ করো।" কল্যাণী বললে,"কার কোনটা আগে দরকার—সেদিকে আমার চোখ আছে।"

"তা তোর আছে।" অবনী বললে "এগুলো মাপে ঠিক হবে তো?"

"ও মা! তোমার মাপ আমি জানি নে!" কল্যাণী সকৌতুকে বললে, "এই কিছুদিন আগে জামা বানিয়ে দিয়েছি তোমার। আর পায়ের মাপ আমার চেয়ে ঠিক এক আঙুল বড়ো।"

সবই ঠিক—অবনীর ভেতর বাইরের সব মাপই সে যতোটা জানে ততোটা বোধ করি মহামায়াও জানেন না।

"তবু এতগুলো টাকার জিনিস কিনে ফেললি তুই আমার জন্যে।"

কল্যাণী সলজ্জে বললে, "হঠাৎ মাইনে বাড়ায় তোমার জন্যে কিছু কিনতে ইচ্ছে হলো দাদা। আর কিছু বলো না—দোহাই তোমার, মন খারাপ হয়ে যাবে আমার তা হলে।"

কল্যাণীকে চেনে অবনী খুব ভালো করেই। তার অফিস-খাটা ক্লান্ত করুণ অথচ পরিতৃপ্ত মুখটার দিকে চেয়ে অবনী আস্তে আস্তে বললে, "চাকরি পাকা হলো তোর—জয় হোক। বেকার অবনী মুখুজ্যে দু-হাত তুলে তোকে আজ আশীর্বাদ করছে।"

কল্যাণী হাসলো সকৌতুকে। বললে, "আর একটা কাজ বাকি আছে দাদা। আমার অফিসের বন্ধুদের একদিন খাওয়াতে হবে। ক'জন আছে—একটা হিসেব করে"—

সহজ স্বভাবের মানুষ অবনী—অতি সহজেই মনের গুমোট তার কোথায় মিলিয়ে গেল। কাগজ কলম টেনে তখনি সে লিস্ট করতে বসে গেল। বললে, "দে—লিস্ট করে ফেলি। ওই তোড়ে ভালো মন্দ জুটে যাবে তবু।"

কল্যাণী হেসে বললে, "বেশী লোক নয়—এই জনা পাঁচ ছয়।"

অবনী বললে, "এক নম্বর লিখলুম নরেন চাটুজ্যে, তারপর বল।"

"যাও!" কল্যাণী সলজ্জে বললে, "আমি বলছিলুম আমার মেয়ে বন্ধুদের কথা। ওদেরি একদিন খাওয়ানো।"

"তা খাওয়া—কিন্তু তোর এতবড়ো উপকারী বন্ধু—চুলোয় যাক না হয় তোদের বন্ধুত্ব! কিন্তু তোদের অপিসের মহামান্য ইউনিয়ন সেক্রেটারী, তাকে নেমন্তন্ন করবিনে!"

"আঃ, চেঁচিও না দাদা।"

এমন সময় স্বয়ং নরেনের গলা শোনা গেল বাইরে থেকে, "অবনী আছো?"

"আছি—নিশ্চয়ই আছি।" অবনী হাঁক দিলে, "তোমাকে নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছিলুম যে হে! এসো এসো। সামনাসামনি আর বাদ পড়ার ভয় থাকবে না।"

"আঃ দাদা!" কল্যাণী কৃত্রিম রোষে ধমকে উঠলো।

ঝগড়ার গুমোটটা কেটে গেছে একেবারে ঘর থেকে। ভোজের তালিকায় ভালো ভালো খাদ্যবস্তুর নামডাক যতোটা না হলো তার চেয়ে বেশী হতে থাকলো অবনীর হাঁকডাক। এর মধ্যে মহামায়া একবার উঁকি মেরে গেলেন, মাংসের নাম শুনেই লাফাতে লাগলো মিলু, বিলু; শান্তা চা দিতে এসে জমে গেল খাদ্যতালিকার আলোচনায়।

নরেন বললে, "রান্নার ভার শান্তার। ওকে জিজ্ঞেস করে তোমার ফর্দ করো অবনী—কারণ যে পরিমাণ তুমি খাই-খাই করছো তাতে গোলমাল না হয়ে যায়। বরং ফর্দটা শান্তা নিজেই করুক।"

শান্তা খুশি। মহামায়া খুশি। হঠাৎ যেন বাড়তি ক'টা টাকার ভোজ এ পরিবারের কোন চাপা আনন্দের বন্ধ একটা দুয়ার খুলে দিলে সহসা।

অবনী বললে, "তবে বাজারের ভার আমি নিলুম কল্যাণী—বেকার বটি কিন্তু একটা পয়সা তোর এদিক ওদিক করবো না। নেমন্তন্নের ভারটা তুই আর নরেন নে। ও তোদের বন্ধু-বান্ধবকে আমি আর চিনবো কি করে।"

কল্যাণী হেসে বললে, "তা নিচ্ছি। কালকেই ছিল ছুটি, কিন্তু কালই ব্যবস্থা করা যাবে কি ?"

"কেন যাবে না।" অবনী বললে, "অনেক দিন পরে ভালোমন্দ ছুটো খাওয়ার জন্যে একটি দিনও আমি আর দেরি করতে পারছিনে। শুভস্য শীঘ্রম। আজ বিকেল এবং কাল সকাল—এর মধ্যে নেমন্তন্নটা সেরে ফ্যাল ছু'জনে, আমি ছুর্গা ছুর্গা করে কাল সক্কালে বাজারে বেরিয়ে পড়ি। টাকা দে।"

কল্যাণীর দিকে চেয়ে নরেন হেসে বললে, "কালই তা হলে ?"—

"হোক।" কল্যাণী বললে, "কিন্তু নেমন্তন্নটা শেষ করা যাবে তো ?"

"তা যাবে। বেরোই তা হলে, চলো।" নরেন তাকালো কল্যাণীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে।

"চলো।"

অবনীকে টাকা পয়সা দিয়ে ওরা ছু'জনে বেরিয়ে গেল নেমন্তন্ন করতে।

মহামায়ার মুখের মেঘ কেটে গেছে—কি জানি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত মাইনে বাড়ার খবরে কি না। শুধু ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মতো একটা টুকরো লেগে রইলো শান্তার চোখে মুখে। আবার সে আর একদিনের মতোই কৌতূহলী, উদগ্র ছুটো চোখ মেলে জানালার এক ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলো—ক্রমশঃ দূরে অপস্রিয়মান ছু'টি মূর্তি—একটি নরেন আর একটি কল্যাণী। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে ওরা। বড় রাস্তায় বেরিয়ে গেল, আর দেখা গেল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শান্তা সরে এলো জানালার কাছ থেকে।

কথায় কথায় এগিয়ে চলেছিল ওরা ছু'জন সারাদিনের কর্মক্লান্ত বড় রাস্তার নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণ জনস্রোত ঠেলে—উদ্ভাসিত, হৃদয়মথিত ছু'টি মুখ। সহস্রের ভিড়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সুখী মুখ ছুটিকে চিনে নেওয়া যায় যেন সহজেই।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যেখানে এসে পৌঁছলো, সেখানে আর যাই থাক—কারুকে নেমন্তন্ন করার ছিল না। শহরের

হাঁফছাড়া শেষ কিনার—পার্কের নরম ঘাস আর বিকেলের আকাশ গলানো স্নিগ্ধতা।

কল্যাণী হেসে বললে, "যাঃ, কথায় কথায় এ কোনখানে এলুম!"

"তাই তো!" নরেন বললে, "কিন্তু তবু চলো একটু বসে যাই—পা বেচারী যখন নিয়ে এসেছে টেনে।"

কল্যাণী হেসে বললে, "কিন্তু নেমন্তন্ন?" বলে নিজেই সে ঘাসের ওপরে বসে পড়লো আগে।

নরেন হাসতে হাসতে বললে, "বেরিয়েছি যখন—নেমন্তন্নের কাজটা হবে ঠিকই। তবে ভয় পাই আসলে খাওয়ার আয়োজনের ব্যাপারটায়। কারণ, তোমার মহামান্য দাদা স্বয়ং ওটা ম্যানেজ করছেন।"

"খাওয়ার ব্যাপারে দাদা গোলমাল করে না।" বলে হাসতে লাগলো কল্যাণীও।

নরেন বললে, "একটা কাজ আমার ভুল হয়ে গেছে—সেটা তোমার পাকা চাকরি আর মাইনে বাড়ার অভিনন্দন। অফিস থেকে বেরিয়ে আমাদের বকুল তলায় গিয়ে দেখি, তুমি আজ নেই। দাঁড়ালুম অনেকক্ষণ।"—

কল্যাণী সলজ্জে বললে, "বাড়তি মাইনের খবরে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। তক্ষুনি মনে হলো, কারুর জন্যে কিছু একটা কিনে ফেলি। চলে গেলুম দাদার জন্যে কিছু কিনতে।"

"অবনী ভাগ্যবান। কিন্তু আমি হতভাগা দাঁড়িয়ে রইলুম প্রায় পনেরো মিনিট। ডালহাউসী স্কোয়ার ফাঁকা হয়ে গেল। যাক সে কথা—এখন অভিনন্দন জানাই, পরপর তোমার আরও কদর বুঝুক আমাদের অফিস। বড় সাহেবের পার্সোন্যাল স্টেনো মিস এলেনোর যে মাইনে পেতেন অচিরে তাই তোমার কপালে জুটুক।"

সকৌতুকে কল্যাণী বললে, "আর যার দৌলতে আমার এতো—তার?"

নরেন বললে, "সেটা অতি লক্ষ্মীছাড়া—আপাতত তার কথা বাদ দাও। সামনে ঝুলছে ছাঁটাই—অফিস ইউনিয়নের মাতব্বরী করতে গিয়ে এবার সে হতভাগাটার চাকরিই না যায়।"

যে হালকা মুহূর্তগুলি গড়িয়ে চলছিল লঘু কথার ছন্দে—হঠাৎ যেন তার তালটা কেটে গেল। কল্যাণীর স্নিগ্ধ মুখে ছায়াপাত হয় অনাগত দুর্যোগের। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞেস করলে, "এমন কিছু সত্যিই ঘটতে পারে না কি ?"

"অসম্ভব কিছু নয় কল্যাণী।"

কল্যাণী হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো, "কখ্খনো না—তা কখ্খনো হতে দেওয়া যায় না।"

নরেন তার ছেলেমানুষী কথা শুনে হেসে ফেললে। বললে, "হতে দেওয়া না-দেওয়ার তুমি কে ?"

অন্তরের আকুতি ও দরদ যতোটাই থাক—কল্যাণী তার কথার তাৎপর্যটা পরে বুঝতে পেরে যেন লজ্জায় চুপ করে গেল। তবু আস্তে আস্তে বললে আবার, "কিন্তু এ কী—এ অসম্ভব!"—

নরেন হেসে বললে, "ঠিক—এ অসম্ভব হতো ঠিকই, চাকরির মালিক যদি হতে তুমি। মনের আনন্দে ইউনিয়ন করে বেড়াতুম—স্টাফ খ্যাপাতুম, অথচ এখন বেশ বুঝতে পারছি—চাকরি যাওয়ার ভয় থাকতো না একেবারেই। ওই লালমুখো খোঁড়া বড় সাহেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নাচতুম। আহা, এমন যদি হতো!"

কল্যাণী আর কোনো কথা বললে না। নরেন তার হাল্‌কা কথার তোড় দিয়েও কল্যাণীর হঠাৎ এই স্তব্ধতাকে ভাঙতে পারলো না আর। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো, "হলো কি তোমার কল্যাণী—হঠাৎ চুপ করে গেলে যে!"

কল্যাণী বললে, "কি সমস্ত বিশ্রী কথা তুলে মন খারাপ করে দিলে তুমি নরেন দা'। এখন মনে হচ্ছে—আমার ওই নেমন্তন্ন-টন্ন বাদ দেওয়াই ভালো।"

কল্যাণীকে নরেন চেনে তার ছোট্ট বেলা থেকে—তবু এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন সে তাকে নতুন করে চিনলে। এই সহজ সরল এতদিনের চেনা-জানা মেয়েটা মুহূর্তে যেন সমস্ত চেনা-জানার অতীত রহস্যময় আর অপরূপ হয়ে ওঠে তার কাছে। তার বুকের থেকে একটা হাত যেন উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হয়ে ওঠে একটা দুষ্প্রাপ্যকে পাওয়ার জন্যে—দুর্দিনে দুঃখের সঙ্গিনীরূপে। কল্যাণীর একটা হাত মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরলো নরেন। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "বিধাতা তোমাকে সত্যি সত্যি কেন আমার চাকরির মালিক করলো না কল্যাণী!"

কল্যাণী বসে রইলো এক ভাবে। বাইরে তার সেই মুহূর্তের মনের ঝড় প্রকাশ পেল না একটুও—কিন্তু মনে মনে সে শিউরে উঠলো। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে মহামায়ার কঠিন ধিক্কারে পরিপূর্ণ মুখটা একবার ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। যে লোকটার এইরকম একটা রূপকে সে বহুদিন একলা ঘরে মনে মনে কল্পনা করেও ভয় পেয়েছে—সেই মানুষটা আজ অতর্কিতে যেন তার সুকঠিন পৌরুষ আর দৃঢ়তায় কল্যাণীর সব ভয় ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

কল্যাণী বসে রইলো একভাবে। নরেনের বলিষ্ঠ মুঠো থেকে হাতটা সরিয়ে নেওয়ার না হলো তার ইচ্ছে—না বলতে পারলে সে একটা কথা।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘাসের রং তখন মিশে গেছে শহর সীমান্তের ঠাণ্ডা অন্ধকারে। শুধু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলোর তির্যক তীরগুলো পিছলে পড়ছে টুকরো টুকরো ঘাসে—পার্কের কোণায় কোণায়।

নরেন বললে, "চলো—এখন নেমন্তন্নের ব্যাপারটা সেরে ফেলি কল্যাণী, ওঠো। সন্ধ্যে হয়ে গেল।"

১১

ব্যাপারটা সামান্যই—তবু কল্যাণীর পাকা চাকরি ও বাড়তি মাইনেটুকুর মধ্যে এ পরিবারটির যে স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু লুকানো আছে, তা বহু দুর্ভাবনায় পীড়িত মহামায়ার চেয়ে কে-ই বা আর বেশী বুঝবে। বোঝেন তিনি—দম-আটকানো পরিবেশে হঠাৎ ভালোও তাঁর লাগে। তবু মনে মনে বলেন—এমন একটা ব্যাপার অবনীর যদি হতো! চাকরি করতো অবনী, বিয়ে-থা করতো তারপর। বিয়ে-থা হতো শান্তারও। একটি সম্ভাব্য সুখ—একটি সম্ভাব্য কল্পনার ছবি বার বার হানা দেয় মহামায়ার মনে। সেই মুহূর্তে কল্যাণীর জন্যেও তাঁর বুকটা যে টনটন করে ওঠে না—তা নয়, তাঁর জন্মদুঃখিনী সোনার টুকরো মেয়ের আজ এই হাল।

বাইরের ঘরে কল্যাণীর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা কলরব করছে। অফিসের কথা নিয়ে কি সব আলোচনা করে ওরা—বড় সাহেব, বোনাস, ছাঁটাই— ··· ইউনিয়ন ··· স্ট্রাইক। ··· মহামায়া তার কিছুই বোঝেন না। মনে বেঁধে তাঁর কাঁটার মতো: গলা শোনা যায় সকলেরই—শোনা যায় না শুধু বেকার অবনীর! সে কোথায় পালিয়েছে সারা সকাল—হয়তো লজ্জায়। চোখে লাগে তাঁর শান্তার ম্রিয়মাণ মুখটাও। ঘর-ভরা কল্যাণীর বান্ধবীদের আনন্দ কলরবের মাঝখানে সে যেন অসংপৃক্ত। রান্নাঘরের কোণায় মুখটা তার ঝলসে গেছে।

সে মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কি মনে হলো মহামায়ার—বললেন, "শান্তা, নরেনকে ভেতরে ডেকে আন দেখি একবার!"

শান্তা বলে উঠলো, "আমি পারবো না মা—ও তোমার বড় মেয়েকে ডেকে বলো।"

শান্তা এমন ভাবে ফস্ করে বলে বসলে কথাটা যে, মহামায়া থমকে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্ত কয়েক। শান্তার রুক্ষ গলা আর কথার

ধরন থেকে মহামায়া মনে মনে বুঝে নিলেন কিছু একটা। চুপ করে গেলেন।

খানিক বাদে নিজের মনেই বললেন আবার, "তোর দাদা সারা সকালটা ডুব দিয়ে বসলো কোথায়, নরেন বাজার-টাজার নিয়ে ছুটোছুটি করলো তো কম না। তাই বলছিলুম, ওকে এক ফাঁকে ডেকে এনে একটু চা খাওয়ালে পারতিস।"

শান্তা চুপ করে রইলো। এই এক ফাঁকে ডেকে এনে চা খাওয়াবার অছিলায় যে হৃদ্যতা রচনার সুযোগটুকু—সে সম্বন্ধে শান্তাকে নীরব দেখে মহামায়া চটে গেলেন। সোজা বলে বসলেন, "তোদের এই আজকালকার মেয়েদের দেমাক বুঝিনে বাছা। তোরা চাস—ব্যাটাছেলেরা সেধে সেধে এসে ঘুর্-ঘুর্ করুক কাছে কাছে।"

মহামায়ার চাপা অভিপ্রায়টাকে এই ভাবে সোজাসুজি ব্যক্ত হতে দেখে শান্তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু মহামায়া সেইখানেই থামলেন না। আবার বললেন, "এই যে ডেকে একটু আদর যত্ন করা—তবেই তো ভাববে সে আপন করে।"

কিন্তু সে লোকটার অন্তরঙ্গ আর প্রিয়জন যে কে, তা মহামায়াও জানেন যেমন—শান্তাও জানে তেমনি। সারা সকালটাই সে কল্যাণীর নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন নিয়ে ছুটোছুটি করেছে, শলা পরামর্শ যা কিছু করেছে সে কল্যাণীর সঙ্গেই। এর ওপরে আবার মায়ের জবরদস্তি কথাগুলোতে শান্তার প্রায় চোখ ফেটে জল এসে পড়বার মতো হয়ে পড়ে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে রান্নাঘর থেকে।

কিন্তু পালাতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো সে—সামনেই নরেন!

নরেন বললে, "খুড়িমা—একটু চা হবে কি?"

মহামায়া একগাল হেসে বললেন, "ওই দেখো—এই এক্ষুনি শান্তাও বলছিল তোমার চায়ের কথা। সারা সকালটা ছুটোছুটি করলে। এসো বাবা—বসো। শান্তা!"—

মহামায়া ডাকলেন। কিন্তু শান্তা দাঁড়িয়ে রইলো, লজ্জারুণিমা নয়—একেবারে ফ্যাকাশে মুখে। তবু তাকে ঠেলাঠেলি করে

মহামায়া রান্নাঘরের একান্তে একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টিতে লেগে গেলেন।

কিন্তু শান্তার কপালটাই বোধ হয় খারাপ আর অন্ধ নিয়তির মতো একটা বিপর্যয় ভাগ্যবিধাতা বোধ করি সেঁটে দিয়েছে মহামায়ারও কপালে। নইলে যে আশা ও আশ্বাসে তিনি শান্তার জন্যে রান্নাঘরের একান্তে একটি কল্পলোক গড়ে তুলতে চাইছিলেন—তার মধ্যে এসে পড়লো কল্যাণী। নরেন সবে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছিল—কল্যাণী এসে বললে, "ইস্—কি ভুলই হয়ে গেছে একটা।"

"কি হলো!" নরেন তাকালো মুখ তুলে।

"ও মা, জাঁকিয়ে চা খেতে বসেছ এখানে তুমি নরেন দা'?" কল্যাণী বললে, "নমিতা দত্তকে যে নেমন্তন্নই করা হয়নি!"

"তা হলে"—

"এক্ষুনি যেতে হবে।"

নরেন মহামায়ার দিকে চেয়ে কৃত্রিম দুঃখে বললে, "হলো মা—স্বস্তিতে চাটুকুও খাওয়া হলো না খুড়িমা।"

মহামায়া চটে উঠলেন দুজনেরই ওপরে—চটে উঠলেন কল্যাণীর হুকুমের বহর দেখে—এবং নরেনের একান্ত বশ্যতায়, আর শান্তা বেচারীর ফ্যাকাশে মুখটার দিকে চেয়ে। তার পর সব রাগ গিয়ে পড়ল কল্যাণীর ওপরে—বললেন, "তোর কি একটা আক্কেল নেই কল্যাণী? থাক—এতো বেলায় গিয়ে আর ডাকতে হবে না কারুকে।"

"না খুড়িমা"—নরেন হেসে বললে, "অফিসে কল্যাণীর সঙ্গে তার বড় মাখামাখি! না ডাকলে বড় খারাপ হবে। যেতে হবে অনেকটা—চলে যাই তাড়াতাড়ি।"

নরেন চলে গেল তাড়াহুড়ো করে।

নিজের সৃষ্টিতে আঘাত লাগলে একটা মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে ওঠে, তেমনি ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠলেন মহামায়া। হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে

উঠলেন কল্যাণীর ওপরে, "হতভাগী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে আমাকে সারা জীবন!"—

সে জ্বলা-পোড়া যে কি, তার সমস্ত চিহ্নটা যেন দাগা আছে মহামায়া আর শান্তার মুখে। কিন্তু কেন যে হঠাৎ মায়ের এই রাগ—কিছু বুঝতে না পেরে কল্যাণী শুকনো মুখে চেয়ে রইলো মায়ের দিকে। দেখলো একবার শান্তাকে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল সেখান থেকে। ওদের মেজাজের যেন কোনো হদিস পায় না আজকাল সে।

রইলো পড়ে রান্নাঘরের একান্তে মহামায়া আর শান্তার সৃষ্টিছাড়া নিরালা কোণটা—কল্যাণী যেন নরেনকে সেখান থেকে ছোঁ-মেরে নিয়ে চলে গেল কোথায় কোন মুক্ত আকাশের প্রাঙ্গণে, যেখানে মহামায়া বা শান্তা কেউই তার নাগাল পায় না।

অবনী ফিরলো অনেক বেলা করে—নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই তখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে। যাই যাই করছে নরেনও।

অবনীর দিকে চেয়ে নরেন বলে উঠলো, "ভাই, ধন্য তোমার ম্যানেজ করা। ছিলে কোথায়?"

"আরও একটা বৃহত্তর জিনিস ম্যানেজ করতে বেরিয়ে গেছলুম।" একটু শুকনো হেসে জবাব দিল অবনী।

"কি, চাকরি?"

"উঁহুঁ।"

"তবে?"

অবনী শুধু একটা হাসি দিয়ে জবাবটা আপাতত চাপা দিলে নরেনের কাছে। তাকে বিদায় করে দিয়ে তারপর উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্কের মতো চেয়ারে এসে বসে পড়লো।

কল্যাণী এসে অবাক হয়ে তাকালো তার উসকোখুসকো চেহারাটার দিকে। বললে, "ব্যাপার কি দাদা!"

"আছে। বলছি তোকে একে একে। এখন একটা বুদ্ধি বাৎলা দেখি কল্যাণী।"

সে বৃহত্তর ব্যাপার অবনীর প্রেম।

বেকার মানুষের প্রেম—অল্পতেই ছিল খুশি। একটু দেখা—একটু ছোঁয়া, মন ভরে থাকতো তাইতে। কিন্তু সুধার চিঠির তাড়ায় তাড়া লেগেছে অবনীর মনেও। আজ সকালে এসেছে আবার এক চিঠি—সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ের তারিখ না-কি পাকা হয়ে গেছে।

আগে-পরের সব ঘটনা শুনে কল্যাণী বললে, "এতোসব কথা এতোদিন আমার কাছে চেপে রেখেছিলে দাদা, আগে তো বলোনি একটুও কিছু! সেই দু'বছর আগে মারা গেছেন তোমার বন্ধু—তারপর এতো কাণ্ড ঘটে গেছে!"

"তোকে বলবো ভেবেছি বহুদিন—কিন্তু বলা হয়নি।" অবনী বললে, "ভেবেছিলুম—একটা চাকরি কোনো রকমে হয়ে গেলে ম্যানেজ করে নেবো সবটা।"

"কিন্তু কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে বলো দেখি!"

"তা তো যাচ্ছেই। এখন কি করি বল?"

"কি আর করবে—বিয়ে করবে!"

"তুই তো বললি"—অবনী বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা অতো সুবিধের মোটেই নয়। সুধার মামা শুনলে তেড়ে মারতে আসবে আমাকে।"

"তবে!" ক্ষুব্ধ হয়ে কল্যাণী বললে, "সেই থাইসিস রুগীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেতে দেবে? তোমরা ছেলেরা যেমন খুশি করবে তাই"—

ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধতায় লাগে যেন কল্যাণীর ব্যক্তিগত জীবনের টান। এক পলক তার রাঙা মুখটার দিকে চেয়ে অবনী বলে উঠলো, "তা কখনোই নয়।"

"তবে যাও—নরেনদা'কে এক্ষুনি ডেকে এনে যুক্তি পরামর্শ করো।" কল্যাণী বললে, "মেয়েটার চিঠির ওই কাকুতি-মিনতি শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দাদা। তুমি চুপ করে আছ কি করে!"

"আমার চাকরি-বাকরি একটা থাকলে চুপ করে থাকতুম না ঠিক।" অবনী বললে, "এখন বিয়ে করে ঘরে তো আনলুম—তারপর চলবে কি করে?"

"ও ঠিক চলে যাবে দাদা।" কল্যাণী বললে, "আমার মাইনে তো কিছু বাড়লোই।"

"তা বাড়লো, কিন্তু সবাই মিলে তোর কাঁধে চেপে বসবো!" অবনী সক্ষোভে বললে আবার, "আমি তো কিছুই করতে পারছিনে।"—

কল্যাণীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললে, "বিয়ের আগেই তুমি আমাকে আলাদা করে ভাবছো দাদা?"

"কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না।" কল্যাণীর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে অবনী বলে উঠলো, "কিন্তু তুই ম্যানেজ করবি কি করে কল্যাণী?"

কল্যাণী হাসলো তার দাদার মুখের দিকে চেয়ে। বললে, "তুমি তো অনেক কিছুই ম্যানেজ কর দাদা—এটা আমাকে করতে দাও না।"

অবনী বোনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "বিয়েটা কিন্তু রেজেস্ট্রি করে হবে—সাক্ষী-সাবুদ লাগবে।"

কল্যাণী বললে, "আমি সাক্ষী হবো।"

"এ রকম অশাস্ত্রীয় অহিন্দু বিয়েতে মাকে আবার রাজী করাতে হবে।"

"আমি করিয়ে নেবো।"

সবই করবে কল্যাণী—কিন্তু অবনীর সংকোচ যাচ্ছে না তবু। বললে আবার সেই সংসারের কথা, "কিন্তু চলবে কি করে—সেইটেই যে ভেবে পাচ্ছিনে রে।"

"আমি চালিয়ে নেবো দাদা—আমার ওপরে নির্ভর করতে পারছো না! আর এটাই বা ভাবছো কেন যে—তোমার কাজ কর্ম কোনদিনই কিছু হবে না!" কল্যাণী বললে, "আসল কথাটা বলো তো—তুমি সুধাকে ভালবাস?"

সেই মেয়েলী একটি কথা—সোনা নয়, রূপো নয়, টাকা নয়, চাকরি নয়—প্রেম। সুধাও বলেছিল।

কল্যাণীর মুখে কিসের যেন দীপ্তি। সে সব পারবে—কোথাও আটকাবে না তার। জীবনের বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল। কোন অদৃশ্য একটা মহাজগৎ যেন পেয়ে গেছে অসবার্ট কোম্পানীর স্টেনো-টাইপিস্ট এই মেয়েটা—নিজের কোন গোপন শক্তির উৎস-মুখে সেই সাম্রাজ্য তার ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত। মুখে সম্রাজ্ঞীর দ্যুতি। অবনী বোনের সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নীরবে একটু হাসলে। বললে, "সবই পারবি তুই ?"

"পারবোই তো।"

"তা হলে যাই নরেনের কাছে।" অবনী বললে, "সুধার এক মেসো আছে, গরীব মানুষ—বড় ভালো লোক শুনলুম। তিনি হয়তো এ বিয়েতে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সুধা তো তাই বললে। নরেনকে নিয়ে যাই তা হলে একবার তাঁর কাছে।"

১২

গোলমালের ভেতর দিয়ে হলেও অবনীর বিয়ে চুকে গেল একদিন। নতুন বউ হয়ে ঘরে এলো সুধা। মহামায়া খুব খুশি না হলেও অখুশি নন। বিয়েটা যদি পুরুত ডাকিয়ে হিন্দু মতে অগ্নি সাক্ষী করে হতো, তা হলেই তাঁর সমস্ত ক্ষোভ মিটে যেতো। তা ছাড়া তাঁর ক্ষোভ আর কোথাও নেই। অবনীর চাকরি-বাকরি নেই, কি অবনী সংসার চালাবে কেমন করে—এ সব দুর্ভাবনার কথা কোথায় তলিয়ে যায় অবনীর বিয়ের আনন্দে। জগৎটা তাঁর ছোট, পুরানো আর একঘেয়ে।—সেখানে একটা মানুষের জীবিকার ভিত্তি নেই—এ কথাটা বড় নয়, বড় সে চিরাচরিত প্রথায় বিয়ে-থা করে, ছেলেপুলে হয়, সৃষ্টি হয় আনন্দ-কলরব-মুখরিত একটি ভবন। এমনি পরিবেশেই জন্মেছেন মহামায়া—বড় হয়েছেন, কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ ভাগ। তাই এমনি কল্পনাই চোখ আর মন জুড়ে ছিল তাঁর অবনী আর শান্তাকে নিয়ে। আর কল্যাণী—কল্যাণী তাঁর দুঃখের

সঙ্গিনী। দুঃখের সঙ্গিনীটির জন্যে ভাবনা নেই তাঁর—ভেবে মরেন বরং শুধু তখনই, যখন তার চোখে-মুখে দেখেন সুখের দীপ্তি। তবু অবনীর বিয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ ও উদ্যম দেখে তার ওপর থেকে অনেকখানি সংশয় চলে গেছে মহামায়ার। বরং প্রসন্ন চোখে তিনি দেখেন—একটি আনন্দের পরিবেশ রচনায় যেন উঠে-পড়ে লেগে গেছে কল্যাণী। জিনিসপত্র টানা-হেঁচড়া করে ঘর-দোর সাজিয়ে দিল অবনীর। ভাঙা টেবিলের ওপরে ঢাকনা পড়লো একটা, দরোজা-জানালায় ঝুলিয়ে দিলে পর্দা, এক কোণে কাচের গেলাসে রাখলো কয়েকটা রজনীগন্ধার ডাঁটা। আর টান মেরে ফেলতে লাগলো যতো আবর্জনার জঞ্জাল—এখানে ওখানে গোঁজা অবনীর অব্যবহৃত ছেঁড়া ময়লা শার্ট, রুমাল, চটি।

ওই চটিজোড়াটা ফেলার সময়ে অবনী বোধ করি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না,—হাঁ-হাঁ করে উঠলো, "করিস কি—করিস কি, আমার দুর্দিনের সঙ্গী, দুঃসময়ের উপকারী বন্ধুরা!"

"ঝেঁটিয়ে তো আগে বিদায় করি।" কল্যাণীর ঝাড়ু চলতে লাগলো সবেগে।

"আরে আরে—ফেলিসনি চটিটা।" অবনী ছুটে গেল চটির উদ্দেশে, "ওটা বেচলেও কয়েক আনা ট্যাঁকে আসবে আমার। বেকার মানুষ—ঘুরে মরি এখানে-ওখানে। তবু ক'খেপ ট্রামের ভাড়াটা"—

"পয়সা চেয়ে নিও।" কল্যাণী বললে, "ও চটির চেহারা দেখলে বিক্রি-আলাও হাসবে,—সামনে পেছনে বেঁকে গোল হয়ে গেছে। ওটার আছে কি?"

অবনী সক্ষোভে বললে, "ইস্—এ্যাদ্দিন ছিল চটিটা, রেখেছিলুম দরকার পড়লে বেচবো বলে।"

"চুপ করে বসো।"

তারপর কল্যাণীর চোখ পড়লো একটা টিনের সুটকেসের দিকে। সুধার দিকে চেয়ে কল্যাণী বললে, "বউদি' ভাই দেখো তো, ওটায় কি আছে।"

অবনী সেটা ছোঁ-মেরে নিয়ে আগলে বসলে। বললে, "যা আছে—থাক।"

কল্যাণী হাসলো। বললে, "তবে নিশ্চয়ই ওতে বউদি'র চিঠি আছে।"

সব গোছগাছ করে কল্যাণী ঘর সাজিয়ে দিলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশ ভাবে অবনী সাজানো গোছানো ঘরটার দিকে চেয়ে বললে, "মনে হচ্ছে—অন্য কার ঘরে যেন না বলে ঢুকে পড়েছি। রাতে আমার ঘুম হবে না কল্যাণী—আমার যেমন ছিল তেমনি করে দে!"

নতুন বউ সুধা হাসলো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। হাসলো শান্তা—হাসলেন মহামায়াও রান্নাঘরের কোণ থেকে। শরতের নিরুদ্দেশ মেঘখণ্ডের মতো একটা আনন্দ ভেসে ভেসে এসে পড়েছে যেন এ পরিবারে—অপ্রত্যাশিত, নাম-হারা। বহুদিনের পরে মহামায়ার মন ভাসছে সে আনন্দে—বহু দুঃখের এক প্রান্তে।

অন্যমনস্ক হয়ে যায় শুধু অবনী—কল্যাণীর উজ্জ্বল মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে। দিনের পর দিন হাসিমুখে টেনে-চলা ওর দিন—এ সংসারের গোটা বোঝাটা টেনে চলার কি আনন্দ ওর কে জানে, অবনীকে কিন্তু সমস্তটা ভয়ানক বিচলিত করে তোলে। সেই মুহূর্তে এই মেয়েটার জন্যে কিছু একটা করবার জন্যে মন তার আকুলি-বিকুলি করে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত কল্যাণীকে সাহায্য করার আবেগে অবনী বড় কিছুর আশা আপাতত ছেড়ে দিয়ে ইন্‌সিওরেন্সের দালালী নিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিলে।

কয়েকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা অবনীর। কার্জন পার্কের সেই খাপছাড়া নিরালা জায়গায় বকুলতলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে—কল্যাণী একদিন যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল নরেনের জন্যে। নরেনকে দেখে অবনী পায়ের গতি কমালে। হাসলো একটু।

নরেন কিন্তু কিছুটা চঞ্চল ও সংকুচিত হয়ে ওঠে অবনীকে দেখে, সেটুকু চোখ এড়ায় না অবনীর। অবনী বললে সহজ গলায়, "কি হে—দাঁড় করিয়ে রেখেছে কল্যাণী তো ?"

"এই দেখো—দশ মিনিট কেটে গেল।" নরেন কাজের মানুষের মতো বললে, "অথচ একটা জরুরি কাজ ছিল আমার।"

"অমন কাজ আমাদেরও থাকে হে—চলো।" অবনী নরেনকে টেনে নিয়ে চললো, "তোমার সঙ্গে কথা আছে। কল্যাণী যেমন দেরী করছে—থাক ও পড়ে।"

নরেনের যাওয়ার ইচ্ছে নেই। বললে, "আর একটু দেখলে হতো অবনী। ইউনিয়ন সম্পর্কে জরুরি কিছু কথা ছিল হে।"

"সে পরে বলো। ওর সামনে সব কথা আমার বলা হবে না।" অবনী টেনে নিয়ে চললো নরেনকে।

অবনীর কথার গুরুত্বে নরেন চললো সঙ্গে সঙ্গে। কিছুটা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপার কি! তোমার চাকরি বাকরির সুবিধে কিছু হলো ?"

"হলো—ইনসিওরেন্সের দালালী।" অবনী বললে, "গোটা দশ-বারো ইনসিওর ম্যানেজ করতে পারলে একটা দিশী কোম্পানীতে চেয়ার আলো করে বসার সুযোগ পেতে পারি মনে হচ্ছে।"

নরেন বললে, "বটে—তবে আমি একটা করাবো।"

"করবে বৈ কি—তুমি, কল্যাণী দু-জনেই করবে।" অবনী বললে, "তার আগে তোমাদের দু-জনেরই একটা মস্ত বড় কাজ করা বাকি আছে। ভাবছিলুম ক'দিন—যাবো তোমার কাছে। চলো—কার্জন পার্কে বসে কয়েকটা কথা আলোচনা করি।"

ওরা দু-জন কার্জন পার্কের ঘাসের ওপরে এসে বসলো।

নরেন সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলে, "বাকি কাজটা কি অবনী ?"

অবনী বললে, "তোমাদের বিয়ে।"

নরেন থমকে চুপ করে গেল।

অবনীর মন ভরে আছে কল্যাণীর জন্যে। সে বললে, "ওটা সেরে ফেল নরেন।"

নরেন আস্তে আস্তে বললে, "কিন্তু এ সম্পর্কে কল্যাণীকে আমি এ পর্যন্ত কিছুই বলিনি অবনী।"

অবনী বললে, "বলা কি উচিত ছিল না?"

নরেন একটু দ্বিধা করে বললে, "ছিল।"

অবনী বললে, "তবে বলো এবার তাকে। আমি আজই মায়ের সঙ্গে কথা বলে বাকি সবটা ম্যানেজ করে ফেলছি। তোমাদের এই ঢিলেমি আমি আর সহ্য করতে পারছি নে।"

নরেন একটু ভেবে বললে, "বেশ!"

"তুমি সুখী হবে নরেন—কল্যাণী তোমার ঘরে স্বর্গ রচনা করবে, এ আমি বলে দিলুম।" অবনী আবেগ ভরে বলে উঠলো।

নরেন হাসলো। ওদের ভাই-বোনের দুর্নিবার আকর্ষণ অজানা নেই নরেনের। সেইটের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, "কিন্তু তোমার ঘরের অবস্থা কি হবে?"

"সেটা আমার মস্ত ক্ষতি জানি।" অবনী বললে, "তবু ওর ক্ষতিতে মন আর মানছে না। ওকে আমি সুখী দেখতে চাই নরেন! জানি, সংসারও হয়তো অচল হবে কিছুটা, কিন্তু"—

নরেন অবনীকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "থামো থামো—অতোটা এগিয়ে ভেবে দুর্ভাবনা বাড়িও না।" একটু থেমে বললে, "জানোই তো—পরিবার-পরিজনের পাট আমার সব পরিষ্কার। থাকি মেসে। মরলে একট শেয়াল-কুকুরও নেই যে দু'ফোঁটা চোখের জলে ফেলবে। তোমার বোনের উপার্জন তোমার সংসারেই থাক ভাই। ওতে আমার লোভ নেই।" বলে সে নিজের রসিকতায় হাসতে লাগলো।

মন ও হৃদয়ের লেন-দেন থেকে কথাটা অর্থের পর্যায়ে এসে অবনীকে কিছুটা সংকুচিত ও লজ্জিত করে দিল। বিঁধতে থাকে তার নিজের অর্থ উপার্জনের অসামর্থ্যটা। অবনী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, নরেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ও ব্যাপারে আর কথা বাড়িও না

অবনী। . ওই ক'টা টাকার চেয়ে অনেক মহৎ একটা কিছু আমি পাবো—যেখানে অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে তোমার মস্ত ক্ষতি।”

“ক্ষতি—সত্যি আমার মস্ত ক্ষতি নরেন।” অবনী আবেগ ভরে বলে উঠলো আবার, “একসঙ্গে পিঠোপিঠি এতোদিন মানুষ হয়েচি—আর ও আমার সব কিছু এমন বোঝে, মনে হয় মা-ও বোধ করি অতো বোঝে না।”

“আমি জানি অবনী।”

মনের মস্ত বড় একটা ভারকে নামিয়ে দিয়ে অবনী যেন বসে রইলো পরিতৃপ্তিতে। সহজ আবেগের মানুষ সে—অত্যন্ত সহজে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে। যাক, কল্যাণীর জন্যে সে একটি সুখ—একটি আকাঙ্ক্ষিত শান্তির কোণ রচনা করতে পেরেছে।

“এবার চলো উঠি।” নরেন উঠলো।

বড় হালকা মনে হয় নিজেকে অবনীর—আনন্দ-বেদনায় মেশানো একটা স্বস্তির হাওয়ায় মন তার হয়ে ওঠে একটা শিশুর মতো। সমস্ত ভাবনামুক্ত।

১৩

মুশকিল এই যে সহজ আবেগের মানুষ তুনিয়াটাকে সোজা চোখেই দেখে—এবং সোজা ভাবেই তার সমাধান করতে চায়। এর জন্যে তাদের ভাবনা চিন্তা বা বিলম্ব—কোনোটাই ধাতে সয় না। শিশুর এই সারল্য নিয়ে অবনী গেল মহামায়ার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের যুক্তি পরামর্শ করতে।

মহামায়া রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। অবনীকে দেখে বলে উঠলেন, “কোথায় থাকিস বল দেখি তুই। বউমা তখন থেকে ঘর-বার করছে, তাকে নিয়ে বেরোবি বলেছিলি কোথায়। শেষ কালে শান্তা আর সে গেল।”

"যাকগে—আমি কোথাও যাচ্ছিনে মা আজ আর।" অবনী মাহামায়ার আরও কিছুটা প্রসন্নতা আকর্ষণ করে বললে, "এই রান্নাঘরের কোণে বসে প্রাণভরে তোমার হাতে একটু চা খাই আজ। তোমার মেয়ে-বউ যা চা বানায় তাতে দুধ এবং মিষ্টির ভাগটা বড়ই কম থাকে মা।"

মহামায়া খুশিই হলেন। বললেন, "বেশী বকিসনে—বোস দিচ্ছি।"

একটা সহজ পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে অবনী বললে, "একটা কথা ভাবছিলুম মা।"

"কি?"

"কল্যাণীর বিয়ের কথা।"

সে বিয়ে কার সঙ্গে, কবে—অবনীর এতো কথা শোনবার অবকাশ হলো না আর। কাঁচের পেয়ালা পিরিচ ঝন্ ঝন্ করে পড়ে গেল মহামায়ার হাত থেকে।

"কি বললি—কার বিয়ে?" মহামায়া তাকালেন অবনীর দিকে—সামনে যেন বিভীষিকা দেখছেন।

অবনী সহজ গলায় তখনো বললে, "কল্যাণীর বিয়ের কথা ভাবছিলুম মা—নরেনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া উচিত।"

"উচিত! কেন, কি ঘটিয়েছে কালামুখী!"

অবনী শক্ত গলায় বললে, "ঘটেনি কিছুই—তবে পরস্পরকে ওরা পছন্দ করে, ভালবাসে মা। ওদের বিয়ে হলে ওরা সুখী হবে।"

"জানিস সে বিধবা!"

"তাতে কি হয়েছে! কবে ছোটবেলায় কি একটা করেছিলে তোমরা সঙ সাজিয়ে—তার ঠিক নেই। ও সব বাদ দাও। আমি ওদের বিয়ে দেবো।"

"আমি কি মাথা খুঁড়ে মরবো? কি ঘেন্নার কথা! আমি তখনি জানি—এ হতচ্ছাড়া বংশে একটা কেলেংকারী না ঘ'টে যায় না। ওই নরেন—আর ওই কালামুখী"...

"কি যা-তা বলছো তুমি।" অবনীও ক্ষেপে উঠলো, "একটা কৃতজ্ঞতাও নেই তোমাদের! যে তোমাদের মুখের অন্ন যোগাচ্ছে"—

"বেরো—সামনে থেকে বেরো আমার। নইলে বল, আমিই বেরিয়ে যাই কোথাও। তোদের মুখ যেন আর দেখতে না হয় আমাকে।" বলতে বলতে মহামায়া নিজেই বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের বেগে! সিধে নিজের ঘরে ঢুকে দরোজা দিলেন।

আড়ালে অন্ধকারে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল কল্যাণী—থমকে দাঁড়িয়েছিল তারই প্রসঙ্গ শুনে। মায়ের ভয়ংকরী মূর্তির সামনে থেকে সরে গেল দ্রুত।

মহামায়া সেই যে ঘরে দরোজা দিলেন—তা আর খুললো না সারা রাত। মেয়ে-বউ, মিলু-বিলু বৃথাই ডাকাডাকি করে দরোজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। সারা রাত জলও স্পর্শ করলেন না তিনি।

কল্যাণী কেঁদে পড়লো অবনীর কাছে গিয়ে, "এ কি করলে দাদা তুমি! মাকে ডেকে বার করো।"

অবনী বললে, "মরে মরুক। ওঁর ওই পণ্ডিত বংশের গোঁ আর গোঁয়াতুর্মির কাল আর নেই।"

নিরম্বু উপবাসে কাটলো মহামায়ার একটি রাত্রি।

পরের দিন সকালে কল্যাণী অনেক কাকুতি মিনতি করে দরোজা খোলালে, "আমার কথাগুলো আগে শোনো মা—তারপর যা হয় করো, দরোজাটা খোলো একবার।"

কি ভেবে মহামায়া দরোজা খুললেন।

কল্যাণী ঘরে ঢুকে মায়ের পা ধরে কেঁদে ফেললে। বললে, "দাদা যা বলেছে তোমাকে—আমি তার কিছুই জানিনে মা—বিশ্বাস করো।"

কঠোর কণ্ঠে মহামায়া বললেন, "পায়ে হাত দিয়ে বলছিস?"

"বলছি মা।"

কল্যাণী থমকে চেয়ে রইলো মায়ের ক্রুদ্ধ ভয়ংকর মুখটার দিকে কয়েক মুহূর্ত। মুখে তার আর কোনো কথা যোগালো না।

"কি পাপ আমি পেটে পুষেছিলাম!" মহামায়া ডুকরে উঠলেন, "হতচ্ছাড়ি ভুলে গেলি তুই বিধবা। তবে কেন তোকে দিয়েছিলাম আমি সেই মহাপুণ্যবতীর পায়ের ছাপ একদিন, কেন তোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি এ পাপ থেকে!"

কল্যাণী অনেকক্ষণ পরে ফ্যাকাশে মুখে বললে, "ভুল করে সে পায়ের ছাপের মূল্য তখন বুঝিনি মা—তুমি আশীর্বাদ করো, আর যেন ভুল না হয়। আর আমি ভুল করবো না—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি। তুমি ওঠো, কিছু খাও। শেষ বারের মতো বিশ্বাস করো আমাকে।"

"অনেক করেছি—সেই তোদের বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে।" মহামায়া একরোখা গলায় বললেন, "শেষ পর্যন্ত এই তার ফল। তার চেয়ে মরতে দে আমায়। এ পাপ-ঘরে জলস্পর্শও করবো না আর। হতভাগী, তোর নিজের কথাটাই আজ বড় হলো। তোর নাবালক ভাই-বোনেরা, তাদের ছেড়ে তুই নিজের কথাই ভেবে মরছিস!"

"তাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে মা—শেষবারের মতো বিশ্বাস করো আমাকে।" ব্যাথাহত মুখ তুলে তাকালো কল্যাণী।

মহামায়া একরোখা ভাবেই বললেন, "এই লেখাপড়া শিখে বাইরে যারা বেরিয়েছে একবার—তাদের আমি আর বিশ্বাস করি না। ওরা যাদু জানে। নইলে দেখলুম তো, নরেন চোখ তুলেও একবার তাকালে না শান্তার দিকে!"

কল্যাণী হঠাৎ যেন একটা তড়িৎস্পর্শে শিউরে ওঠে। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। ঝপ করে মহামায়ার পা চেপে ধরে বললে, "যেমন করে হোক শান্তার সঙ্গে নরেনদা'র বিয়ে আমি ঘটাবোই মা—আমাকে বিশ্বাস করো, দেখো তুমি!"

মহামায়া বললেন, "যে পায়ের ছাপটা দিয়েছিলুম—সেটা কই নিয়ে আয়।"

কল্যাণী তার স্যুটকেস হাতড়ে কম্পিত হাতে তুলোট কাগজের ছাপটা নিয়ে এলো।

মহামায়া কঠিন কণ্ঠে বললেন, "ওটা ছুঁয়ে শপথ কর।"

"করছি মা," কল্যাণী ফ্যাকাশে মুখে বললে, "আর ভুল হবে না।"

এত কাণ্ডের পর তবে কল্যাণী মহামায়াকে তাঁর অনশন থেকে টেনে তুলতে পারলো।

মহামায়া কিন্তু শুধু এইখানেই ক্ষান্ত হলেন না। সেই দিনই তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ওলটপালট করে তুললেন কল্যাণীর ছোট্ট ঘরখানাকে। তার মাথার কাছে ছোট টেবিলটার ওপরে ছিল দু-একখানা বাঙলা ইংরেজি উপন্যাস, নরেনের দেওয়া দু-চারখানা ইতিহাস, রাজনীতির বই—টেবিল সমেত সে গুলোকে চালান করে দিলেন অবনীর ঘরে। সে জায়গায় ছোট্ট জলচৌকি একটা পেড়ে তার ওপরে রাখলেন সেই তুলোট কাগজে তোলা আলতা-পরা পায়ের ছাপখানা। নিজেই সেটাকে সাজিয়ে দিলেন ফুলের মালা দিয়ে, জেলে দিলেন ধূপ-ধুনো। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সবটা —ঠিক হলো কি-না।

বোধ হয় হলো না। আফসোস করে বললেন, "শুধু জামাইয়ের আমার একটা ছবি যদি থাকতো!—বামুন পণ্ডিত সাদাসিদে মানুষ ছিল সে। তোর বিয়ের সময়েও কোনো ফটো তোলা হয়নি।"

কল্যাণী শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো মেয়ের দিকে।

মহামায়া আবার বললেন, "এতো দিনে কত বড় বিদ্যেবাগীশ স্মৃতিচুঞ্চু যে হতো সে—কে জানে! তোর দাদুর টোলে স্মৃতি পড়তো। তোর দাদু বলতো—ও ছাত্রের জুড়ি নেই।"

কল্যাণী নীরব।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহামায়া বললেন, "সব কপালের লেখন মা, খণ্ডাবে কে! যাক, রইলো সেই পুণ্যবতীর পা; পুজো করবি। আমার শাশুড়ী বলতেন—বিধবার জীবন—জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা। তোর মনের দুর্বলতা ওই সতীর পায়ে ঢেলে দিস। জোর পাবি।"

কল্যাণী আর মহামায়ার এই ব্যাপার অবনী কিছুই জানলো না। মায়ের সেকেলে গোঁয়ার্তুমির বিরুদ্ধে সে তখন নিজেকে আরও কঠিন করে তুলছে লড়াইয়ের জন্যে।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে লড়াই করবার আগেই নরেন সব ভেস্তে দিয়ে গেল।

নরেন বললে, "হলো না অবনী।"

"কি হলো না হে।"

"কল্যাণী এ বিয়েতে রাজী নয়।"

"রাজী নয়? বলো কি!"

"সে অনেক কথা। এতদিন পরে মোটমাট এইটুকু আমি বুঝেছি—সে বিধবা, তার ভালবাসাও পাপ—বিয়েটাও পাপ।"

"সেই আন্তিকেলে পচা কাসুন্দি"—অবনী ক্রুদ্ধকণ্ঠে গালাগাল দিয়ে উঠলো, "এ নিশ্চয়ই মায়ের কাণ্ড। ঘাবড়িও না তুমি—সবটা আমি আজই ম্যানেজ করে ফেলছি দেখো।"

"দোহাই ভাই—এইটে আর ম্যানেজ করতে এসো না।" নরেন হাত চেপে ধরলো অবনীর, "যে ভালবাসে না—যার সহজ বন্ধুত্বকে আমি ভালবাসা বলে ভুল করেছি—এ সব কথার পর আর কোনো কথা চলে না."

"এই কথা বললে সে!"

"বললে—এবং আরও বললে, ভালো নাকি বাসে আমাকে শান্তাই। আমার না-কি তাকেই বিয়ে করা উচিত।"

"শান্তাকে! তুমি!" অবনী যেন থ' হয়ে গেল।

"তাই সে বললে। বললে—আমার প্রেমের নিষ্ঠা সত্যিই থেকে থাকলে শান্তাকেই আমার বিয়ে করা উচিত—অন্তত তার জন্যে।"

"হুম্।" বলে অবনী চুপ করে গেল এবং অস্থির ভাবে পায়চারী শুরু করে দিলে।

নরেন বললে আস্তে আস্তে, "এ যে কী কঠিন পরীক্ষায় ফেললে সে আমাকে। তোমাকে সব গুছিয়ে বলার মানসিক অবস্থা আমার

এখন নেই অবনী—পরে সব শুনো। আর একটি কথা, এ নিয়ে কোনো রকম আর টানা-হেঁচড়া করো না ভাই।”

নরেন চলে গেল।

অবনী গুম হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ।

ভেবে ভেবে সে যেন কূলকিনারা পেল না। শেষ চেষ্টার জন্যে উঠলো সে গা-ঝাড়া দিয়ে। গিয়ে দাঁড়ালো কল্যাণীর ঘরে।

কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়লে সে। যেন অচেনা কার ঘরে এসে ঢুকে পড়েছে। এ ঘরের গোটা পরিবর্তনটা তাকে যেন চাবুক কষালো। কল্যাণী পেছন ফিরে বসেছিল—অবনী ডাকলো, “কল্যাণী!”

কল্যাণী তাকালো, তার ভাবলেশহীন মুখখানা ফিরিয়ে।

অবনী বললে, “এ কি করেছিস কল্যাণী! কি সব যা-তা বলেছিস নরেনকে?”

“ঠিকই বলেছি দাদা।” কল্যাণী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, “তুমিই শুধু ব্যাপারটকে ঘোরালো করে তুলেছিলে।”

“আমি!”

অবনী বিমূঢ় চোখ তুলে কল্যাণীর কঠিন ভাবলেশহীন মুখটায় বৃথাই কি যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল সুধা। জিজ্ঞেস করলে, “কি বললে কল্যাণীদি’?”

“আরে দূর—কার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি আমি!” অবনী বিরক্ত হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো, “আজ থেকে ওর কোনো কথাতে আমি আর নেই।”

সুধা শূন্য চোখে চেয়ে রইলো। না বুঝলো সে অবনীর হঠাৎ জ্বলে ওঠা রাগ—না বুঝলো কল্যাণীর আচরণের মানে। এ সংসারে প্রথম দিনই পা দিয়ে যে মেয়েটিকে পেয়েছিল সে একান্ত বন্ধুর মতো, স্বজনের মতো—তার জন্যে সুধারও হৃদয়ভরা শুভেচ্ছা ও চিন্তা কম ছিল না।

১৪

ঘাটে নোঙর করার আগে প্রথম একটা ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা যেমন কিছুটা টলমল করে তারপর স্থির হয়ে যায়, তেমনি এই পরিবারটিও যেন নতুন একটা ঘাটে ভিড়বার আগে কতকগুলো ঘটনা সংঘাতে আন্দোলিত হয়ে তারপর আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এলো তার দৈনন্দিন নিয়মে।

ব্যতিক্রম শুধু দুটো মানুষের মন। পূর্ণিমার সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো তার বাঁধা নিয়মের তটভূমি অতিক্রম করে কোথায় যে ছুটে যাবে—যেন তার দিশাও পেল না। সে মন অবনী আর সুধার। কল্যাণীর উপার্জন যে যথেষ্ট নয়, অবনীর উপার্জন যে অনির্দিষ্ট, উৎসব আনন্দে অঢেল ঢেলে দেওয়ার অবকাশও যে বড়ই কম—তবু মানুষের দেহটার মধ্যে এতোটা যে বিস্ময় আছে, আছে এতো আত্মহারা আনন্দ—তার নব নব আবিষ্কারে দুটো ঝাঁপিয়ে পড়া মন যেন খেই হারিয়ে ফেললে। একটা উষ্ণ আর নতুন স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে ওঠে চির পুরাতন জগৎটার মাঝখানে—আপন খেয়ালে চলা ছেলেমানুষের মতো।

অন্য সব কিন্তু চলেছে যথানিয়মে। শান্তা এবং মহামায়ার 'বাড়ন্ত' ভাঁড়ার আর রান্নাঘরের ক্লান্তি, কল্যাণীর পদচিহ্ন পুজো আর ন-টায় আফিস এবং মিলু-বিলুর ইস্কুল।

তারপর কর্মমুখর দুপুরে এ গলিটা যখন নিঃশব্দ হয়ে আসে তখন ভাঙা তে-পায়া টেবিলটার এক পাশে, আধপোড়া বিড়িটায় নতুন করে আগুন ধরিয়ে সুধার সামনে কাব্য-পাঠ শুরু করে অর্ধবেকার অবনী :

…"আজি

এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি,
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে—
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধা-পানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর। ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী ; বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী—"

সুধা হেসে বাধা দিয়ে বললে, "কি সব আজেবাজে কবিতা"—

"খবর্দার, আজেবাজে বলো না। কবিগুরু এটা বাতিল করে দিয়ে আসলে রেখে গেছেন শুধু বেকার অবনী মুখুজ্যের জন্যে।" অবনী বললে, "শোনো।"

হায় রে, এ কাব্য-পাঠই বা কতো দিন পরে! বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর সঙ্গে চুকেবুকে গেছলো সব। বেকারের মেজাজহীন দিন। তার মাঝখানে হঠাৎ ফিরে এসেছে যেন পুরানো আমেজ। অবনীর গলা কাঁপতে থাকে ছন্দে, সুর-তরঙ্গে:

"আধুনিক রাজধানী,
আমি তারি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরির কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম হতে; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে,
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু—কোনো কীর্তি নাই—"

সুধা বাধা দিয়ে বললে, "অতো চেঁচাচ্ছ কেন! মা আর শান্তা শুনতে পাবে যে।"

"কীর্তির কথাটা বলছিলুম কি-না। গলাটা অমনি বেড়ে উঠেছিল।" তারপর অবনী গলা একটু নামিয়ে আবৃত্তি করে চললো:

"দুটি আঁখি মুদি
বারেক শ্রবণ করো সুগম্ভীর গান
ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে; দুটি প্রাণ
বাঁধিছে একটি সুরে। স্তব্ধ রাজধানী
দাঁড়াইয়া নতশিরে, মুখে নাহি বাণী॥"

আধপোড়া বিড়িটায় আর কিছু নেই। বার কয়েক সেটা সিপ্ সিপ্ করে টেনে ফেলে দিয়ে অবনী বললে, "গোটা দুই পয়সা আছে? দাও তো, বিড়ি আনি।"

"ওমা, পয়সা আমি কোথায় পাব!" সুধা হেসে বললে, "তোমার ওই ভাঙা সুটকেস ঘাঁটতে গিয়ে ভাবলুম, দেখি তো কি ধনদৌলত আছে, যেমন করে আগলে বসেছিলে সেদিন। পাওয়ার মধ্যে পেলুম

একটা বাঁশী আর কবেকার গোটা দুই আধপোড়া বিড়ি, আমার লেখা চিঠি ক'টা আর ছেঁড়া জামা ক'খান। বাঁশীটা কার—তোমার?"

"আমারই বটে। ভেবেছিলুম—ওটা বোধ করি হারিয়ে গেছে।" বলে অবনী সুধাকে আস্তে আস্তে টেনে নিল নিজের কাছে।

সুধা বাধা দিল না। আনন্দের একটা ঢল নামলো যেন তার সর্বাঙ্গ বেয়ে। ঘরের ঘোলাটে কোণে নিজেকে সে ছেড়ে দিলে অবনীর কাছে। আস্তে আস্তে বললে, "বাঁশী বাজাতে তুমি!"

"বাজাতুম একদিন সুধা।" অবনী অন্যমনে বললে।

"কি ভাবছো?"

বলতে পারলো না অবনী স্পষ্ট করে।

কিন্তু বিস্মৃত জগৎ একটা ফিরে আসছে যেন—মনের পথে, বুদ্ধির পথে—আদিম হৃদয় আবেদনের পথে। সুধাকে সে দু'হাতে এলোমেলো করে দিলে বিছানায়—তার চুল, তার শাড়ী, তার ব্লাউজ, তার পেটিকোট। একটা বিস্ময়—একটা অনাবৃত আনন্দ তার সামনে। কোন এক বিস্মৃত অনাবৃত মহাশ্বেতার উন্মুক্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার তার মলিন দরিদ্র এ ঘরের এক কোণে! রুদ্ধ আবেগে গলা কাঁপে তার—সুধার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আবার আবৃত্তি করে অবনী:

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরংগ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহু যুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।..."

নির্জন সে কোন বনপ্রান্তের মধ্যাহ্ন রোদের মতো অবনীর কম্পিত কণ্ঠস্বর, তার আবেগ আর তার উষ্ণশ্বাস সুধার সর্বাঙ্গকে যেন স্পর্শ করছে এসে। তার দেহের প্রতিটি রন্ধ্র যেন জেগে উঠেছে সে

স্পর্শে।. সে ধন্য—সে পূর্ণ; সেই পূর্ণতার—পরিতৃপ্তির একটা শব্দ শুধু স্খলিত হয়ে পড়লো সুধার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে:

"আঃ!"

এ জগৎ স্বতন্ত্র—এ জগৎ শুধু দু'জনের। পাগলের মতো সুধার সর্বাঙ্গে চুম্বনে ভরে দিল অবনী। সুধা দু-হাতে চেপে চেপে ধরে অবনীর মুখটাকে নিজের সর্বাঙ্গের স্পন্দিত আনন্দের মাঝখানে—প্রতিটি মুহূর্ত তার পুলকে শিহরিত। সেই ক্ষণস্থায়ীকে সে যেন মুঠো করে চিরকালের করে রাখতে চায় তার আনন্দিত উপভোগের মাঝখানে: এতো আনন্দ আছে একটা পুরুষের পীড়নে, চুম্বনে, সোহাগে! লজ্জা আর সংকোচের অর্গলবদ্ধ সমস্ত দুয়ারগুলো যেন খুলে দিল সে শক্তিমান কঠিন পৌরুষের সামনে। তার সমর্পিত দেহ—তার সমগ্র সত্তা যেন বলে উঠলো: দাও দাও—তোমার পাপ দাও, পুণ্য দাও,—তোমার পীড়ন দাও, তোমার প্রেম দাও,—তোমার পৌরুষ দাও, তোমার দুঃখ দাও। তার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে শুধু অস্ফুট শব্দ একটা খসে পড়লো আবার:

"দাও—দাও ..."

অবনী রুদ্ধ আবেগে ডাকলো, "সুধা!"

সুধা আর কোনো সাড়া দিল না। সে যেন মহামৌন তার পূর্ণতার মাঝখানে। এখানে আর তার কোনো কথা নেই। শুধু পুঞ্জিভূত আনন্দের জমাট স্তব্ধতা। আত্মস্থ—স্তম্ভিত।

কিন্তু সে স্তব্ধতার মধ্যে একটা পুরুষ সান্ত্বনা পায়নি কোনোদিন। আত্মস্থ স্তম্ভিত আনন্দ থেকে উচ্ছলিত সে সহস্র প্রবাহে—সৃষ্টির তরঙ্গ তার ছোটে, খোঁজে—অস্থির হয়ে ওঠে। স্তব্ধ হয় না। বার বার তাই অবনীর কণ্ঠ ভেঙে পড়ে আবেগে:

"তুমি সুখী! তুমি ... বলো ... বলো..."

আনন্দ শিহরণে স্তব্ধ কণ্ঠটা থেকে একটি পরিতৃপ্ত শব্দ শুধু বেরুলো সুধার।

"তুমি আমার মহাশ্বেতা! বেকার অবনীর ..."

"চুপ।" সুধা অবনীর মুখটাকে বুকের ওপরে চেপে ধরলো। বললে, "আমি সুখী।"

অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়—তবু আছে সুধার কোন এক অদৃশ্য রাজ্যে সম্রাজ্ঞীর গৌরব। সে সুখী—সে পরিপূর্ণ।

কল্যাণী সেদিন একটু তাড়াতাড়িই অফিস থেকে ফিরে এলো। কি একটা হাফ-ছুটির দিন ছিল। অবনীকে ঘরে দেখে একটু অবাক হয়ে বললে, "দাদা আজ বাইরে বেরোওনি?"

জবাব দিতে গিয়ে কেমন একটু সংকোচ বোধ করে অবনী। বোনের খেটে আসা ক্লান্ত চেহারাটার সামনে সারা দুপুরের উপভোগ-তৃপ্ত দেহটাকে নিয়ে সংকোচ তার। তবু বললে আমতা আমতা করে, "এই—শরীরটা ভালো লাগছিল না আজ। তা ছাড়া আমার কাজ তো—তোদের অফিস টাইমের ধার ধারে না।"

কল্যাণী বললে, "গোটা কয়েক টাকার দরকার—জোগাড় করো দাদা। এ মাসে বাড়তি খরচায় হাত একেবারে খালি।"

কল্যাণীর কোনো কথাটাই ভালো লাগলো না। বিশেষ করে আজকের আবেগে আন্দোলিত নিভৃত মধ্যাহ্নটির পর। অবনী বললে, "দেখি কোথাও ধার যদি পাই। আমার কাছে কিচ্ছু নেই।"

"তা জানি।" কল্যাণী হেসে বললে, "পরের মাস থেকে তোমাকে আর একেবারে চাপ দেবো না দাদা। এ মাস থেকে বড় সাহেবের খাস কামরার স্টেনো হয়ে গেছি—পরের মাসে মাইনে আর কিছু বাড়বে।" বলে হাসলো সহজ ভাবে।

কিন্তু অবনী আজ অতো সহজে হাসতে পারলো না। এমন কি কল্যাণীর পদবৃদ্ধিতেও। আজকের পরিপূর্ণ দুপুরটাকে বিকেলের আলোয় বড় করুণ আর বিষণ্ণ লাগে তার বার বার এবং কেবলি বিঁধতে থাকে তার অক্ষমতা। বিঁধতে থাকলো এই কথাটাও যে, বাড়তি ব্যয়ে হাত খালি কল্যাণীর—এবং নিজের বিয়েটা তার এখনও একমাসও হয়নি। দুপুরটা তার যতো আনন্দেই কাটুক—সে

আনন্দের জন্যে মূল্য চাই। কল্যাণী চলে গেলে তাকালো সে সুধার দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে। সুধার মতো করে বললে জোর করে হেসে, "আমি সুখী!"...

সুধা করুণ মুখে তাকালো চোখ তুলে। অবনী জামাটা গায়ে দিতে দিতে মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলো:

"লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি যুঝে মরি এক পার্শ্বে তার
এক কণা অন্ন লাগি!"...

সুধা মিইয়ে-যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলে, "ফিরতে রাত হবে?"

"আগে ধার তো পাই।" বলে অবনী বেরিয়ে গেল।

সুধা দাঁড়িয়ে রইলো জানালার গরাদ ধরে। সন্ধ্যে এখনও হয়নি তবু এ কানাগলিতে বিকেলের ছায়া সন্ধ্যের মতো মলিন হয়ে এসেছে। ওই রকম সকরুণ ম্লান ছায়া একটা আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার সারা দুপুরের পুরুষস্পর্শে পুলকিত সর্বাঙ্গের ওপর—কেমন একটা অকারণ বিষাদে। হঠাৎ মনে হয়—জীবনটা যেন বড় সংকীর্ণ! কেন?

দারিদ্র্য কি, অভাব কি—তা সে জানে। অন্যের গলগ্রহ হয়ে সে প্রতিপালিত। অতএব এ সংসারে নতুন এলেও—অভিনব বলে কিছু সে দেখতে পায় নি। কিন্তু তারই মধ্যে, সেই চিরপরিচিত অভাব ও অনটনের মধ্যেও একটা নতুন মন তার সম্রাজ্ঞীর মতো সেজে বসেছিল—সে তার নতুন জীবনের প্রেম। সেখানে তার আশার অন্ত নেই—আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সেখানে ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে—বিশ্বপ্রকৃতি তার হাজারো সমৃদ্ধির খবর বহন করে আনে এই কানা গলির অন্ধকার একটা ঘরে, তার মন জেগে ওঠে সহস্র স্বপ্নে। নতুন এ জীবনে এতো মাধুর্য—এতো প্রত্যাশাও ছিল! একটা পুরুষের স্পর্শে সে সুখী—সে আনন্দিত—সে পরিপূর্ণ! মনের বিষাদ-ব্যাধিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে বলে সে—মানবে না সে দারিদ্র্য ও অনটনের ক্রূর সংকীর্ণতা। অর্থ দিয়ে কে রোধ করবে

তার এতো প্রেম—এতো আনন্দকে! সেই এক নির্বোধ বিস্ময় ও ক্ষোভে সে মনে মনে বলে—জগতে টাকাটাই কি সব!

১৩

একদিন বাইরেটা ছিল একেবারে ঘরের বা'র—মহামায়ার একেবারে নাগালের বাইরে আর ঘরটা ছিল একমাত্র মহামায়ার। সেই ঘর থেকে ছুটেছিল একদিন কল্যাণী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোর বন্যায় চোখ যেন তার ঝলসে গিয়েছিল। সে ঝলসানো দৃষ্টিতে নজর পড়েনি তার ঘরের মানুষগুলোর দিকে—নিজের মধ্যে, নিজের আনন্দেই সে যেন ছিল বিভোর। সে বিভোরতা থেকে তাকে প্রচণ্ড আঘাতে কঠিন হাতে টেনে তুললেন মহামায়া। আত্মবিস্মৃত সে বিভোর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে কল্যাণী যেন চমকে ফিরে তাকালো ঘরের কোণের দিকে।

তবু মহামায়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখলেন ক'দিন। দেখলেন —নরেন আর আসে না। দেখলেন—কল্যাণী ক'দিন একেবারে গুম্ মেরে রইলো—যেন মনে মনে তার নতুন কিছু একটার প্রস্তুতি চলছে। দেখলেন—একটা চাপা কঠিন শপথ এতোদিনে যেন আস্তে আস্তে দানা বেঁধেছে কল্যাণীর চৌকো চিবুকে. সারাদিনের অফিস-খাটুনির পরেও তার মুখে একদা লেগে থাকতো যে দীপ্তি আর লালিত্য—তার রঙ ফিরছে। এসেছে সেখানে ক্লান্ত রুক্ষতা। অধিকন্তু কল্যাণী মন দিয়েছে ঘরে। মহামায়া আশ্বস্ত হলেন।

চাকরিতে পদোন্নতির পর কল্যাণী একদিন মায়ের ঘরে সকলকে নিয়ে একটা মিটিং বসিয়ে দিলে। বিষয়টা হলো—বাড়তি আয়ে আরও কিছুটা ভদ্রভাবে জীবনযাপনের পরিকল্পনা। প্রথম প্রস্তাব হলো তার—শান্তাকে আবার পড়তে হবে। মিলুও সেই সঙ্গে ভর্তি হয়ে যাবে কোনো মেয়ে স্কুলে। বিলুও। পড়াশোনার ভার নেবে অবনী।

মহামায়া মনে মনে অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, "বেশ তো, পড়াও বাছা—পারলে পড়াবে বৈকি।"

কল্যাণী উৎসাহিত হয়ে অবনীর দিকে চেয়ে বললে, "দাদা যদি শান্তার ওপর একটু নজর দাও তা হলে ও পাস করবেই।"

অবনী গম্ভীর।

কল্যাণী আবার বললে, "আর তুমিও আইন পরীক্ষাটা দিয়ে দাও দাদা।—তখন মাত্র একটা বছর পড়ে ছেড়ে দিলে, বাবার মস্ত আফসোস ছিল একটা।"

অন্য সময় হলে হয়তো অবনী মনে মনেও চটতো না—কিন্তু আজ কল্যাণীর মাতব্বরী তার বড়ই বিশ্রী লাগছে—বিশেষ করে সুধার সামনে।

মাতব্বরীর একটা সীমা আছে—কিন্তু কল্যাণীর যেন সে সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো কল্যাণীর দিকে। নিজেকে কোনো রকমে দমন করে অবনী বললে, "পড়ার খরচা আছে তো!"

কল্যাণী সোৎসাহে বললে, "সে তো আমি দিচ্ছিই। তুমি এখন রোজগার করছই বা ক'টা পয়সা।"

সুধা পাণ্ডুর মুখ তুলে এই সময়ে তাকালো অবনীর মুখের দিকে। অবনীর মুখের পেশীগুলো তখন কঠিন হয়ে গেছে।

কিন্তু কল্যাণীর আজ তা চোখেও পড়লো না। তার জীবিকার উদ্বৃত্তটুকু নিয়ে বদান্যতার ঝোঁকে তাকিয়েছে সে ঘরের মানুষগুলোর দিকে—জীবন-বহনের পরিসর বাড়াতে হবে, কোণঠাসা জীবন থেকে হাঁফ নিতে হবে কিছুটা উন্নত জীবনে, সেই পরিকল্পনার ঝোঁকে সে মশগুল। কল্যাণী আবার বললে, "তুমি পড় দাদা। আমি জানি, তুমি উকিল হলে মস্ত বড় উকিল হবে।"

কিন্তু কল্যাণীর কোনো শুভেচ্ছাই আজ অবনীর মন জুড়িয়ে দিতে পারলো না। বরং নিজের অসামর্থ্যের উৎস থেকে একটা গোঁয়ার ক্রোধ মাথা ঠেলে উঠতে লাগলো তার মনের মধ্যে।

কল্যাণী মহামায়ার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি কি বলো মা?"

"তোরা যাতে বড় হোস—সুখী হোস, তাই আমি চাই মা।" মহামায়া বললেন, "ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন"—

কল্যাণী বললে, "আমারও তাই মত মা। যখন যে সুবিধেটুকু আসে তার ব্যবহার করা উচিত।" তারপর অবনীর দিকে চেয়ে বললে, "আর ভালো পাড়ার দিকে একটা বাড়ি-টাড়ির খোঁজ করো তো দাদা। এ পাড়ায় থাকলে মিলু-বিলু ঠিক মানুষ হবে না।"

মাতব্বরী আর উপদেশ শেষ পর্যন্ত অসহ্য মনে হলো অবনীর। আলোচনার মাঝখানে সে হঠাৎ উঠে চলে গেল।

কল্যাণী থম্‌কে সেটুকু লক্ষ্য করে বললে, "দাদার মত কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না মা।"

"কাজের কথায় কবে ওকে সুস্থির হয়ে বসতে দেখেছ বাছা?" মহামায়ারও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। তাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "মেয়ে হয়েও তুই একটা ছেলের মতো যা করছিস—তাতেও ওর শিক্ষা নেই। তবু, তোর ভাই-বোনদের নিয়ে তুই যা করতে চাস কর। আমি আর ক'দিন। আমাকে শুধু একবার তীর্থধাম ঘুরিয়ে আনিস বাছা—আর আমি কিছু চাইনে।"

কল্যাণী হঠাৎ মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বললে, "তুমি আশীর্বাদ করো মা—দেখো, আমি সব পারবো।"

আবেগেই কথাটা বললে কল্যাণী। সেই মুহূর্তে এই মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে মহামায়ার বুকটা যেন ভরে ওঠে। মানুষ প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকলে যা হয়—ক্রোধ আর আনন্দের যতো সহজে আবির্ভাব আর তিরোভাব ঘটে—মহামায়ারও তাই। সমস্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিরাগের পর কল্যাণীর ওপরে অপার প্রসন্নতায় মন তাঁর উছলে ওঠে। কল্যাণীর মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেন।

মন ভরে ওঠে কল্যাণীরও। তারই পরিকল্পিত উজ্জ্বল এক ভাবীকালের দায়িত্ব গ্রহণে আজ সে মশগুল। তার মনের মধ্যে অফুরন্ত শক্তির একটা উৎস উছলে উছলে ওঠে হঠাৎ। গোটা পরিবারটির সুখ, সমৃদ্ধি ও জীবন-রচনার আনন্দে চোখে আর ঘুম আসে না। মস্ত বড় একটা দায়িত্বগ্রহণের উত্তেজনায় অনেক রাত পর্যন্ত সে ছটফট করে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে।

এ বাড়িটার আর সবাই ঘুমিয়ে গেছে—গলিটা মধ্যরাত্রির অন্ধকারে তখন নিঝুম। সেই অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে তার সৃষ্টির ভাবীকালটাকে যেন সে সামনে মেলে ধরলো।

··· অবনী আইন পাস করলো—হলো মস্ত উকিল, শান্তা পাস করলো—তার বিয়ে হলো, মিলু-বিলু হলো মানুষ, এই পচা গলিটা ছেড়ে চলে গেল তারা অন্য কোথাও—ভালো পাড়ায়, অথবা নিজেদেরই বাড়ি হলো একটা। তারপর! ··· তারপর কি? জীবন-রচনায় আর কি বাকি! বলো—বলো—বলো?

উজ্জ্বল সমস্ত পরিকল্পনাটার মধ্যে তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অর্থ, শ্রী, সম্পদ—সামাজিক অবস্থার উন্নত পরিবর্তন, সবটার পরেও কি যেন মস্ত শূন্যতা থেকে যাচ্ছে একটা। কল্যাণী ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে সেই সুদূর ভাবীকালের দিকেঃ যেখানে তার কর্ম, তার কর্তব্য, তার স্বপ্ন—সব সমাপ্ত হয়ে গেছে একে একে। বাকি শুধু ধু ধু করছে তার নিজেরই জীবনটা পরিত্যক্ত একটা প্রান্তরের মতো।

পাশের ঘরে একটা বাঁশী বেজে উঠলো—অনেক দিন পরে। অবনীর বাঁশী। বহুদিন পরে সেই বাঁশীটা শুনে চমকে উঠলো কল্যাণী। মুখ তার যেন নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে গেল। একটা তরঙ্গিত সুর যেন তরল অগ্নিপ্রবাহের মতো ঘুরতে লাগলো তার শ্রুতি, স্মৃতি, সত্তা—সমস্তটা ঘিরে ঘিরে। সেটা যেন এই অন্ধকার গুহার মতো গলির ভেতরে একটা আনন্দের মহাপিণ্ডের বুক-ফাটা চিৎকার। তাকে রুখতে পারলো না জীবনের দারিদ্র্য আর অক্ষমতা, ঘরের অন্ধকার পাঁচিল আর ইঁট-কাঠের বাধা। তার সুর যেন ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, বাতাসে—অগণিত তারার আলোকে। বিশ্বজোড়া সেই সুরতরঙ্গের মাঝখানে বিস্মৃত অভিজ্ঞানের মতো জেগে ওঠে যেন বহুকালের স্মৃতি—এই গলিটা, এই শহর—হারিয়ে-যাওয়া ছাত্রী-জীবনের কোন আশা কোন স্বপ্ন। ··· যেন কোন জন্মজন্মান্তরের একটা করুণ বিষণ্ণ তরঙ্গ কেঁপে কেঁপে এসে ঢুকে পড়লো কল্যাণীর সমগ্র

সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে শুধু অবনীর বিস্মৃত ছাত্রজীবনই নয়—কল্যাণীরও সমগ্র অতীত কাঁপতে থাকে মনের মধ্যে। তার মধ্যে তার জীবনের কোন আশাতীত স্বপ্ন আর প্রত্যাশা বড় করুণ চোখে চেয়ে দাঁড়ায় যেন সামনে এসে।··· একটা মুখ—নরেনের মুখ, সেটা বার বার ভেসে ওঠে ঝাপসা চোখের সামনে। হঠাৎ যেন বড় শূন্য, অর্থহীন মনে হয় তার কাছে তার এ ক'দিনের বহু কষ্টে গড়ে তোলা নূতন ভাবীকাল—অন্যতর আশা, অন্যতর পরিকল্পনা। হঠাৎ কান্না পায় তার—মনে হয়, ব্যর্থ হয়ে গেছে তার সব।

পাশের ঘরে কোন পূর্ণতায় বাঁশী বেজে ওঠে আজ অবনীর, বহুদিন পরে—এ ঘরে কেমন একটা শূন্যতার বেদনা যেন মাথা কুটে কুটে মরতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে থামলো বাঁশীটা।

তখনও উৎকর্ণ হয়ে রইলো কল্যাণী। পাশের ঘর থেকে পাতলা অন্ধকারের মতোই একটু আবছা গুঞ্জন, একটু ছেঁড়া টুকরো কথা ভেসে ভেসে আসে এ ঘরে। কল্যাণীর ঝাপসা চোখে আস্তে আস্তে ঝলকে ওঠে কেমন একটা ক্ষুধার্ত ক্ষিপ্ততা। পা টিপে টিপে এগোয় সে—অন্ধকারে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। দেখা যায় পাশের ঘরের ভেতরটা—কৃপণের মতো কোথা থেকে একটু জোৎস্নাও এসে উঁকি দিয়েছে ঘরের মধ্যে। সেই মিনমিনে আলোয় সে দেখলো চিরকালের এক যুগল মানব-মানবীকে—অনন্ত রহস্যের আবিষ্কারে ছন্দে দোলায়িত কাব্যের মতো।

কে বললে, "তুমি সুখী ?"···

কে পালটে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি সুখী ?"···

ফিসফিসানিটা যেন সাপের মতো জড়িয়ে ধরলো এসে। সে আর দাঁড়াতে পারলো না—সর্বাঙ্গে যেন তার জ্বালা ধরে যায়। ছুটে পালিয়ে এলো এ ঘরে।

বাঁশীটা আবার নতুন করে তখন কোন মধ্যরাত্রির সুর ধরেছে বোধ করি।

কল্যাণী কানে আঙুল চাপা দিল। না—তার জীবনে প্রেম নেই। প্রেম তার পাপ। তার জীবনে সুখের একমাত্র পথ আত্মাহুতিতে। তার আর কিছু নেই। মহামায়ার কথা মনে করে আর্ত চোখে তাকালো সে ফুলের মালায় সাজানো সেই পায়ের ছাপটার দিকে। ছুটে গিয়ে পাগলের মতো দু-হাতে চেপে ধরলো সেটা। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপছে বুক-ফাটা একটা আর্তনাদ। যেন অসহ্য কোনো যন্ত্রণায় দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলো সে আস্তে আস্তে। এ ঘরের কেউ আর জাগলো না—এ কান্নার একটি স্পন্দনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না কারুর সুখ নিদ্রার।

মন শুধালো তার: বলো—বলো—সব হলো, সব পরিকল্পনা সার্থক হলো তোমার—তারপর? বলো—বলো?—

বাঁশীর টানা অদৃশ্য সুরের রেশের মতোই এ ঘরে শুধু চাপা একটা ফোঁপানি কাঁপতে লাগলো অন্ধকারে।

সারা রাত্রির একটা অপরিতৃপ্ত গ্লানি নিয়ে ভোর হলো কল্যাণীর। সমস্তটাকে সে জোর করে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লো। বার বার করে স্মরণ করলো তার দায় আর দায়িত্বের কথা, মায়ের আশীর্বাদ পাওয়া তার পরিকল্পনার কথা। জীবনের যা কিছু প্রত্যাশা, তা নাড়ি-ছেঁড়া ধন হলেও বিস্মৃতই থেকে যাক এ জীবনে! বার বার করে নিজেকে শোনালো সে—সে নতুন মানুষ, নতুন তার কল্পনা, নতুন তার লক্ষ্য। শান্তাকে ডেকে বললে:

"তৈরি হয়ে থাকিস শান্তা। আমি টিফিনের সময় এসে তোকে স্কুলে গিয়ে আজ ভর্তি করে দেবো।"

১৬

আজও কার্জন পার্কের খাপছাড়া সেই কোণের বকুল গাছটায় পড়তি বেলায় তেমনি করেই বকুল ফোটে, বকুল ফুলগুলো ঝরেও যায় তেমনি করে। শুধু সেখানে একজনের জন্যে আর একজনের প্রতীক্ষা, সেইটে হঠাৎ কবে যে শেষ হয়ে গেছে—তার সাল তারিখ কারুরি মনে নেই। বকুলতলার সে কাহিনীকে একেবারে জোর করে মুছে দিয়েছে কল্যাণী। বার বার করে বুঝিয়েছে—সে শান্তা, মিলু-বিলুর দিদি—তার দায়িত্ব অনেক। আর এই দায়িত্বগ্রহণে তার নারীধর্মের গৌরবটা কমই বা কোথায়! বুকভরা আদর্শে মনে মনে বলেছে সে—জীবন তার কঠোর, কর্তব্যে মহৎ হোক।

এর মধ্যে তার অফিসের বেয়ারা নসীরাম ছোট্ট একটু লেখা নিয়ে ধরলে তার সামনে। তার অত শপথের পরেও তবু আবছা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল সবটা। সেই বকুলতলা, সেই পার্কের একটা কোণ আর অপেক্ষমাণ একজনকে। লেখাটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে সবটা মনে পড়ে গেল কল্যাণীর। তার মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেল ধীরে ধীরে। নরেন লিখেছে একবার দেখা করতে—তার কি জরুরি কথা আছে; সেই বকুলতলায় সে অপেক্ষা করবে।

সেই কয়েক ছত্র লেখার দিকে তাকিয়ে মনে মনে সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, না—সে নতুন মানুষ। অতীত শেষ হয়ে গেছে। যাক। সামনে তার নতুন জীবন-পথ, নতুন এক পরিকল্পনা। নিজেকে সে নিঃশেষ করে দেবে তার মধ্যে।

রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখটা কঠিন হয়ে গেল আস্তে আস্তে। সে লিখলো সেই ছোট্ট রোকাটুকুর একপাশেঃ অসম্ভব। ক্ষমা করো। ভয়ানক ব্যস্ত।

কাগজটা ভাঁজ করে বেয়ারার হাতে দিতে গিয়ে দেখলো, বেয়ারা চলে গেছে। ফ্ল্যাট ফাইলের একটা কোণে সেটা গুঁজে রেখে নিজের কাজে মন দিল সে।

খট্ ··· খট্ ··· খট্ ···

যন্ত্রের মতোই কাজ করে গেল সে। বাইরে তার কর্তব্য-কঠোর মূর্তি—কিন্তু মনে চলেছে ঝড়ের আলোড়ন। টাইপ-রাইটার মেশিনটা ডিঙিয়ে পাশের জানালা দিয়ে কেমন করে যেন চোখ ছুটো এক পলকে দেখে নিল পশ্চিমের আকাশটা : সূর্য ঢলে পড়ছে দিগন্তে—আর বিকেলের ফিকে স্নিগ্ধ রং লাগছে সারাদিনের রোদ-পোড়া আকাশে। বড় সাহেব হুভারের মাথার ওপরে দেওয়াল-ঘড়িতে যে পাঁচটা বাজতে আর বেশী দেরী নেই—সেটা নিমেষের জন্যে কেমন করে কেড়ে নিল তার কর্তব্যে একাগ্র দৃষ্টি। হুভার ওঠবার আগে রোজ যেমন চশমা মোছে—তেমনি আজও মুছছে গভীর মনযোগ দিয়ে। সামনের মেশিনটার ওপরে ঝিকিয়ে উঠলো ছায়া-ছায়া বকুলতলা একটা। কার ছুটো পা এসে দাঁড়ালো সেখানে ··· তারপর চলে গেল—চলে যাচ্ছে ···

মেশিনটা চলেছে তখন ঝড়ের বেগে। ওর বুকটা কাঁপছে ঘন ঘন নিঃশ্বাসে—ওর শুকনো চোখে সেই রাতের ক্ষুধার্ত খ্যাপা দৃষ্টি।

"মিসেস চ্যাটার্জি!" হুভারের গলা তার পেছনেই।

কল্যাণী তাকালো চোখ তুলে।

"তোমার বোধ হয় ব্যক্তিগত কোনো কাগজ উড়ে পড়েছে।" মধ্যবয়সী গম্ভীর মানুষ হুভার—মুখে তবু রসিকতার চাপা একটা হাসি। নরেনের লেখা সেই ছোট রোকাটা হুভার এগিয়ে দিল কল্যাণীর দিকে।

কখন ওটা হাওয়ায় উড়ে পড়েছে ফাইলের কোণ থেকে কে জানে! কল্যাণীর মুখটা কঠিন হয়ে গেল আরও। হুভারের হাত থেকে রোকাটা নিয়ে আঙুলের ক্ষিপ্র চাপে সেটাকে ছুমড়ে চিপসে ফেলে দিল সে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে। বললে, "ও কিছু নয়।"—

হুভার বললে, "বার্ষিক রিপোর্টটা শেষ হয়ে যাবে তো আজ?"

"নিশ্চয়ই, এখুনি হয়ে যাবে।"

"গুড্। আর আমার ব্যক্তিগত রিপোর্টটা?"

"পারি। শেষ করে দেবো?"

হুভার কল্যাণীর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সহৃদয় কণ্ঠে বললে আস্তে আস্তে, "থাক ওটা আজ। তোমাকে খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছে।"

"আমি পারি।" সমস্ত ক্লান্তি থেকে যেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো কল্যাণী—চোখে তার সেই অসামান্য দ্যুতি। আজ তার কাজ চাই—ওই সর্বনাশা বিকেল পাঁচটার পরও অনেক কাজ, রাশি রাশি কাজের ঝড় চাই তার—নইলে হৃদয়ের দুরন্ত আরও বড় একটা ঝড়কে যেন সে চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।

"থাক—আজ অনেক টাইপ করেছ।" হুভার সস্মিত মুখে একটু হেসে তার কামরা থেকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো। বললে, "বার্ষিক রিপোর্টটা শুধু শেষ করে দিও।"

হুভার চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতাশ হয়ে চোখ বুজলো কল্যাণী।

বেয়ারা পেছন থেকে বলে উঠলো, "নরেনবাবুকে কি বলবো?"

কল্যাণী যেন চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালো। বললে, "অসম্ভব, ভয়ানক ব্যস্ত।" বলে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে মেশিনের ওপরে ঝুঁকে পড়লো সে আবার। যন্ত্রটা যেন কলরব করে উঠলো সব স্তব্ধতা ভেঙে।

অবাধ্য চোখ দুটো আবার গিয়ে পড়লো দেওয়াল-ঘড়িতে। পাঁচটা বাজতে বাকি নেই আর। ··· আবার চোখের সামনে ঝিকিয়ে উঠলো সেই বকুলতলাটা, ফুলগুলো ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে। সবটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই যেন মাথা ঝাঁকি দিল কল্যাণী। মেশিনটা চলেছে ঝড়ের বেগে—ফ্যাকাশে মুখে ঘন হয়ে আসছে রক্তের উচ্ছ্বাস, বেগ বাড়ছে যন্ত্রটার। বুকের স্পন্দন

ওর দ্রুত থেকে দ্রুততর। কপালে ঘামের বিন্দুগুলি ছোট থেকে বড় হচ্ছে ক্রমশ।

ঢং ঢং করে পাঁচটার শব্দ হলো দেওয়াল-ঘড়িতে। শব্দ তো নয় যেন হাতুড়ির তীব্র ঘা। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ খসে পড়লো শুধু ওর ঠোঁট থেকে। মেশিনটা থেমে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে মেশিনের ওপরেই মাথা ঠুকে পড়ে রইলো কল্যাণী। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখ দুটো বোজা। তবু অদৃশ্য কোন পথে যেন এখন চলেছে অফিস ভাঙা ক্লান্ত ভিড়—তার থেকে দুটি পা এগিয়ে গেল শুধু নির্জন সেই বকুলতলার দিকে ··· যেখানে ফুলগুলি কতো দিন ধরে ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে ··· আরও কতো দিনের পর দিন ঝরে যাবে,—কে জানে। কল্যাণী আর কোনোদিন অফিস ছুটির পর সেই স্নিগ্ধ বকুলতলাটাতে গিয়ে দাঁড়াবে না!—

কল্যাণীর দেখা নেই!

নরেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো অফিসের সামনে। কল্যাণী বেরুলে তাকে ধরবে।

অফিসের কেরানী মহল ঘিরে ধরলো তাকে। ছাঁটাই সম্পর্কে তাদের সহস্র প্রশ্ন।

"কি, পেলেন কিছু খবর?"

অবনী শুকনো মুখে জবাব দিল, "এখনো পাইনি।"

তারও ওপরে উৎসুক প্রশ্ন: "ক'জন ছাঁটাই হচ্ছে?"

"কিছুই জানি না।"

"খবরটা আজই পাবেন তো?"

"চেষ্টা করছি।"

"তা হলে—কালকে এসেই জানা যাবে নিশ্চয়ই?"

সেই একই আগ্রহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এতোগুলো মানুষ যেন পড়ে গেছে দুর্ভাগ্যের জুয়ায়। কার চাকরি যাবে জানা নেই—সকলের মুখে অনির্দিষ্ট আশঙ্কা। তাদের সহস্র উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ছেঁকে ধরলো অবনীকে।

ভিড় এড়িয়ে সে চলে এলো কার্জন পার্কের বকুলতলায়। অপেক্ষা করতে লাগলো অধীর আগ্রহে। কিন্তু মিনিটগুলো গড়িয়ে গেল—কল্যাণী এলো না।

তবু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ। বকুলগুলো ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে। সেগুলোকে জুতো দিয়ে পিষলো সে অন্যমনে, তারপর একটা ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল এসপ্লানেডের দিকে।

পুরানো দিন আর নেই—এ সে জানে। তার জেরও সে টানতে চায়নি। কিন্তু আজ কল্যাণীকে ওই ছোট্ট রোকাটুকু লেখা এবং তার না-সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটুকু তার মন ভরে দিলে অপরিমেয় গ্লানিতে।

কেবলি সে প্রশ্ন করতে লাগলো নিজেকে—ওই রোকাটুকু পেয়ে কি ভাবলো কল্যাণী তাকে।

কল্যাণীর সঙ্গে বোঝাপড়া একটা হয়ে যাওয়ার পর শেষ হয়ে গিয়েছিল সেই বকুলতলার কাহিনী। তারপর দুজনেই সরিয়ে নিয়েছে পরস্পরকে দূরে। তার মধ্যে নরেনের ব্যক্তিগত বেদনা থাকলেও, পুরাতনের জের টানার কাঙালপনা ছিল না এতটুকু। যেমন এড়িয়ে গেছে কল্যাণী—তেমনি নরেনও। কিন্তু ওই ছোট্ট রোকাটুকু লেখার মধ্য দিয়ে আজ যেন তার চরম ভিক্ষুকমূর্তি একটা বেরিয়ে পড়েছে। কল্যাণী যেন তাকে শুধু অস্বীকারই করেনি, আজ চূড়ান্ত অপমান করেও ফিরিয়ে দিলে।

মেসে ফিরে এলো সে মাথায় খ্যাপামি ভরে; এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো—কল্যাণীর কোথায় কতটুকু চিহ্ন আছে তার ঘরে। সুটকেস থেকে প্রথমেই টান মেরে বের করলো সে একটা ফটো। কুটি কুটি করে এক নিমিষে ছিঁড়ে ফেললো সেটাকে। তারপর হাতড়াতে লাগলো সুটকেস। বেরুলো খানকয়েক চিঠি—কল্যাণীর লেখা। সেগুলোকেও ছিঁড়লে কুটি কুটি করে। তারপর আর এমন কিছুই পেল না যে ওই রকম করে ছেঁড়ে। অস্থির ভাবে তখন

সে পায়চারী করতে লাগলো। ঘেমে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছতে গিয়ে ধক করে জ্বলে উঠলো তার চোখ ঃ রুমালটাও কল্যাণী তৈরি করে দিয়েছিল একদিন, কোণে লালসুতোয় লেখা 'ন'। মনে পড়লো সুটকেসে ওই রকম আরও কতকগুলো রুমাল আছে বটে। সুটকেস হাতড়ে বার করলো সেগুলো। মেঝেতে স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দিল। শবদাহের মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়াতে লাগলো সেগুলোকে—সে আগুনে বসে বসে ফেলতে লাগলো চিঠি আর ফটোর ছেঁড়া টুকরোগুলো।

"নরেনবাবু!"

বাইরে কে ডাকলো।

নরেন বললে, "আসুন।"

একটি আধবুড়ো মানুষ ঘরে ঢুকলো। অফিসের পুরানো কেরানী। মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ।

নরেন জিজ্ঞেস করলে, "কি খবর অক্ষয়বাবু?"

অক্ষয় সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, "ছাঁটাই লিস্টের নামগুলো জানতে পারলেন না কি?"

রুমাল, ফটো আর চিঠির আগুনটা জ্বলছে তখনো ধিকিধিকি। সেই আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়লো নরেনের—যার সব স্মৃতি আজ এই মাত্র সে পুড়িয়ে শেষ করছে সেই কল্যাণীর সঙ্গে তবু দেখা করতে হবে সেই কাল! শুধু এই লোকগুলোর জন্যেই!... সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, ইউনিয়ন সম্পাদকের সব কর্তব্যে সে এখুনি ইস্তাফা দিয়ে দেয়।

হৃদয় বললে, "দাও।"

কিন্তু কাজের মানুষের মন দৃঢ় কণ্ঠে বললে, অক্ষয়ের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে, "তবু কাল দেখা করতেই হবে আবার।"

আগুনের শিখাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে নরেন বললে, "কাল—কাল বলবো অক্ষয়বাবু। আজ পারিনি।"

"ছাপোষা মানুষ। খবরটা শুনে ঘরে টিকতে পারলুম না নরেনবাবু।" অক্ষয় বিচলিত গলায় বললে, "কে জানে, কার ভাগ্যে কি আছে!"—

১৭

পরের দিন অফিস ছুটির পর নরেন দাঁড়িয়ে রইলো একেবারে অফিসের সামনে—কল্যাণী বেরুলে তাকে ধরবে।

সেদিন আর কল্যাণী তাকে এড়াতে পারলো না। সামনাসামনি পড়ে নরেনের দিকে তাকিয়ে রইলো বিবর্ণমুখে।

নরেন বললে, "কতগুলো কথা ছিল তোমার সঙ্গে কল্যাণী। কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করলুম অনেকক্ষণ"—আগের মতো সহজ কথায় সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো নরেন—সহজভাবে একটু হাসলোও।

কিন্তু কল্যাণী কেঁপে উঠলো—কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো তার গলা। জীবনের সহজ প্রকাশের দিকটা তার আজ প্রচণ্ড আঘাতে বেঁকে গেছে। কল্যাণী বললে, "পুরানো কথা তোলার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই।"

"নিশ্চয়ই।" নরেন জোর দিয়েই বললে, "পুরানো কথা পুরানোই। তা তোলবার ইচ্ছে আমারও তিলমাত্র নেই। কিন্তু আমি যে সেই পুরানো কথাগুলোই তুলবো বলে তোমাকে ডেকেছিলাম—এ তোমায় বললে কে!"

তবে!

মনে মনে যতো বলিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাই করুক কল্যাণী—সেই মুহূর্তে সে তাকালো নরেনের দিকে অসহায়ভাবে। আড়ষ্ট আর দুর্বল।

নরেন সহজ ভাবে হাসলো আবার। বললে, "অবিশ্বাস করো না আমাকে, পুরানো কথার কৈফিয়ৎ আজ আমি একটাও চাইতে

আসিনি।' তুমি নিশ্চিন্ত হও—সহজ হও। এখন বুঝতে পারছি—দুনিয়ায় সহজ মানুষটি হওয়াই বোধ করি সব চেয়ে শক্ত।"

কল্যাণী নরেনের দিকে চেয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে। সেই পুরানো কথা ছাড়া আর কি কথা বলবে নরেন! কল্যাণী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নরেন বললে, "এ তো জানোই, আমাদের সকলের মাথার ওপরে ছাঁটাই ঝুলছে—সামনে দুর্দিন। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাই-বা রাখলে—কিন্তু এ সময় ইউনিয়ন মিটিংগুলোয় তোমার থাকা উচিত। তাও তুমি আসো না।"

আড়ষ্ট কল্যাণী। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে বললে, "আমার অন্য কাজ থাকে।"

"থাকলেও, ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত।"

কল্যাণী চুপ করে রইলো।

নরেন বললে, "ছাঁটাই লিস্ট তৈরী হয়ে গেছে—সে খবর আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু নামগুলো জানিনে। সে খবরটা তোমাকে বার করতে হবে।"

"তা তো আমি জানি নে।"

"সে কী!" নরেন সবিস্ময়ে বললে, "বড় সাহেবের ঘরে সব সময়ে থাক তুমি—তুমি তার একরকম পার্সোনাল স্টেনোর মতোই এখন কাজ করছো। কারণ মিস্ এলেনোর এখনও ছুটিতে। তুমি জানো না!"

"জানি না তো।"

নরেন কি একটু ভাবলো। মুখটা তার কুটিল সন্দেহে কঠিন এবং গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "না জানলেও জানতে পারো না কি?"

"অসম্ভব।" কল্যাণী মাথা নেড়ে সসংশয়ে বললে, "ওরা এখনও আমায় এতোটা বিশ্বাস করে না। সত্যি সত্যিই পার্সোনাল স্টেনো হতে হলে আমায় এখনো আরো অনেক বিশ্বাসভাজন হতে হবে।"

"ও"—বলে নরেন যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অবাক চোখে চেয়ে রইলো কল্যাণীর দিকে।

"আমি যাই।" কল্যাণী ত্রস্ত হয়ে বললে, "বড় সাহেব গাড়িতে উঠে বসেছে—সঙ্গে যেতে হবে আমাকে।"

নরেনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কল্যাণী হন্ হন্ করে চলে গেল।

নরেন কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানে অনেকক্ষণ। ঘরমুখো ভিড় চলে গেল সামনে দিয়ে, অফিসের বড় সাহেবের গাড়িটা চলে গেল হুস করে—পলকের জন্যে দেখা গেল কল্যাণীকে। সহকর্মীরা কয়েকজন নরেনকে দেখতে পেয়ে জানতে এলো ছাঁটাইয়ের ব্যাপারটা। কিন্তু নরেন অন্যমনস্কের মতো তাদের কি যে জবাব দিল, সে নিজেই জানে না।

কেবলি মনে হতে লাগলো তার: পরিবর্তন হয়ে গেছে—শুধু দিন নয়, মানুষও। ব্যক্তিগত সম্পর্ক দূরের কথা—কাজের জগতেও কল্যাণী আজ দূরের মানুষ।

কল্যাণী আগের মতোই এড়িয়ে চললো নরেনের ত্রিসীমানা। এক অফিসে চাকরি করেও তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগটাও হলো না কোনোদিন নরেনের। অফিস শুরু হওয়ার আগেই কখন এসে ঢুকে বসে থাকে সে বড় সাহেবের খাসকামরায়—টিফিনেও বেরোয় না। অফিস ছুটির পর কোনোদিন চলে যায় সে বড় সাহেবের সঙ্গে তার গাড়িতে। আর ইউনিয়ন মিটিং-এর ধারেপাশেও সে ঘেঁষলো না।

এই এড়িয়ে যাওয়া—নরেন ভেবে পেল না, কোথায় কতো দূরে যাবে কল্যাণী। মনে মনে বললে, চুলোয় যাক সে। তার কোনো ব্যক্তিগত চিন্তাই আর সে মনে প্রশ্রয় দেবে না।

এ অফিসে ছাঁটাইটা আর গুজব নয়। যুদ্ধের পরবর্তী মন্দা-বাজার, তাতে কালোবাজারের ফাঁপাই মহালোভ মিটছে না আর

তেমন। লাভের কড়ি ঠিক রেখে ছাঁটাই চলেছে মন্দা মুনাফার দোহাই দিয়ে। ফাট্‌কা বাজারে ভিড় কম—তালা বন্ধ হচ্ছে ছুটকো-ছাটকা ব্যাঙ্কের দরোজায়। একদিকে সর্বস্বান্ত মানুষের আর্তনাদ—অন্যদিকে ছাঁটাই কর্মীদের মিছিলের পর মিছিল আর গর্জন। সবটা মিলে মহানগরীর দিনগুলো তখন যেমন কঠিন ও দুর্মূল্য, তেমনি অশান্ত।

সেই কালো ছায়া এসে পড়েছে অসবার্ট কোম্পানীতেও। ছাঁটাইয়ের আগে থেকেই পড়ে গেছে পোস্টার। তার লাল কালো মোটা মোটা অক্ষরে সামনে তুলে ধরেছে এ অফিসের লম্বা লম্বা আয়ের অঙ্ক, বাঘা-বাঘা কনট্রাক্ট ও তার মোটা মুনাফার হার—একেবারে হাত নাগাদ তারিখ পর্যন্ত। ছাঁটাইয়ের আগেই পড়ে গেছে বোনাসের দাবি। ভরে গেছে অফিস-প্রাঙ্গণের দেওয়াল। ওদিকে টেবিলে টেবিলে গরম গুমোট—কাজের মাঝে মাঝে ফিস-ফিসিয়ে উঠছে ভীরুর দুশ্চিন্তা আর গরম রক্তের টগবগানি—দাঁতে চিবানো আস্ফালন। প্রতিদিন বসছে অফিস ইউনিয়নের মিটিং।

এর ওপর একদিন জারি হয়ে গেল ছাঁটাইয়ের লিস্ট। তালিকা নাকি অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ আরও ছাঁটাই হবে।

টিফিনে ঘিরে এলো কেরানীর দল—ছোট বড়, ছোকরা বুড়ো।

"স্ট্রাইক!—এখুনি। কলম বন্ধ।"

প্রথম উত্তেজনার বিস্ফোরণ।

নরেন শান্ত গলায় বললে, "সবার তাই মত হলে স্ট্রাইক হবে বৈকি।"

একটি ছোকরা মতো ক্লার্ক, নাম সমর, জামার আস্তিন গুটিয়ে বললে, "আপনি কি মনে করেন, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবাই একমত হবে না?"

"আমি কিছুই মনে করিনে সমর।" নরেন একটু হেসে তাকে বললে, "ইউনিয়ন মিটিং-এ সবটা আলোচনা করে সবাইয়ের মতামত জেনে তারপর বোঝা যাবে। তা ছাড়াও মনে রাখতে হবে—এ

অফিসের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষে। তাদের খবরাখবরও নিতে হবে।"

সমর অসহিষ্ণু গলায় বললে, "ততোদিনে আমরা তা হলে মরে ভূত হয়ে যাবো।"

"আস্তে—আস্তে সমর।" নরেন বললে, "এ অফিসেরই সকলের মতামত কী, তা তুমি জানো?"

সমর কথাগুলো একটু বেঁকিয়ে বললে, "তা বটে। আপনারই পরম আত্মীয় বন্ধু-স্থানীয়রা হয়তো ধর্মঘট না করতেও পারেন।"

নরেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো, "মানে!"

ছোকরা বলে চললো, "ছাঁটাইয়ের লিস্টটা তৈরী হলো যে ঘরে পরামর্শ করে—তার কিছুই তিনি আগে জানতে পারলেন না। অথচ অফিসের আট ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা বসে আছেন তিনি সেই ঘরে।"

ইঙ্গিতটা যে কল্যাণীকে লক্ষ্য করে—এবং সে ইঙ্গিতটা যে কতোটা কুৎসিত আকার নিতে পারে, নরেন সেটা এই প্রথম বুঝতে পারলে।

কল্যাণীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার কথা এ অফিসে একেবারে নতুন কেরানীটিরও অজানা নেই। কিন্তু সে সম্পর্কে কি অঘটন যে ঘটেছে তার কিছুই জানে না তারা—আর সেটা সকলকে জানাবারও নয়। তাই এই প্রসঙ্গের আঘাতটুকু নীরবে গ্রহণ করে নরেন চুপ করে রইলো।

অক্ষয়বাবু বললে, "আবার কে কে ছাঁটাই হবে কে জানে! সব নাম তো জানাই গেল না।"

নরেন বললে, "ওটা মনে হচ্ছে কোম্পানীর হাতের পাঁচ। ধর্মঘট শুরু হলে তখন লোক বেছে বেছে কোপ পড়বে।"

সমর বলে উঠলো আবার বাঁকা খোঁচা একটা দিয়ে, "অতএব হুঁশিয়ার—ধর্মঘটে কে যাবে যাও!—মরবে।"

"না, আমি তা বলিনি।" নরেন দৃঢ় গলায় বললে, "তুমি বড্ড বাজে কথা বলছো। মিটিং-এর আগে কোনো আজেবাজে কথা বলো না।"

"কী, ধমকে আপনি আমার মুখ বন্ধ করবেন!" ছোকরা লাফাতে লাগলো ততোধিক জোরে. "জানেন আপনি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার"...

অক্ষয়বাবুর মতো কয়েকজন আধবুড়ো কেরানী তাকে শান্ত করবার জন্যে ধরে টিফিনঘরের বাইরে নিয়ে গেল ঠেলতে ঠেলতে।

প্রসঙ্গটা চাপা পড়লো ওইখানে বটে, তবু তার মধ্যে যে আঘাতটা ছিল, সেটা ষোল আনা সর্বাঙ্গে মেখে ক্ষুব্ধ নরেন বেয়ারা মারফত একটা রোকা লিখে পাঠালো কল্যাণীকে আবার—যাতে সে অতি অবশ্য অফিসের পরে দেখা করে।

অফিসের শেষে ক্ষুব্ধ মন নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। মিনিটগুলো গড়িয়ে গেল একটি একটি করে। আধঘণ্টা পরে চোখ তুলে দেখলো—কল্যাণী বড় সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে সিধে মোটরে গিয়ে উঠলো। যেন ভুলেও চোখ পড়লো না নরেনের দিকে। সারাদিনের ক্লান্তি, ছাঁটাই আর ধর্মঘটের দুশ্চিন্তা, তার ওপরে আরও একগাদা অপমান নিয়ে সেদিন সে মেসে ফিরে এলো। আর ছটফট করতে লাগলো মনে মনে। আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণীর মুখটা তার যতোবার মনে পড়লো, ততোই মনে তার উত্তেজনার আগুন জ্বেলে দিলে সুদীর্ঘ বছরগুলোর নানা অন্তরঙ্গ কাহিনী।

অতীত স্মৃতির মধ্যে একটা বিষণ্ণ আনন্দ আছে—কিন্তু তার কাছে তা এ কোন অভিসম্পাত আর জ্বালা বহন করে আনলো! ক্ষোভে ক্রোধে অপমানে সে অস্থির হয়ে উঠলো। কেবলি তার মনে হতে লাগলো—সে প্রবঞ্চিত। অনেক সুন্দর করে, অনেক বড় করে যাকে মনে মনে একদিন গ্রহণ করেছিল—সে একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি নিকৃষ্ট স্ত্রীলোক মাত্র। শিক্ষা, বিদ্যা ও কালপ্রবণতা তার মধ্যে একটুকুও পরিবর্তন আনেনি কোথাও। সে সেই চিরকালের ছলনাময়ী নারী। তার কাছে শুধু সে প্রবঞ্চিতই নয়—লাঞ্ছিত এবং অপমানিত।

নরেনের সঙ্গে প্রবঞ্চনার যতোটাই থাক—পরিবারের জন্যে নতুন একটি জীবন-রচনার পরিকল্পনায় কল্যাণীর কিন্তু এতটুকুও প্রবঞ্চনা ছিল না। তার সমস্ত আশা ও কামনাকে জোর করে বেঁধে ফেলেছে সে তার নতুন পরিকল্পনার মধ্যে। অফিস আর বাড়ি—এর মধ্যে রুটিন-বাঁধা করে ফেললে জীবনকে।

কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুল ছেড়ে মিনু বিলু ভালো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েছে—তাদের এতোদিনের দীন মলিন বেশবাসের পরিবর্তে হয়েছে নতুন নতুন পোশাক। কল্যাণীর নতুন পরিকল্পনার অভিব্যক্তি তারা—নতুন পরিবর্তনে কলমুখর। শান্তাই শুধু মুখ গোমড়া করে কল্যাণীর নতুন জীবন-রচনার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলে।

মহামায়াকে শান্তা বললে, "আমি আর পড়বো না মা।"

মহামায়া বললেন, "কেন? পড়াতে চাচ্ছে তোর দিদি—পড় না কেন?"

শান্তা বললে, "ও আমার আর ভালো লাগে না।"

মহামায়া দেখেন মেয়ের ভাবী জীবনের সুখ। বললেন, "দু একটা পাশ করলে ভালো বিয়ে-থা হবে—আর কি। যখনকার যেমন চল বাছা।"—

শান্তা বললে, "তুমি যেমন দেখে দেবে মা—সেই আমার ভালো, সেই আমার ভাগ্য। ওই বিদ্যে দিয়ে মন না ভোলালেও আমার চলবে।"

মহামায়া ভারি খুশি হলেন এবং এ মেয়েটি যে তাঁরই শিক্ষায় মানুষ হয়েছে—এতে তাঁর বুক ভরে উঠলো। সুধার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "শোনো মেয়ের কথা। তা বলেছে ও খাঁটি কথাই। আমাদের বাপ-মা যে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন—তাতে কি আমরা জলে পড়েছিলুম?"

ছেলে-মেয়ের পরস্পরের পছন্দ করে বিয়ে—এবং সে সম্বন্ধে মহামায়ার মন্তব্য—তাতে সুধাকে খোঁচা দেওয়ার ইচ্ছে হয় তো মহামায়ার ছিল না—তবু যেন অদৃশ্য একটা খোঁচা খেয়ে সুধার মুখটা মুহূর্তের জন্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চুপ করে রইলো।

মহামায়া আবার বললেন, "বাপ মা যেমন দিয়েছেন, তাই মেনে নিয়েছি—সেই ছিল আমাদের সুখ আর শান্তি।"

সুধা প্রায় ভয়ে ভয়ে বললে, "তবু পড়ার এতো বড় একটা সুযোগ—পরে জীবনে কতো কাজে লেগে যেতে পারে। তা ছাড়া কতো জিনিস জানার আছে"—

কথাগুলো যেন শান্তার এতোদিন ভেবেচিন্তে ঠিক করাই ছিল—ছিটকে বেরিয়ে এলো, "বিদ্যের কীর্তি তো ঘরেই দেখছি বউদি—ও আমার দরকার নেই।"

কথাগুলো হয়তো এমনিই বললে শান্তা, কিন্তু তার বলার ভঙ্গীতে সবটা হঠাৎ যেন বিশ্রীভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহামায়া গম্ভীর হয়ে গেলেন—সুধার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুলো না।

শান্তা বললে, "তুমি দিদিকে বলে দিও মা—আমি আর পড়বো না, বাস্।"

দুপুরের এ আলোচনার সময় কল্যাণী সেখানে ছিল না। পরে সে মহামায়ার মারফত শান্তার ইচ্ছের কথাটা শুনে হঠাৎ যেন ভয়ানক দমে গেল। মারখাওয়া মুখে তাকালো সে মহামায়ার দিকে। আস্তে আস্তে বললে, "ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না মা। এতো খেটেখুটে মরছি কেন, কেন ওদের লেখাপড়া শেখাতে চাই—বুঝলো না সে। আচ্ছা, ওকে ডাকো—ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি।"

সুধা বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলে। শিক্ষা সম্পর্কে শান্তার সেই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের কথাটা মনে পড়ে গেল তার।—ভয় হলো, হয়তো মুখ-ফোঁড় শান্তা বলে ফেলবে আরও এমন কিছু—যাতে অফিস ফেরত সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত কল্যাণী আঘাত পাবে আরও বেশী। সুধা

বললে, "পড়ার তার ইচ্ছে নেই—তার পেছনে তোমার টাকাগুলো নষ্ট করে লাভ কি ভাই কল্যাণী দি।"

কল্যাণী হতাশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শুধু বললে, "বুঝলো না সে আমাকে!"

সবটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে সুধা বললে, "বুঝবে না কেন তোমাকে। কিন্তু সবাই কি সব কিছু পারে?"

"অন্তত কালের সঙ্গে পা ফেলে চলবে তো? সে কি শুধু শাড়ী সেমিজেই এ কালের মতোটি হয়ে সেজেগুজে বসে থাকবে—আর কিছু নয়!" কল্যাণী বললে, "বাবা বলতেন"—

এতক্ষণ মহামায়া চুপ করে নিজের হাতের কাজ করে যাচ্ছিলেন রান্নাঘরের—আর শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শিবশংকরের কথা উঠতে মনে পড়ে গেল তাঁর বোধ করি পুরাতন জ্বালার কথা। কল্যাণীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "ঘর-গেরস্তালির শিক্ষাই সে শিখুক না বাছা। আছে তো এখনও মিলু বিলু—তাদের দিকে বরং ভালো করে চোখ দে।"

কল্যাণী থেমে গেল। তারপর সুধার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "দাদা কি কিছু তোমায় বলেছে বউদি? মানে, আমি যে ল' পড়ার কথা বলেছিলুম"—

সুধার সেখানেও একটা সন্দেহ ছিল। তাই ভয়ে ভয়ে বললে, "তাকে জিজ্ঞেস করবো ভাই।"

"ক'রো। আমি যে সকলের জন্যে কতো ভেবে মরি!"—

কিন্তু অবনীও যে কি বলবে, তা যেন মনে মনে জানা হয়ে গেছে সুধার। এ মেয়েটা আরও একটা আঘাত খাবে—এই কথাটাই তার মনে হয় বারে বারে। কিন্তু কেমন করে যে তাকে আড়াল করবে সে ভেবে পায় না। তবু সবটাকে সে হালকা হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "তোমার পড়াবার উৎসাহ দেখে আমারই পড়তে ইচ্ছে করছে কল্যাণীদি'। কিন্তু মুখ্যু মানুষকে তুমি একবারও বললে না।"

কল্যাণী উৎসাহভরে বললে, "সত্যি!—পড়বে তুমি বউদি? বুঝবে—আমি বলছি বুঝবে একদিন।"—

"সে আমার চেয়ে কে বেশী বোঝে ভাই।" সুধা হেসে বললে, "তাই তো বলছিলুম শান্তাকে—নিজের কথা ভেবেই।"

কথার মোড় ঘুরছে—ঘুরছে শেষ পর্যন্ত কি-না নতুন বউ সুধার পড়া নিয়ে। কেমন যেন বিপদ গণলেন মহামায়া। বললেন, "বউ-মানুষের লেখাপড়া শিখেই বা কি, আর না শিখেই বা কি। আজ খালি গা, কাল ছেলেপুলে, তারপর রান্নাঘরের বোঝা, এর-ওর সেবার কথা সে না হয় আজকালকের দিনে বাদই দিলুম।"

চোখে চোখে তাকালো কল্যাণী আর সুধা, সেখানে নিঃশব্দে কি একটা যেন কথা হয়ে গেল। মহামায়া ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না—বক্ বক্ করতে লাগলেন সেকালের বউ-মানুষের চূড়ান্ত এক আদর্শ জীবন নিয়ে।

কল্যাণী বললে আস্তে আস্তে, "দাদাকে তা হলে জিজ্ঞেস করো বউদি। আমি ভর্তি হওয়ার টাকা দিয়ে দেবো তোমার হাতে।"

দ্বিতীয় আঘাত অবনীর। সুধা যা আগেই আন্দাজ করেছিল। তার আইন পড়ার প্রসঙ্গ তোলা মাত্রই অবনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, "সে কি আমায় বিলু মিলুর সামিল করে দিলে নাকি!"

সুধা ভয়ে ভয়ে বললে, "তা করবে কেন।" কিন্তু তারপর আর কি যে বলবে সে ভেবে পেল না। অবনীর অসহিষ্ণু ভাব দেখে থম্‌কে গেল।

অবনীকে যেটা বিঁধছে—সেটা তার উপার্জনের অক্ষমতা। তার ওপরে আবার কল্যাণীর বদান্যতা—সেটা আরও বিঁধছে তাকে, বিশেষ করে নতুন বউ সুধার সামনে। তাই সেদিন সে কল্যাণীর বদান্যতার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে উঠে এসেছিল ঝট্ করে। পরিবারে তার সামান্য দালালীর রোজগার যেমন অল্প তেমনি অনিশ্চিত এবং এ সম্পর্কে সে মনে মনে যেমন সঙ্কুচিত তেমনি সজাগ। সেখানে কল্যাণীর বেশী রোজগার, তার ওপরে সাম্প্রতিক পদবৃদ্ধি—বেতন বৃদ্ধি এবং শেষ—রীতিমতো ফলাও একটা প্রস্তাবে শান্তা মিলু

বিলুর পড়ার সঙ্গে তারও আইন পড়ার কথা গোটা সংসারটার সামনে তাকে যেন অকিঞ্চিৎকর করে দিয়েছে। নতুন বউ সুধার সামনে তো বটেই। আর বউয়ের সামনে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়ার মতো জড় সে নয়। ফলে সেদিনকার ঘটনার পর থেকে মনে মনে সে ব্যক্তিত্ব ও উপার্জনগত অক্ষমতার নিদারুণ দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে ছিল। আজ সুধা যখন আবার সেই প্রস্তাবটা তুললে তখন সে আর নিজেকে কোনো রকমে সংযত রাখতে পারলে না। তার সহজ আবেগ-প্রবণতা স্বরূপ প্রকাশ করলে।

অবনী সুধার সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, "দুঃখকষ্ট সহ্য করতে তুমি রাজি আছ—এই কথা বলেছিলে একদিন, মনে আছে ?"

সুধা সভয়ে বললে, "ও কথা বলছো কেন ?"

"একটা কথা কিছুদিন থেকে ভাবছি সুধা।" তারপর কথাটা না বলেই অবনী অশান্ত ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো।

সুধার চোখে ভয়। সে পাণ্ডুর মুখে বললে, "কি ভাবছো !"

অবনী অশান্ত ভাবে বললে, "আমার এখানে আর ভালো লাগছে না সুধা।"

"আমারও না।" সুধা বলে উঠলো সহসা।

এখানে সত্যি সুধারও ভালো লাগছে না। অবনীর উপার্জন অল্প বলেই কল্যাণীর বদান্যতা যে তার গায়ে লাগে না তা নয়। আরও বেশী করে লাগে তার নিজের অসহায়তা। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, সে যেন কল্যাণীর ঘাড়ের ওপরে চেপে বসে আছে। শুধু তাই নয়—এ সংসারে বউ হয়ে ঢোকার পর নানা বিরোধ, নানা সংঘাত তার নিজের জীবনের মাধুর্যটাকেও যেন তিলে তিলে শুষে নিচ্ছে।

সুধা আস্তে আস্তে বললে, "এ সংসারে সবটা যেন কেমন ভাঙা ভাঙা—ছাড়া ছাড়া। এখানে কারুর সঙ্গে যেন কারুর মিল নেই। আমি কূল পাই না তার মধ্যে !"

"এই দেখছি আমি ছোটবেলা থেকে—এ যেন এ বাড়িটার অভিশাপ।" অবনী বললে, "তার চেয়ে চলো পালাই—যেখানে

হোক দুঃখে কষ্টে নতুন করে বাঁচি। এখানে যেন প্রতিদিনের যন্ত্রণা আমার, প্রতিদিনের অপমান।”—

তার এ যন্ত্রণাকে সুধা মর্মে মর্মে অনুভব করে। চুপ করে সে অবনীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো।

অবনী বললে, “যতোদূর জেনেছি আর শুনেছি, যতোটুকু দেখেছি আমি—কখনো সুখ দেখিনি এ বাড়িতে। মেলেনি কারুর সঙ্গে কারুর।”

কিন্তু কেন এ গরমিল, অথবা এই গরমিলটাই সংসারে অবধারিত, সে কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই অবনীর কথায়। তবু তার কথা থেকে সুধা স্পষ্ট করে যেটুকু বোঝে—সেটা হলো অবনীর সহজ একটা আবেগ—সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে। যেটাকে সুধা তার মাত্র বিশ একুশ বছরের অনভিজ্ঞ নির্বোধ স্বপ্নাতুর জীবনে অনেক বড় স্থান দেয়। মামার আশ্রয়ে দুঃখটাকে যেন সে চরম করে দেখেছে—তাই একটু সুখ, একটু শান্তির জন্যে তার কাঙালপনার অন্ত নেই।

অবনী বললে, “কিছুদিন তুমি যদি তোমার মেসোর কাছে গিয়ে থাক—তা হলে ইতিমধ্যে আমি একটু গোছাবার চেষ্টা করি।”

সুধা ম্লান মুখে বললে, “বেশ—তাই করো। কিন্তু তোমার বোন, মা—এঁরা ভাববেন কি?”

“ওরা সচ্ছল—আমি গরীব, ওরা ভাগ্যবান—আমি হতভাগ্য।” অবনীর সেই মোটা সোজা কথার আবেগ।

সে আবেগের সামনে সুধা বসে রইলো বোবার মতো।

অবনী ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললে, “দুঃখ কষ্ট থাক—মানিনে তাকে বড় বলে। তবু তার মধ্যে চাও না তুমি একটু সুখ—বলো!”

“চাই।”

“একটু শান্তি?”

“চাই বৈকি।”

"মনে আছে—বিয়ের আগে তুমি বলেছিলে একদিন, টাকাটাই কি সব!"

"মনে আছে। সে আমি চিরদিনই বলবো।"

"বলো—সমস্ত ঝড়ঝাপটার মুখেও তুমি চিরদিন ব'লো ওই কথাটা।" অবনী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "ওই আমার মূলধন সুধা—ওই আমার বুকের সাহস। এই অভিশপ্ত বাড়িটা ছেড়ে যেতে পারলে হয়তো আমরা সেই টাকার চেয়ে অনেক বড় জিনিসটাকে খুঁজে পাবো দু'জনের মধ্যে। এখানে সবটা যেন বিষিয়ে উঠেছে।"

সেই টাকার চেয়ে বড় জিনিসটাকে পাওয়া যাবে কি না—জানে না সুধা, তবু এই মুহূর্তে অবনী যেন ভাসিয়ে নিল সুধাকে তার দুরন্ত আবেগের তরঙ্গে।

অন্ধকারে সুধা চোখ মেলে চেয়ে রইলো। চোখে তার ঘুম এলো না। কেবলি তার মনে হতে লাগলো—কেন থাকবে না একটু সুখ, একটু শান্তি, কেন তার জীবন-স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে একেবারে?

এ তার আত্মসুখান্বেষী স্বার্থপরতা মাত্র নয়। সহস্র দুঃখের মধ্যেও অনেক স্বপ্ন দেখেছে সে—স্বপ্নের একটা গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছে সে আর এক কানা গলির অন্ধকার ঘরে বসে বসে একটা পুরুষকে অবলম্বন করে। বহুদিন পরে, বহু দুঃখের পরে সেই পুরুষটি সত্য হয়ে এসেছে তার জীবনে—তাই তার জগৎ আজ আনন্দে কলরব করে উঠতে চায়। কিন্তু এখানে অবকাশ নেই তার সে আনন্দের, কলরব নেই জীবনের, স্বপ্ন নেই—সাধ নেই যেন মনের। এ কোন অবরুদ্ধ এক পরিবেশে সব কিছু যেন শুকিয়ে এলো তার। এ পরিবেশ ছেড়ে মন তার সর্বক্ষণ পালাই পালাই করে—নিজেকে তার কেবলি এখানে অপরাধী বলে মনে হয়।

১৯

কল্যাণী প্রথমটায় মুষড়ে পড়লো। শান্তা আর অবনী তার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো না।

ওর স্তব্ধ বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সুধার মনে পড়লো—ওর আগ্রহ ও আবেগ ভরা একদিনের উদ্দীপ্ত সেই মুখটা। সুধা বললে, "তোমার মনের মতো করে মানুষ করো মিলু বিলুকে কল্যাণীদি'—সামান্য এই ব্যাপারে তুমি দমে যেও না।"

ব্যাপারটার সামান্যতা যতোই থাক—কল্যাণীর কাছে আঘাতটা অনেকখানি। সুধার সান্ত্বনায় কল্যাণী বিবর্ণ মুখে শুধু একটু হাসলো। বললে, "আমার আশা আর আগ্রহ কেউ বুঝলো না বউদি। খেটে মরছি এতো কিসের জন্যে! তোমাদের সকলের সুখের জন্যেই ভাবি আমি—তাতেই আমার আনন্দ।"

কল্যাণীর আঘাত-খাওয়া মুখের দিকে চেয়ে সুধা আর কিছু বলতে পারলো না।

কল্যাণী আবার বললে, "দাদা বদলে গেছে।—সে কিন্তু আগে এরকম ছিল না।"

সুধা সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কল্যাণীর আফসোস বিঁধতে থাকে তাকে—মনে হয় যেন সে-ই এসে একটা মানুষকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছে একেবারে। সুধা বললে, "আমি কিন্তু তাকে অনেক করে বলেছিলুম কল্যাণীদি'।"

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "কেউ না বোঝে—না বুঝুক। দমে আমি যাবো না নিশ্চয়ই।" বলে সে মুহূর্তের জন্যে যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মনকে সান্ত্বনা দিলে—যাক, এখনও আছে মিলু বিলুর জীবন—সুদূর এক উজ্জ্বল ভাবীকালে তাদের জীবন অপেক্ষা করে আছে। শিল্পী যেমন করে তার আঁকা ছবির দিকে আনন্দে ও আত্মপ্রসাদে তাকিয়ে থাকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে—তেমনি করে

অন্যমনে তাকিয়ে ছিল কল্যাণী, তারই চিত্রিত উজ্জ্বল এক ভাবীকালের দিকে। সেই অদৃশ্য ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন সে আত্মগত ভাবে বললে আবার:

"না, দমে আমি যাবো না।"

এর পরে কল্যাণী নিয়ে পড়লো মিলু আর বিলুকে।

অকিঞ্চিৎকর সংসার পরিবেশ, সুড়ঙ্গের মতো এই অন্ধকার গলি—প্রতি দিনের রুটিনে-বাঁধা স্কুল আর ঘরের ঘেরাটোপে মিলু বিলুকে অন্ধ করে না রেখে বেরিয়ে পড়লো কল্যাণী তাদের নিয়ে চিড়িয়াখানায়—জাদুঘরে। এ যেন তার বিশ্বভ্রমণের মতো—দেশ-দেশান্তর আর হাজার হাজার বছরের সভ্যতার লুপ্তাবশেষের সঙ্গে ওদের পরিচিত করিয়ে দিতে সে নিজেও যেন আত্মহারা হয়ে গেল। মিলু বিলুকে টেনে আনলে নিজের ঘরে। মন দিলে তাদের লেখাপড়ার দিকে, ভাবতে লাগলো কোনো মিশনারী মাস্টারের কাছে ইংরেজি শেখাবার কথা। আর তার অবসর সময়ে ওদের মন ভরে দিল সে নিজের আশা আশ্বাসে ভরা হাজারো গল্পকথায়।

একদিন জিজ্ঞেস করলে বিলুকে, "আচ্ছা বিলু—বড় হয়ে কি হবি তুই বল দেখি।"

"বাবার মতো মাস্টার হবো।"

বিলুর জবাবে কল্যাণী ক্ষুণ্ণ হলো আজ। সামান্য স্কুল মাস্টারের নগণ্য জীবন থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ে আজ তার কল্পনার সুর বাঁধা। কল্যাণী বললে, "না, তা হবি কেন। স্কুল-মাস্টারের জীবন বড় দুঃখের।" বাবার মুখটা মুহূর্তে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সেই লাঞ্ছনার—দারিদ্র্যের জীবনকে সে আজ স্বীকার করে না।

বিলু দিদির স্তব্ধ ধ্যানস্থ মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "তবে?"

কল্যাণী বললে আস্তে আস্তে, "বিলেত যাবি—বিদেশ থেকে আনবি মস্ত ডিগ্রী, তুই হবি খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার কি ডাক্তার।"

মিলু বললে, "আর আমি?"

কল্যাণী তেমনি ধ্যানমগ্ন চোখে যেন সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "তুইও যাবি বিলেত। অনেকে হয়তো বাধা দেবে—তবু আমি পাঠাবো তোদের।"

"তারপর কি করবো দিদি?"

"একটা বই লিখবি—লিখবি এ দেশের মেয়েদের ভাগ্যের কথা। কতো কষ্ট—কতো বাধার ভেতর দিয়ে তারা মানুষ হয়, কতো দুঃখে তাদের জীবন কাটে।" কল্যাণী বললে, "মনে করিস তখন তোর দিদির কথা—কেমন করে জীবন কাটিয়ে গেছে সে। কতো কষ্টের মধ্যে দিয়ে।"

বিলু বললে, "বাঃ, আমি ডাক্তার হলে তোর আর কষ্ট কেন থাকবে দিদি?"

"থাকবে না?" ফ্যাকাশে মুখে হাসলো কল্যাণী। বললে, "আচ্ছা থাকবে না। তোরা মানুষ হলে কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না আর। কেন থাকবে?"

ঝলোমল করে কল্যাণীর চোখের সামনে আবার—কবেকার সেই হারানো জীবন! গঙ্গার ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা বাড়ি, জীবনের প্রচুর অবকাশ আর আনন্দ—আর কার যেন ছিল সেই সাহিত্য সঙ্গীতের চর্চার সাধ! ···

সেদিন আর এদিন! অনাগত আরও কোনো একদিন। ··· প্রদীপ্ত সূর্যকরোজ্জ্বল।—

মনে মনে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে কল্যাণী—না, হার সে মানবে না। সমস্ত জীবন দিয়ে তার কল্পনাকে সে রূপ দেবেই।

২০

পরের দিন অফিসে ঢুকেই ছোটখাট একটা ভিড়ের সামনে থমকে দাঁড়ালো কল্যাণী।

ভিড়ের ভেতর থেকে সামনে ঠেলে বেরিয়ে এলো ছোকরা কেরানী সমর। সার্টের আস্তিন গুটানো—এক হাতে কাগজ, অন্য

হাতে কলম। কল্যাণীর সামনে কাগজটা মেলে ধরে বললে, "সই করুন।"

"কি ব্যাপার!" কল্যাণী তাকালো স্তব্ধ চোখে।

সমর বললে, "ধর্মঘটের সই সংগ্রহ। জবরদস্ত ছাঁটাইয়ের জবাব দেবো আমরা।"

কল্যাণী যেন এক মুহূর্তে বোবা হয়ে গেল। সহসা তার মনে হলো—সে যেন সূর্যদীপ্ত এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে এসে পড়েছে একেবারে তলচিহ্নহীন এক অন্ধকার খাদের সামনে। এক লহমায় মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল—এ অফিসের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধির পার্সোনাল স্টেনো হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার—এখনই গোপনীয় অনেক কিছু জানতে হয় তাকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মতো। নতুন তার এ সম্ভাব্য উন্নতি—নতুন তার জীবন-পরিকল্পনার মতোই। অনেক আশা ও অনেক সাধ তার সঙ্গে জড়ানো।

সমর বললে, "ইউনিয়নে ঠিক হয়েছে কাল—সই করবেন না?"

এক মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল কল্যাণীর মুখ।

সমর একটু বাঁকা হেসে বললে, "নরেনবাবুরও মত।"

কল্যাণী কোনো রকমে দম বন্ধ করে বললে, "আমি কাল করবো—কাল, মানে—" কল্যাণীর কথাগুলো অস্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে গেল।

"ঠিক আছে—করলেই হলো।" বলে সমর আবার একটু মুখ টিপে বাঁকা হাসি হেসে চলে গেল সামনে থেকে।

সে হাসিটা কল্যাণীকে বিঁধলো ছুরির ফলার মতো। বড় সাহেবের কামরায় ঢুকে নিজের চেয়ারে এসে বসে রইলো সে কিছুক্ষণ পাথরের মতো। মন বললে তার, এ কী হলো!

একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন সে অফিসের কাজে ভালো করে মন দিতে পারলো না।

ধর্মঘট!...

এর সামনে তার নতুন পদোন্নতির সম্ভাবনা টিকবে কি! যদি না জেতে, যদি ছাঁটাই হয়ে যায়! কোথায় থাকবে তার ভাবীকালের

পরিকল্পনা! নিজে সে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারলো না। সেদিন ঘরে ফিরে ভয়ে ভয়ে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে মতামত চাইলো মহামায়ার কাছে।

চিরকালের ঘরের চিন্তা মহামায়ার। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত খুবই সোজা। মহামায়া বললেন, "সেদিন বললি অতো সব কথা—আজ আবার এই!"

"কি করি—বলো মা!" কল্যাণী তাকালো ম্লান মুখে।

"করবি আবার কি!" মহামায়া বললেন, "এই এতো বড় সংসার—নিজে টানছিস, নিজেই বুঝতে পারিস। অতগুলো লোকের মুখে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে?"

"কিন্তু ইউনিয়নের মত" ...

"চুলোয় যাক তোর ইউনিয়ন।" মহামায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "জানিনে আমি কিছু। আমাকে কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দে—তারপর মর তোরা সব ক'টা। তা নরেন কি বলে?"

"ইউনিয়নের সেক্রেটারী সে, তার মত তো ধর্মঘটেই বোঝা যাচ্ছে মা।"

"হুঁ।" মহামায়া ভুরু কুঁচকে যেন এক লহমায় বুঝে নিলেন সব ব্যাপারটা। বললেন, "আমি জানি, ও কি কম ধড়িবাজ। ও তোকে এই দিক দিয়ে বিপদে ফেলতে চায়। তুই মরবি—তোর সর্বনাশ করে ও ছাড়বে হতভাগী! আমি তখুনি বলেছিলুম—"

মায়ের গালাগালের সামনে হাঁ-না একটা কথাও বলতে পারলে না কল্যাণী। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল সেখান থেকে।

মহামায়ার রুক্ষ মূর্তিকে এড়িয়ে গেলেও আসন্ন একটা ঘটনার কঠিন রূঢ়তাকে সে এড়াতে পারলো না। সারাটা রাত ছটফট করে জেগে রইলো সে। কল্পনার গোটা উজ্জ্বল ভাবীকালটা যেন তার ভ্রূকুটিকুটিল মেঘে মেঘে ঘনঘোর হয়ে গেল। মিলু বিলুর ঘুমন্ত মুখের দিকে যতোবার চোখ পড়লো তার ততোবারই মনে হলো—এদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তার এতোটুকু নেই।

আবার সেই দারিদ্র্য আর ক্ষুধার্ত মলিন মুখ, সেই অন্ধকার সংকীর্ণ জীবন!—সে জীবনের জ্বালা মর্মে মর্মে বুঝেছে কল্যাণী শিবশংকরের শেষ বয়সে এবং তাঁর মৃত্যুর পরের সংকটে। আবার সেই দম আটকানো জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়া—তার কল্পনাতেই সমস্ত মন কল্যাণীর না-না করে ওঠে। অনেক দুঃখ দুর্যোগের পর প্রশান্ত ভোরের একটু আলো এসে পড়েছে তার চোখে, যার কল্পনাই করেছে সে আজন্ম—স্বাদ পায়নি কোনো দিন, আজ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নতুন এক অগ্নি-পরীক্ষায় নামার সাহস নেই তার। তবু এর মাঝখানে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নরেনের মুখটা—তেমনি ভেসে ওঠে মহামায়ার ক্রোধান্ধ মূর্তি। এ সব কিছুর আলোড়নে সে অসহায়ের মতো বসে বসে সারাটা রাত কাটিয়ে দিলে অতন্দ্র ভাবে।

পরের দিন অফিসে ঢোকার মুখে সেই ছোকরা ক্লার্ক সমর যথারীতি আবার এগিয়ে এলো কাগজ আর কলম নিয়ে।

"আজ আপনার সই করার কথা।"

"ক্ষমা করুন আমাকে—ক্ষমা করুন দয়া করে।" বলতে বলতে কল্যাণী তার হতাশ ভীত মুখটা ঢাকবার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

পেছনে একটা লঘু হাসি ফেটে পড়লো—এমন যে হবে, সমর যেন তা অনেক আগেই জানতো। তার সেই বিদ্রূপের হাসি কল্যাণীকে গিয়ে বিঁধলো ধারালো ভাঙা কাঁচের টুকরোর মতো।

বড় সাহেব তখনো আসেনি। সে নিজের টেবিলে মাথা ঠুকে বসে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ মাথাটা যেন তার ঘুরে গেছে। আড়ষ্ট কানে তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পেছনের বিদ্রূপ আর খোঁচা:

"দালাল! ..."

"স্ত্রী লিঙ্গে ঈ দিয়ে কথা বলো হে।"

প্রৌঢ় কেরানীমহল যেন কথাটার রস পেয়ে গেল ভীষণ। অক্ষয়বাবু সামনের ক্ষয়া ক্ষয়া দাঁত ক'টা বের করে বললে, "ভায়া, ওতে ঈ-উ যাই দাও, বাগ মানাতে তোমরা পারলে না।"

মহেন্দ্রবাবু কুৎসিত ভঙ্গী করে বললে, "ও কি তোমার আমার বা নরেনবাবুর সাধ্য, দরকার বড় সাহেবদের।…" একটা দম চাপা আক্রোশ আর ঘৃণা ফেটে পড়ে ওদের কথায়।

টেবিলে মাথা ঠুকে ঝিম মেরে পড়ে রইলো কল্যাণী। কতোক্ষণ এমনি ভাবে পড়েছিল সে জানে না। চোখ মেলে তাকালো জলের ঝাপটা খেয়ে। সামনে বড় সাহেব হুভার। ভয়ে বড় বড় চোখ করে সে উঠে বসতে গেল। হুভার সাহেব সদয় কণ্ঠে বললে, "আরও একটু বিশ্রাম নাও মিসেস চ্যাট্যার্জি।"

দম নিয়ে কল্যাণী বললে, "আমি বাড়ি যেতে চাই।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, যাবে বৈকি।" হুভার সাহেব বললে, "আমার মোটর পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমাকে।"

আতঙ্কে কল্যাণী বলে উঠলো, "না না—আমি ট্রামেই যেতে পারবো।"

হুভার সাহেব মৃদু হেসে বললে, "ব্যাপার কি! ট্রামে ভিড় ঠেলে তুমি এই অবস্থায় যাবে কি করে! মোটরে যেতে দোষ কি?"

"ওরা আবার যা-তা বলবে।" কল্যাণী সভয়ে বললে।

সাহেব মুহূর্তে সব ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। বললে, "বুঝেছি।" তারপর একটা গালাগালি দিয়ে উঠলো, "স্কাউণ্ড্রেল! ওই স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে শায়েস্তা করছি আমি—সবুর করো আর ক'টা দিন।"

কল্যাণী বসে রইলো চুপ করে।

হুভার বললে, "তুমি বোধ করি সই করোনি?"

কল্যাণী ফ্যাকাশে মুখে বললে, "না।"

"তাই ওদের এই ইতরামো।" হুভার সাহস দিয়ে বললে, "তুমি ভয় পেও না—আমি দেখছি।"

লোকটি চিরকাল কম কথা বলে। তবু তার স্বল্প কথার গুরুত্ব কতখানি—কল্যাণী তা জানে। সাহসের পরিবর্তে সে সভয়ে চোখ তুলে তাকালো হুভারের দিকে।

হুভার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পাইপ টানতে টানতে বললে, "নরেন মুখার্জি তোমার আত্মীয় না ?"

কল্যাণী শুকনো মুখে বললে, "না।"

"ও, তা হলে বন্ধুস্থানীয়।" হুভার একটু হেসে বললে, "এ অফিসে সে তোমায় এনেছিল আত্মীয় বলে।"

গোলমেলে একটা সম্পর্কের জটিলতা আছে—সেই প্রসঙ্গের উল্লেখে কল্যাণী যেন সংকুচিত ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো, তাকে না পারলো স্বীকার করতে, না পারলো অস্বীকার করতে।

হুভার অন্যমনে বলে চললো, "নরেন খুবই বুদ্ধিমান এবং কাজের লোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে-ই এই সমস্ত গোলমালটার মূলে। বুঝতে পারছি—খুব হিসেব করে একটা সাংঘাতিক অবস্থার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে সে।"

নরেনের সঙ্গে একটা সম্পর্কের জটিলতা আর আসন্ন সংকটের আবর্তে পড়ে কল্যাণী সভয়ে তাকিয়ে রইলো হুভারের দিকে।

হুভার নরেনের সেই জটিল সম্পর্ক ধরে আবার টান মেরে বললে, "তোমার বন্ধুকে তুমি বোঝাতে পারো না ?"

কল্যাণী ঢোক গিলে বললে, "তার সঙ্গে এখন আমার কোনো সদ্ভাব নেই।"

"ও"—বলে হুভার পাইপ টানতে টানতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে কল্যাণীকে দেখলো কয়েক মুহূর্ত। আস্তে আস্তে বললে, "কিছু মনে করো না—তোমার পারিবারিক খবর নিচ্ছি বলে। কে কে আছেন তোমার—পরিবারের পরিজন, বাবা ?"

'বাবা নেই। গোটা পরিবার আমারই ওপর নির্ভর করে—ভাই বোন মা ..."

"আশ্চর্য ! এতোদিন শুধু তোমার পরিচ্ছন্ন কাজই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে"—হুভার তার সংযত গম্ভীর গলায় দরদ দিয়ে বললে, "এখন অবাক হচ্ছি তোমার উজ্জ্বল পারিবারিক জীবন দেখে। আমার মেয়েও যদি এই রকম হতো—আমি হাজার বার গর্বিত হতুম।"

হুভার প্রশান্ত একটু হেসে আবার বললে, "কিন্তু আমার কোনো মেয়ে নেই কল্যাণী। তোমার নাম ধরে ডাকছি বলে কিছু মনে করো না। সত্যি, তোমার কর্তব্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

স্বল্প কথার বর্ষীয়ান এই গম্ভীর মানুষটাকে আজ নতুন এক রূপে দেখলো কল্যাণী। ভিন্ন দেশী এই লোকটির কথাগুলো আজ তার অন্তরকে স্পর্শ করে—ফিরিয়ে আনে তার অসহায়তার মধ্যে সাহস ও নির্ভরতা।

হুভার জিজ্ঞেস করলো, "তোমার পোষ্য তা হলে তো অনেকগুলি ?"

"হ্যাঁ—ছ'সাত জন।"

"এই আয়ে তোমার চলে ?"

"চলে যায় কোনো রকমে।"

হুভার বললে, "ভারতবর্ষে আমার দীর্ঘ দিন কেটেছে। ইওরোপে সুপ্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল মেয়ের অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে তোমাদের মতো মেয়ের—যারা ঘরের জীবন আর বাইরের জীবনটাকে সুন্দর করে গেঁথে তুলতে পারে। তোমাদের দেশের মাটিতে দেখছি এই নতুন জাতকে।"

হুভারের কথায় একটা পুরানো আবেগ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো কল্যাণীর মনের ভেতরে। এই লোকটার সান্ত্বনায় শুভেচ্ছায়, প্রতিটি কথায় হঠাৎ তার বাবার কথা মনে পড়ে যায় বার বার।

হুভার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তোমার পারিবারিক খবরে সুখী হলুম—দুঃখিতও হলুম কল্যাণী। এইটুকু শুধু তোমাকে বলতে পারি, এ অফিস কাজের মানুষের মূল্য বোঝে। এবং প্রথম সুযোগেই সেটা তুমি বুঝতে পারবে। কিন্তু সবটা এখন চলেছে এমন দিকে"—

হুভার আর যেন বসে থাকতে পারলো না। আসন্ন একটা দুর্বিপাক তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে পায়চারী করিয়ে বেড়ালো সারা ঘরময়। তারপর এক সময়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন কি একটু সুস্থ বোধ করছো ?"

কল্যাণী মাথা নেড়ে সায় দিল।

হুঁভার বললে, "তা হলে বাড়ি চলে যাও।"

কল্যাণী ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে পা কেঁপে উঠলো তার আবার। তাকে যেতে হবে সেই হিংস্র কেরানী স্টাফের পাশ দিয়ে। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো তার। তবু চোখ-কান বুজে বেরিয়ে পড়লো সে ঘর থেকে। এখন কর্মব্যস্ত অফিস—ছুটির পর সে হয়তো আর বের হতে পারবে না!

কিন্তু তবু তাকে দেখে ফিসফিসানি আর গুঞ্জন ওঠে টেবিলে টেবিলে। আবার সেই আগুনের ফুলকিগুলো যেন পুড়িয়ে দিয়ে যায় তার কানের ভেতরটাকে।

কে একজন বললে, "ওস্তাদ বলতে হবে। নরেনবাবুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঢুকেছিল তো হে!" প্রৌঢ় গণেশবাবু চাপা গলায় তুলসী-দাসের দোঁহা আওড়ালো:

"দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লোহু চুষে—"

অক্ষয়বাবু হারবার পাত্র নয়—টেক্কা দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আওড়ালো:

"যতো ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ-বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।
আর কিছুদিন থাক রে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে—"
"বঙ্গবিধবার সাজের বাহার দেখে হে!"

অফিসের ভেতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল কল্যাণী। পা টলছে—মাথা টলছে আবার। নিজের চেতনা শক্তিটুকুকে প্রাণপণে সংহত করে দাঁড়ালো গিয়ে ট্রাম স্টপে।

পেছনে ডাক শুনলো এমন সময়ে পরিচিত গলার, "কল্যাণী!"

ঘুরে তাকিয়ে ভয়ে শুকিয়ে গেল তার মুখ। পেছনে নরেন। সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, এই লোকটাই তার যতো অপমান—যতো লাঞ্ছনার মূল। এই লোকটাই তার জীবনের শনিগ্রহ—তার সর্বনাশ! একে কি এড়াতে পারবে না সে জীবনে!

নরেন কোনো ভনিতা না করে বললে, "ধর্মঘটের জন্যে সই করা কি তুমি প্রয়োজন বোধ করলে না ?"

"তার চেয়েও যে আমার অনেক বড় প্রয়োজনের বাধা আছে"—কল্যাণী দম নিয়ে বললে, "তা তুমি যদি জেনেও না জানো।"

"জানি। কিন্তু তুমি কি একা ?"

"হ্যাঁ, আমি একা—আমার গরীব পরিবারে আমি একেবারে একা।" চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো হলো কল্যাণীর।

"কিন্তু এই ভাবে একা তুমি বাঁচবে—বাঁচতে পারবে ?"

"একাই তো বেঁচে আছি—বাঁচবো-ও। কে আমাকে সাহায্য করবে ?" কল্যাণীর কথায় একটা দীপ্ত জ্বালা ফুটে বেরুলো।

তার কথার জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা আত্মবিশ্বাসী দম্ভ। তার সামনে নরেন যেন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "একা বাঁচবে তুমি তোমার ছাঁটাই সুখদুঃখের সহকর্মীদের ফেলে ?"

"সুখদুঃখের সহকর্মী! যারা আমার সাজের বাহার দেখে, দেখে শুধু ব্যাভিচার—আর টিটকারি দেয়, আমার ক্ষুধার্ত অসহায় সংসার দেখে না!" কল্যাণী বললে, "বাঁচতে চাইনে আমি তাদের সঙ্গে!"

"তারা যা দেখে তাই বলে।" নরেনও হিংস্র গলায় বললে, "তোমার পদোন্নতি হয়—তাদের হয় ছাঁটাই। তুমি অফিসের পরেও এই পদোন্নতির লোভে পেছন পেছন ছোটো বড় সাহেবের, কিন্তু ছাঁটাই নামগুলোও তারা আগে জানতে পায় না।"

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কল্যাণীর। শুকনো ঠোঁঠ চেটে বললে, "তুমিও তাই দেখো ?"

"তাই দেখছি কিছু দিন থেকে।" নরেন বললে, "ইউনিয়নের ধারেও আর যাও না, সহকর্মীদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ চুকিয়ে দিয়ে ছুটেছ তুমি হুভারের পেছনে পেছনে। শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকবে ? বাঁচবে—সসম্মানে বাঁচতে শেখো! আত্মবিক্রয়ের এ একটা ঘৃণিত জীবন নিয়ে নয়।"

"আমার ঘৃণিত জীবন। তুমিও তা হলে ওদেরি মতো বিশ্বাস করো আমি—" কল্যাণী বললে বিবর্ণ মুখে। কথাটা আবৃত্তি করলে টেনে টেনে।

"হ্যাঁ, ওতে ঘেন্না হয়। তুমি জাহান্নামে গেছ!" বলে নরেন চলে গেল ঘৃণাভরে।

একা দাঁড়িয়ে রইলো কল্যাণী। চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। মনে হলো—সে বুঝি পড়ে যাবে।

ট্রাম এলো। ট্রামে উঠে বসলো কল্যাণী, আর সারা পথটা সে ভাবতে ভাবতে এলো: এই লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়েই প্রতিদিন তাকে অফিস করে যেতে হবে। ভারবাহীর মতো। আর মনে মনে বললে একজনের উদ্দেশে—সেই ভালো, তুমিও ঘৃণা করো—আমার সর্বনাশ তুমি—এমনি করে তোমার ঘৃণা দিয়ে আমাকে তুমি মুছে শেষ করে দাও তোমার জীবন থেকে।

হ্যাঁ—তবু সে টেনে যাবে দিন—তার নিঃশব্দ কর্মক্লান্ত পীড়িত একটা জীবন থেকে মিলু বিলুর জীবনে—তার বহু অতন্দ্র রাত্রির পরিকল্পিত উজ্জ্বল একটা জীবনে। সে জীবন সে গড়বেই! মুক্ত—সুন্দর—স্বচ্ছন্দ।

২১

ডালহাউসী স্কোয়ারে বহুদিন পরে দেখা হয়ে গেল নরেনের সঙ্গে অবনীর। অবনী বললে, "কি হে, তোমার যে আর পাত্তাই নেই—ব্যাপার কি!"

স্ট্রাইকের নোটিশ পড়ে গেছে অফিসে, তা ছাড়া কল্যাণীর ওপরে ক্ষোভ—সবটা মনে পড়ে গিয়ে নরেনের মাথার ভেতরটা জ্বলে উঠলো। বলে উঠলো, "তোমাদের ওখানে যেতে আজকাল ঘেন্না হয় অবনী।"

অবনী হালকা ভাবে বললে, "কেন ভাই—বেকার বটি কিন্তু ঘেন্নার কি করলুম!"

"তুমি নয়—তোমার বোন। জানো নিশ্চয়ই—ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অফিসে ধর্মঘটের তোড়জোড় চলছে।" নরেন বললে, "কিন্তু তোমার বোন শেষ পর্যন্ত বড়সাহেবদের দলে। তার জন্যে লজ্জা আর লাঞ্ছনার শেষ নেই আমার সহকর্মীদের কাছে।"

"বটে। এতো সব জানতুম না তো।"

"সে কি হে। তুমি জানো না!" নরেন একটা কড়া বিদ্রূপ করার সুযোগ ছাড়লো না। বললে, "তোমাদের বোঝা টানার জন্যেই তার নাকি এই নাচার অবস্থা—এই তো সে বলেছে।"

"আমার জন্যে—আমাদের জন্যে!" অবনীর সেই অতি সহজ ক্রোধ জ্বলে উঠলো দপ করে। বললে, "ওর ওই অকারণ মাতব্বরী অনেক সহ্য করেছি আমি—আর না। ঘরে-বাইরে ও আমার যথেষ্ট অপমান করেছে।"

একটা কুটিল প্রতিহিংসার জ্বালা যেন এই মুহূর্তে পেয়ে বসলো নরেনকে। একটু বাঁকা ভাবে হেসে বললে, "অপমান যে তোমাদের যথেষ্ট হচ্ছে, মর্যাদার যে আর কিছু নেই—সব কিছু শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে। ও একেবারে জাহান্নমে গেছে। অফিসে তো এই নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে।"

"বটে!" অবনী ক্রোধে গর্জাতে লাগলো, "আমি আজই একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বো নরেন।"

নরেন বললে, "যাই হোক—তোমাদের বাসায় গিয়ে বলবো সব—এখানে বলতে পারছি না। ওর আচরণ আজকাল এতোটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে।"

সমস্তটা অবনীকে ক্ষেপিয়ে তুললে। অল্প রোজগারের যে অস্বস্তিটা চাপা ছিল এতোদিন, সেই চাপা অস্বস্তিটা ফেটে পড়লো ক্রোধের মূর্তিতে। কারণ, আনন্দের মতো ক্রোধটাও অবনীর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। বাড়ি ফিরে এসে সে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে মায়ের সঙ্গে :

"তোমাদের এ সংসার ছেড়ে এখুনি চলে যাচ্ছি আমি। তোমরা পেয়েছ কি আমাকে!"

"হলো কি!" মহামায়া অবাক হয়ে শুধোলেন।

"বাকি রেখেছ কি!" অবনী বললে, "তোমার চাকুরে মেয়ে বলে বেড়িয়েছে চারদিকে—আমরা তার একটা বোঝা—আমাদের জন্যে তাকে অনেক অসাধ্য সাধন করতে হচ্ছে।"

মহামায়া বিরক্ত হয়ে বললেন, "করছেই তো—সে একটা মেয়ে হয়ে যা করছে, তুই তার কি করছিস বল! তোর লজ্জা করা উচিত—তুই চেঁচাচ্ছিস কি! তুই তার বিরুদ্ধে বলছিস কি!"

"বটে! তুমিও এই কথা বলছো!"

মহামায়া কোনোদিন হটেননি—আজও হটলেন না। অবনীর আঘাত তিনি ফিরিয়ে দিলেন দ্বিগুণ বেগে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোর সে বিয়ে দিলে, এই সেদিন সে তোর পড়ার খরচ পর্যন্ত দিতে চাচ্ছিলো—আর তুই হতভাগা তাকে মন্দ বলিস! বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেখাস! লজ্জা করে না তোর! একটা ধাড়ী বোন তোর কাঁধের ওপরে—কি করছিস তার, বল? কি করছিস তুই এ সংসারের?"

বলা বাহুল্য, মহামায়ার কঠোর এবং সত্যি কথাগুলো অবনীকে একেবারে চরম ভাবে আঘাত করলে। তার সব অক্ষমতা নিয়ে তারপর এ বাড়িতে আর থাকা অসম্ভব।

সে ঝগড়ার মাঝখানে কল্যাণী অফিস থেকে ফিরে এসে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ বাড়ি সে আজই ছেড়ে যাচ্ছে—এই ঘোষণা করে অবনী ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গলির মোড়ে দেখা নরেনের সঙ্গে। নরেন বললে, "তোমার ওখানেই যে যাচ্ছিলাম হে। চললে কোথায়?"

অবনী তাকে টেনে নিয়ে চললো, বললে, "চলো ভাই—যেখানে হোক একটা ডেরা খুঁজে বার করতে হবে আমাকে। সে বস্তিতে হলেও আমার আপত্তি নেই। না খেয়ে দু'জন শুকিয়ে মরি—সেও ভালো, কিন্তু এই দয়ার অন্ন আর গলা দিয়ে নামবে না।"

"নামা উচিতও নয়।" নরেন বললে, "কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করো অবনী।"

"এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা থাকে?"

"থাকে না ঠিক।"

নরেনের মধ্যেও একটা হিংস্রতা মাথা কুটে মরছে দীর্ঘদিন থেকে—এ হিংস্রতা কল্যাণীর বিরুদ্ধে, এ হিংস্রতা ঠিক অবনীর হঠাৎ একটা খ্যাপা ঝড়ের মতো নয়।—এ একটা প্রতিহিংসার মতো। কিন্তু সেটাও যেন এতোদিন ফেটে বেরুবার পথ পাচ্ছিলো না কোনো দিকে। অবনীর ক্রোধের সঙ্গে সেটা এই সুযোগে এসে যেন মিশে গেল।

নরেন বললে, "আর এখন কোথায় বা যাবে—বরং আপাতত এসে ওঠো আমার মেসে। তারপর সুবিধে মতো বাড়ি-টাড়ি খুঁজে চলে যেও যেখানে খুশি।"

অবনী-গোঁ ভরে বললে, "তুমি আমার মহা উপকারী বন্ধু স্বীকার করি—কিন্তু মাফ করো আমাকে ভাই, আমি আর কারও আশ্রয়ে উঠতে চাইনে। বরং আমি বস্তিতে গিয়ে থাকবো।"

অবনীর ক্রোধ এবং গোঁ। জানে নরেন—তাই ও-বিষয়ে আর কথা বাড়ালো না।

অবনী বললে, "আত্মবিক্রয়ের অন্নের চেয়ে মৃত্যুও ঢের ভালো।"

"হাজার বার অবনী।" তারপর একটু ভেবে নরেন বললে, "তুমি চলে এলে ওদের অবিশ্যি কোনো অসুবিধে হবে না। কারণ তোমার উপার্জনের ওপরে ওরা কেউ ভর করে ছিল না। তবে একটা আশু দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে তোমার—সে হলো শান্তা।"

"একটু আমি ম্যানেজ করে নিই থামো।" অবনী বললে তার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে, "ওর ভার আমিই নেবো।"

কি যেন ভাবতে ভাবতে নরেন হঠাৎ বলে উঠলো, "কিন্তু কি করছে—কোথায় যাচ্ছে কল্যাণী। ও এই রকম হবে শেষ পর্যন্ত, লোভী হয়ে উঠবে এতোটা—এ আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি অবনী।"

অবনী বললে, "ও বদলে গেছে। টাকা রোজগারের গরম! বুঝলে না? তারপর ওই যে বললে—লোভ।"—

"হ্যাঁ লোভ"—নরেন বললে, "মিস এলেনোরের খালি জায়গাটার দিকে ওর লোভ।"

"মরুক। ওর সঙ্গে আমার আর বনবে না।" অবনী তার সহজ ও অনড় সিদ্ধান্তটার কথা বলে দিলে স্পষ্ট গলায়, "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।"

পরের দিন সারা সকাল ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন বস্তির মধ্যে একটা ঘর ঠিক করে এলো অবনী। তারপর তার ভাঙা সুটকেস আর সামান্য বেডিং একটা হৈ-চৈ করে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিলে এবং অকারণ ব্যস্ততায় সুধাকে বার বার তাগাদা দিতে লাগলো।

কল্যাণী অফিস যাওয়ার মুখে ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। তার শুকনো মুখ, গোটা ভঙ্গীটায় কেমন একটা পাংশুতা। একটা ঢোক গিলে কল্যাণী বললে, "সত্যি সত্যিই তুমি চলে যাবে দাদা!"

অবনী কোনো কথাই কইলে না।

কল্যাণী আবার বললে, "তুমিও ভুল বুঝবে আমাকে!"

অবনী তারও কোনো জবাব দিলে না।

এক সময়ে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে রওয়ানা দিল সে তার নতুন ঘরের উদ্দেশ্যে।

মহামায়া তখন তাঁর রান্নাঘরে। কল্যাণী ছুটে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো মায়ের পিছনে। প্রায় ভেঙে পড়ে বললে, "এ কি হলো মা! দাদা যে সত্যিই চলে গেল!

"যাক না।" মহামায়া মুখ না তুলেই কঠিন কণ্ঠে বললেন, "পুরুষ মানুষের এ-ও ভালো।"

"কিন্তু—বউদি"—

"যাচ্ছে নিয়ে—যাক না।" মহামায়া বললেন, "বোঝাটা বুঝতে দে।"

মায়ের গোঁ জানে কল্যাণী—সে দাঁড়িয়ে রইলো হতাশ হয়ে।

অবনী তার বোচকা-বুচকি নিয়ে রিক্সাতে উঠলো। পেছনে পেছনে সুধা, অপরাধের ভারে জড় ও আড়ষ্ট।

ঠিক সেই মুহূর্তে কত কি যে মনে পড়ে যায় কল্যাণীর। অবনী তার ছেলেমানুষির দোসর—তার পরিণত মনের বন্ধু। এতোদিন তার হাজার কথা আর হাজার খেয়াল খুশির ঘনিষ্ঠ সহচর। সে চলে যাচ্ছে আজ তাকে ভুল বুঝে! প্রথম একটা ক্ষুব্ধ অভিমান মাথা ঠেলে উঠেছিল মনের মধ্যে—তারপর সে ভেঙে পড়লো। ছুটে গেল বাইরে। ডাকলো, "দাদা!"

"এই চলো"—অবনী ইঙ্গিত করলো রিক্সাওয়ালাকে।

"দাদা—শোন!"—

অবনীর কানে সে ডাক বোধ করি ঢুকলোও না। রিক্সার ঠুং ঠুং আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল গলি থেকে।

কল্যাণী দাঁড়িয়ে রইলো ঝাপসা চোখে। তার মনে হলো—এ পৃথিবীর সবাই যেন একে একে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে।

সেই মুহূর্তে জীবনটাকে মনে হয় তার বড় নিরুত্তাপ—বন্ধুজনহীন। কেন হলো এমন—বুঝতে পারে না সে। বুঝতে পারে না আর্থিক সঙ্গতিকে কেন্দ্র মনের বাঁকা-চোরা চেহারা। মন তার কেবলি চেয়ে ফিরতে লাগলো সেই হারানো পুরানো দিনের আনন্দ ও আমেজ।

২২

মাঝখানে মস্ত এক উঠোনের মতো চত্বর ঘিরে চারদিকে টিনের চালার সার সার ঘর। রাস্তার সামনের দিকটায় থাকে কিছু সদর-আলা গরীব ভদ্রলোকের পরিবার—সেটা ঠিক সদরেরই মতো। আর মফঃস্বলটা তার একেবারে গভীর মফঃস্বল—মজুর-মিস্ত্রি, বিক্রিওয়ালা আর ঠিকে ঝিয়ের ঘাঁটি। অবনীর ঘরটা ঠিক সদরে না হলেও সদর-মফঃস্বলের মাঝামাঝি। ঘরের সামনে গলি—পেছনে বারোয়ারি উঠোনের চাতাল।

ঘর একটিই।

সুধা বললে, "এই ঘর।"

"হ্যাঁ—এই আমার স্বর্গ।" অবনী গম্ভীর হয়ে বললে।

এই পারিবারিক বিরোধের মাঝখানে সুধা একেবারে চুপ করে গেছে। সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে তার গুরুভার জীবনটাকে নিয়ে। কেবলি তার মনে হয়, সবটার জন্যে সে-ই যেন দায়ী।

অবনী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কি, কিছু বলছো না যে।"

সুধা জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বললে, "কি বলবো।"

"ভালো মন্দ যাই হোক।"

সুধা ম্লান মুখে বললে, "তুমিই তার সবটা ভালো বোঝ।"

"বুঝি—নিশ্চয় ভালো বুঝি।" অবনী বললে, "এই আমার স্বর্গ সুধা—এ তুমিও বুঝবে। আপাতত ঘরটা একটু গুছিয়ে ফ্যালো।"

সুধার সঙ্গে সঙ্গে অবনী নিজেও লেগে গেল ঝাড়ু, দড়ি আর পেরেক-হাতুড়ি নিয়ে তার আড়ম্বরহীন স্বর্গ রচনায়। ঘরের একপাশে হলো বিছানার জায়গা, আর একপাশে বসবার। ভাঙা সুটকেসটার ওপরে খবরের কাগজ ঢেকে রাখা হলো তাদের বিছানার মাথার কাছে। সেটা হলো বেড-সাইড মিটসেফ, বৈঠকী টেবিল এবং অবনীর বিস্মৃতপ্রায় ধুলো-ঝাড়া কাব্যগ্রন্থের সেলফও। ঘরের মাঝামাঝি একটা দড়ি টানিয়ে তার ওপরে ঝুলিয়ে দিলে একটা বেড-কভার। ঘরটা হয়ে গেল দুই ভাগ।

অবনী বললে, "দেখো কেমন ম্যানেজ করে ফেললুম। চাদরের ভেতরের দিকটা তোমার অন্দর মহল, ড্রেসিং রুম, আর স্নানের ঘর—যাই বলো। আর বাইরের দিকটা আমার সদর, বৈঠক, ড্রয়িং-রুম যাই বলো। রাতের বেলা চাদরটা খুলে দিলে কেমন একটি দিব্যি গ্রাণ্ড বেড-রুম।"

ঘরের এই ভাগ-বিভাগে সুধা ম্লান মুখে একটু হাসলো।

অবনী সে মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "আমি সুখী—সত্যি, এতোদিনে আমি সুখী।"

হায় রে, কবে সে বলেছিল সেই সুখের কথা। আজ এই ছোট্ট বেড-কভারে ভাগ করা অন্ধকার মলিন ঘরটার দিকে চেয়ে চেয়ে, একটা বেদনাদায়ক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর সেই কথা মনে পড়ে বড় করুণ লাগে সুধার। করুণ লাগে অবনীকেও। সে তখন কোন আনন্দে কে জানে—পাগলের মতো আবৃত্তি করছে :

"স্মিতহাস্য সুধাস্নিগ্ধ তব পুণ্যদেশে,
কল্যাণকামনা যেথা নিয়ত বিরাজে
লক্ষ্মীরূপে, সেই তব ক্ষুদ্র গৃহ-মাঝে
বুঝিতে পেরেছি আমি ক্ষুদ্র নহি কভু ;
যত দৈন্য থাক মোর, দীন নহি তবু ;
তুমি মোরে করেছ সম্রাট।" ...

হায়! এ কবিতা অবনী আনন্দপূর্ণতার কোন এক দিনে আবৃত্তি করেছিল আর মনে হয়েছিল সুধার—পৃথিবী এতো সুন্দর, মানুষ এতো সুন্দর—জীবন কী গভীর! আজ সবটা লাগছে তার কঠিন বিদ্রূপের মতো।

সুধা বললে, 'খাওয়ার কি হবে?"

"এ বেলা রান্না নেই! রুটি কিনে আনছি—পকেটে ক'গণ্ডা পয়সা আছে এখনো।" অবনী অবলীলায় বলে গেল, "ও বেলা কিছু টাকা পাবো—তখন তোমার গেরস্তালির বাজার হবে।"

মনের একটা দুর্বহ চাপ থেকে এতোদিনে মুক্ত অবনী। কল্যাণীর ফাঁপাই পরিকল্পনা আর প্রধানত তারই উপার্জনে-চলা সংসারে বেকার অবনীর যে পৌরুষ আঘাত খেয়েছে প্রতিদিনই—সে গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে অবনী যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আবার আগের মতো। নতুন বাসায় এসে প্রথম কয়েকটা দিনের অভাব-অনটন, এমন কি অনশনও যেন গায়ে লাগে না তার। ভাঙা সুটকেসের ভেতরে চাপা-পড়া বাঁশীটা বেরিয়ে আসে আবার, মুখ বন্ধ-করা কাব্যগ্রন্থগুলো মুখর হয়ে ওঠে নতুন করে।

শুধু সুধা স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন নতুন একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। তাকে জাগালেও সে আর জাগে না।

অবনী বললে, "মুষড়ে পড়লে এরই মধ্যে!"

নতুন বাসায় তৃতীয় দিনের সকালেও অবনীর সেই রকম উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চেয়ে সুধা ম্লান হেসে বললে, "আজও তোমার রান্নার কিছু নেই।"

"তবে আর কি!" অবনী তার দুই বাহুর তরঙ্গিত পেশীর ঢেউয়ে যেন ভাসিয়ে নিলে সুধাকে। কণ্ঠে তার মুখর আবৃত্তি:

"আজ কোনো কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থ গীত, এসো তুমি, প্রিয়ে,
আজন্মসাধনধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনালতা।"

সবটা আজ বিদ্রূপের মতো শোনায় সুধার কাছে। বিষণ্ণ গলায় আস্তে আস্তে সে বললে, "ছাড়ো—ভালো লাগছে না।"

অবনী ওর মুখের কাছে ঝুঁকে বললে:

"এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্য—অতৃপ্তির 'পর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর॥"

সুধা ওর মুখে হাত চাপা দিলে। বললে, "দোহাই তোমার—থামো। আমার কান্না পাচ্ছে।"

অবনী থামলো। তাকালো গভীর চোখে সুধার মুখের দিকে। বললে, "তোমার হয়েছে কি বলো দেখি?"

"কিছু নয়। ভাবছি—এমনি ভাবে কতো দিন চলবে।"

"যতোদিন চলে।" অবনী বললে বেপরোয়া ভাবে, "আমি সুখী—আমি মুক্ত।"

ওর কথায় এখনও সেই কাব্যের আবেগ।

সুধা ঠাণ্ডা গলায় বললে, "দিন এমনি যাবে?"

"ভয় পাচ্ছ—না ?"

"ভয় পাই না, না খাওয়ার অভ্যেস আমার অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে।" সুধা ম্লান মুখে হেসে বললে, "কিন্তু এই সমস্তটার জন্যে নিজেকেই আমার দায়ী বলে মনে হচ্ছে।"

"তা কেন ?" অবনী বলে উঠলো, "কি বলছো পাগলের মতো তার ঠিক নেই।"

সুধা বললে, "কেবলি মনে হচ্ছে—তোমাদের সংসারে আমি এসে পড়তেই সবটা যেন এই রকম হয়ে গেল।"

সুধার কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অবনী বললে, "হ্যাঁ—মস্ত একটা ইতিহাস ঘটে গেল। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিপ্লবে যে ইতিহাস ঘটে—সেই রকম একটা মস্ত বড় ইতিহাস। ঘুমন্ত অবনী মুখুজ্যে, মরা অবনী মুখুজ্যের জন্মান্তর ঘটে গেল। সে বেঁচে উঠলো দ্বিতীয় জন্মে—তার প্রেমে।"

সুধা আর কোনো কথা কইলো না। বোধ করি অবনীর সহসা জাগ্রত সেই উদ্বেল মুখরতার সামনে তার আত্ম-অনুশোচনায় দগ্ধ মনে আর যুক্তি-তর্কের কথা কিছু যোগালো না। নীরবে সে ছেড়ে দিল নিজেকে অবনীর কাছে। ওর হাত, ওর আঙুল, ওর চুল—যেন ওর সমস্ত নিস্তেজ ইন্দ্রিয়ের ওপর নিবিড় আনন্দ ও আদরে খেলা করতে লাগলো অবনীর আঙুলগুলো।

অভুক্ত, ক্ষুধার্ত যে দেহটায় সাড়া নেই, বরং চোখে তার নিরুত্তাপ বিষণ্ণতা—সে দেহ নিয়ে একটা পুরুষ কতক্ষণ আর তার নিজেরি মনের আনন্দে উদ্বেল হয়ে থাকতে পারে! আঘাত লাগে সহজ মানুষ অবনীর মনে।

অবনী ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, "হঠাৎ তুমি এতো মিইয়ে গেলে কেন ?"

শুকনো গলায় সুধা বললে, "কিছু ভালো লাগছে না।"

তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল অবনী। খানিক বাদে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনে বলে উঠলো, "দারিদ্র্য বড় নিষ্ঠুর অভিশাপ।"—অবনী উঠে দাঁড়াল।

অপরাধীর মতো সুধা সচকিত হয়ে একটা হাত চেপে ধরলো অবনীর। কি জানি, অবনীর ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসটা তাকে খোঁচা মেরে নিঃসাড় দেহটায় তার সাড়া জাগালো কি-না। কিন্তু অবনী নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলে আস্তে আস্তে। বললে, "মনে হচ্ছে—হেরে গেলুম সুধা। আমার হারানো কাব্যের নেশা আর প্রেম দিয়ে পেটের খিদেটাকে চাপতে পারলুম না।" অবনীর স্তব্ধ বিষণ্ণ চোখে সেই হারানো কোনও দিনের করুণ একটা স্বপ্নের ছায়াপাত হয়। আস্তে আস্তে আবার বললে সে, "আমাদের টাকা চাই—অনেক টাকা চাই, না সুধা?"

অবনীর হঠাৎ এ ভাবান্তরে ভয় পায় সুধা। কথায় তার মিনতি—বললে, "অমন করে তুমি বলো না।"

"বলবো না—না!" অবনী কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো সুধার বিরস করুণ অনশনক্লিষ্ট মুখটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "টাকা চাই। তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমার স্বর্গও যে নরক সুধা! টাকা চাই—টাকা চাই।"—বলে সে পায়চারী করতে লাগলো সারা ঘরময় অশান্ত ভাবে। তারপর এক সময় জামাটা পরে বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

"কোথায় যাচ্ছ?"—পেছন থেকে ডাকলো হঠাৎ ভয়-পাওয়া সুধা।

"টাকা। আমার স্বর্গের চাবি কাঠির সন্ধানে।" অবনী বেরিয়ে গেল।

সুধা সচকিতে তাকালো একবার তার চলে যাওয়ার দিকে। তারপর উঠে পেট ভরে এক গ্লাস জল খেল। ফিরে এসে বসলো আবার তেমনি নীরব নিস্পন্দ ভাবে জানালার কাছে। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো সে। এক দৃষ্টে দেখতে লাগলো একটা কুকুরকে—কিছুটা দূরে, গলির একটা নির্ঝঞ্ঝাট ছায়া-ছায়া কোণে শুকনো হাড় একটা চিবুচ্ছে নানা ভঙ্গীমায়, লালার ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে কষ বেয়ে। আশ্চর্য! কবেকার ওই শুকনো খট্‌খটে হাড়টায় খাদ্য

নেই—তবু ওর লালা ঝরে পড়ছে কেমন! ওই রকম কোথায় একটা মিল আছে যেন তাদের এই নতুন বাসার জীবনের সঙ্গে। চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তার। জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিলে। তবু কানে এসে লাগছে নীরস হাড় চিবানোর কড়মড় শব্দটা। অসহ্য মনে হলো। জানালা ছেড়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো সে—একদৃষ্টে দেখতে লাগলো বিছানাটা, রাতের কুঞ্চিত এলোমেলো ভাঁজ ··· দুটো পাশাপাশি বালিশ।···ওখানে আঁকা আছে যেন দুটো মানুষের কামনা ও জীবন-স্বপ্নের দাগ। কিন্তু সবটাকে আজ বড় ব্যর্থ, বড় স্বপ্নভ্রষ্ট বলে মনে হয় তার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলো বিছানার এক কোণে। ভাঙা সুটকেসটা খুলে দোয়াত-কলম আর কাগজ বার করলে। আয়োজন করে চিঠি লিখতে বসলো সে।

কল্যাণী দি',

আমার অপরাধ নিও না। নিজের বোঝাটা নিয়ে যেখানে যতো দূরেই যাই, তার ভার কমে না,—ও বাড়িতেও যেমন এ কথাটা বুঝেছি, এখানে এসেও তেমনি বুঝছি। কিন্তু আমি তোমাকে চিনতে কোনোদিন ভুল করিনি—অন্যে যে যাই বলুক আর বুঝুক। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। তোমাকে আমার শতকোটি প্রণাম। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ একদিন। তোমার সে ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না, তার যোগ্যতাও আমার নেই—এই দুঃখটা থেকে যাবে চিরকাল। আমায় ক্ষমা করো কল্যাণী দি'।"

২৩

সুধার চিঠিতে ঠিকানা-পাত্তা পেয়ে শান্তা এলো একদিন অবনীর নতুন বাসায়।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সে যে বেশ খানিকটা হয়রান হয়ে গেছে—সে তার চেহারাতেই মালুম। ঘরে ঢুকে বললে, "বাব্বাঃ, এই ঘর! ঠিকানা পাই তো ঘর খুঁজে পাই না।"—

সুধা ম্লান হেসে বললে, "সবাই ভালো আছে তো শান্তা?"

"আমরা ভালো থাকবো না তো কি তোমরা থাকবে?" শান্তা কৌতুক করেই বললে কথাটা।

কিন্তু সুধার ম্লান মুখটা তাতে আরও ম্লান হয়ে গেল।

শান্তা বললে, "দাদা কোথায়?"

আর কোথায় যাবে ভাই—পেটের ধান্ধায়। বিকেলে হয়তো আসবে একবার। আসার সময়ও হয়েছে—বসো।" সুধা বললে, "তারপর—ও-বাড়ির সব খবর বলো।"

"বলছি বলছি—থামো। দাদা আসুক।" যদিও খবর বলবার জন্যে কম আগ্রহ নেই শান্তার—কিন্তু কেবল সুধার কাছে সে-সব কথা বলায় সুখ নেই তার। শান্তা বললে, "আগে ঘর-সংসার দেখি তোমার। রান্না করো কোথায়?"

শান্তা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সবটা। আপাতত চেপে গেল ও বাড়ির সব খবর। বরং এ বাড়ির খবর সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ পেল তার বেশি।

শান্তা জিজ্ঞেস করলে, "নরেনদা আসেন না?"

"এসেছিলেন—সেই প্রথম দু'য়েকদিন।"

"আর আসেননি?" শান্তা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, "দাদা আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করলো না তো?"

"না, তা করেনি।"

এমন সময় অবনী এলো। ঘরে ঢুকে শান্তাকে দেখে সে অবাক হয়ে বলে উঠলো, "শান্তা!"

শান্তা হেসে বললে, "আমিই তো।" এতক্ষণে শান্তা অন্তত প্রথম একটা খবর বলার যেন মওকা পেয়ে গেল। বললে, "কেন দাদা, চিঠি পেয়ে দিদি না এসে আমি এসেছি বলে রাগ করছো না কি?"

সুধার মুখটা কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল।

অবনী ভ্রূকুটি করলো। "চিঠি!" বিরস গলায় বললে, "লিখলে কে?"

"কেন, বউদি।" শান্তা সহজভাবে সকৌতুকে হেসে বললে, "ইস—তুমি যেন জানো না।"

অবনী অত্যন্ত বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে তাকালো একবার সুধার দিকে। তার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে যেন বুঝে নিল সবটা। নীরস গলায় বললে, "চিঠি লিখে হ্যাংলামী আবার কেন! এ সব মোটেই পছন্দ করিনে আমি—মোটেই না।"

শান্তা ভালো মানুষের মতো বললে, "বউদিকে এ তুমি অন্যায় করে বকছো দাদা। আমাদের তুমি ঠিকানাটাও দিয়ে আসোনি। দিদি না হয় না-ই এলো, কিন্তু আমি তো আসতে পারি। তা একখানা ঘর খুঁজে বের করেছ বটে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি।"

অবনী বললে, "এই আমার স্বর্গ। তোদের না ভালো লাগতে পারে—কোঠাবাড়ির বড় বড় মানুষ তোরা। আর দু'দিন বাদে ভালো পাড়ায় আরও ভালো বাড়িতে যাচ্ছিস।" সামনে শান্তাকে পেয়ে অবনী যেন তারই ওপরে গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলো।

শান্তা রাগ তো করলোই না—বরং হেসে ফেললে। বললে, "ও সব কথা বলো গে তোমার বড় বোনটিকে। আমাকে এখন বলো—এখানে আমি আসবো কবে।"

"কেন, দিব্যি তো আছিস ওখানে।" অবনী তেমনি খোঁচা দিয়ে বললে, "ভালোমন্দ খাচ্ছিস, জাঁকিয়ে সাজগোজ করে বেড়াচ্ছিস।"

শান্তা হতাশ চোখে চেয়ে বললে, "তুমি যে বলেছিলে, দিনকয়েক বাদে এখানে আসতে পারবো!"

"কেন, সুখে কি তোর অরুচি হলো?"

"হলো। আমার একটুও ভালো লাগছে না দাদা ওখানে।" শান্তা বললে, "দিদি তো আজকাল কথাই বলে না আমার সঙ্গে! ও চাকরির দেমাক আর সহ্য হয় না।"

সুধার নিঃশব্দ মূর্তিটার দিকে অবনী অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে সশব্দে একটু হেসে উঠলো: অর্থাৎ, দেখো—এই মেয়েটার মনেও লেগেছে কল্যাণীর মাতব্বরী ও দেমাক।

এমন সময় বাইরে নরেনের গলা শোনা গেল, "অবনী বাড়ি আছ ?"

শান্তার চোখে একটা দ্যুতি খেলে যায়, সে যেন সহসা সচকিত হয়ে উঠলো। বললে, "নরেনদা এলো বোধ হয় দাদা।"

সুধা উঠে চলে গেল তার রান্নাঘরেরর দিকে। একটু অস্বস্তি বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত শান্তা চেপে বসে রইলো।

"আরে এসো এসো—ঢুকে পড়ো বিনা দ্বিধায়।" অবনী হাঁক পেড়ে বললে, "উহুঁ-হুঁ জুতো সমেত—ওইটে একেবারে ভুল করো না। এ গলির কুকুরগুলোরও বড্ড খিদে হে—খোয়া যাবে।"

তার সকলরব অভ্যর্থনায় নরেন বললে, "ভালোই আছ মনে হচ্ছে।"

"গরীব বটে কিন্তু মনের গরমটা টাকার গরমের চেয়ে কম কেন হবে ভাই।" অবনী হেসে বললে, "মরার পরের ভাবনায় ভাবিত মানুষদের সারাদিন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বের করি, আর দালালী যা পাই তাই দু'জনে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খাই। কারুর ধার ধারিনে।"

"সেই ভালো অবনী।" নরেন বললে, "সেই যে কি বলে—আত্মবিক্রয়ের ঘৃণিত সুখের চেয়ে স্বাধিকারের স্বস্তি অনেক মহৎ।" তারপর হঠাৎ ও-বাড়ি থেকে আসা শান্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে গম্ভীর হয়ে থেমে গেল।

নরেনের ভাবান্তরিত এই মুখের দিকে চেয়ে অবনী মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে, "তারপর—ও বাড়ির খবর-টবর কিছু রাখ ?"

নরেন হাত জোড় করে বললে, "মাফ করো ভাই—ও বাড়ির কথা আর তুলো না। সবটা মনে হলেও আমার ঘেন্না হয়। কল্যাণীর ব্যাপারে অফিসে তো আর মুখ দেখাবার জো নেই। ছি ছি—"

শান্তা ওদের কথার মাঝখানে হঠাৎ একটু সশব্দে হেসে উঠলো।

অবনী বললে, "হাসলি যে ?"

"তোমাদের ব্যাপার দেখে দাদা।" শান্তা খোঁচা দিয়ে বললে, "কখন যে কাকে তোমরা মাথায় তোলো—আবার কখন যে কাকে দুম করে ফেলে দাও—বুঝতে পারিনে।"

"আমি মাথায় তুলেছি কল্যাণীকে ?" অবনী প্রায় চটে গেল।

শান্তা কোন কথা বললে না। কিন্তু মুখে তার বাঁকা নিঃশব্দ হাসি একটা লেগেই রইলো।

নরেনের মনে হলো—শান্তার খোঁচাটা যেন তাকেই লক্ষ্য করে। তাই সে আস্তে আস্তে বললে, "হ্যাঁ—আমি একটা মস্ত ভুল করেছিলুম বটে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এখন সহকর্মীদের টিটকারি খেয়ে।"

"তোমাদের অফিসের আর সব খবর কি ?" অবনী শুধোলো, "স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে ?"

"না, স্ট্রাইকের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, আসছে সপ্তাহে শুরু হবে।" নরেন বললে, "স্টাফের সবাই স্ট্রাইকের পক্ষে—শুধু কিছু মোসাহেব অফিসার আর তোমার বোনটি ছাড়া।"

"তাই শুনছিলুম বটে শান্তার কাছে।" অবনী মন্তব্য করলে, "উন্নতির মোহ—বুঝলে ?"

শান্তা আরও একটু ফোড়ন কেটে একটু ব্যঞ্জনা দিয়ে বললে, "বাড়ি ফিরতে তো আজকাল কোনো দিন হয় রাত ন'টা-দশটা।"

"এতো !"—বলে নরেন থমকে গেল হঠাৎ শান্তার দিকে চেয়ে।

শান্তা আবার ফিক করে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো আপন মনে।

সে হাসি আবার বিঁধলো নরেনকে। শান্তাকে সে শুনিয়ে বললে, "ভুল সবাই করে—আমারও হয়েছিল।" একটু থেমে আবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "অফিসেও কম টিটকারি আমাকে সহ্য করতে হয় না। সচ্ছল জীবনের একটা লোভ—একটা মোহ পেয়ে বসেছে ওকে।"

নরেনের ক্ষোভ আর শান্তার ধারালো নখের মতো কথাগুলো আঁচড় কেটে কেটে বসে অবনীর মনে। অতি সহজ মানুষের অতি সহজ আঘাত হানার একটা ইচ্ছা তারও মনে যে ছিল না তা নয়, কিন্তু শান্তার কথাগুলোতে কল্যাণীর কুৎসিত অধঃপতনের যে ইঙ্গিতটা ছিল তা তার মনকে হঠাৎ যেন স্তব্ধ করে দিলে। কল্যাণী সম্পর্কে অতটা

সে ভাবতেও পারে না—কষ্ট হয়। ওরা শুধু পিঠোপিঠি ভাই-বোনই নয়, বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্বও ওদের গড়ে উঠেছিল। সেখানে বিরূপতা যতটাই থাকুক—কুৎসিত বিশ্বাসহীনতা ছিল না। ওদের কথার মাঝখানে অবনী হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠলো, "কি জানি! কল্যাণী—সেই কল্যাণী, আমার এতোদিনের সমস্ত বিশ্বাস উল্টে-পাল্টে দেবে!"

শান্তা তাকালো দাদার মুখের দিকে খানিকটা যেন হকচকিয়ে।

নরেনও হঠাৎ সচকিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো অবনীর দিকে। অবনী ও কল্যাণীর পরস্পরের গভীর আকর্ষণ ও বন্ধুত্ব যে কি ছিল, তা অজানা নেই নরেনের।

শান্তার তড়িৎবুদ্ধি যেন সকলের মুখের দিকে চেয়ে এক পলকে বুঝে নিলে সবটা। নিজেই সে ও-প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে বললে, "যাক ও সব কথা। আমি কবে তোমার এখানে চলে আসছি দাদা—সেই কথাটা বলো।"

নরেন জিজ্ঞেস করলে অবনীকে, "শান্তা বুঝি চলে আসতে চাচ্ছে?"

অবনীর কিছু বলার আগে শান্তাই চটপট জবাব দিল, "হ্যাঁ, চাইনে আমার ওই সচ্ছল জীবনের মোহ। তোমার এখানে আমার না খেতে পেলেও ভালো লাগবে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা অবনীর অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর। সে নরেন ও সুধার দিকে চেয়ে মুচকি হাসতে লাগলো। আর নরেন চোখ তুলে এতোদিন পরে যেন পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলো শান্তাকে। এ যেন নতুন করে চেনা—জানা। কল্যাণী সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মনটাকে শান্তা আজ যেন সজোরে নাড়া দিয়ে দিলে।

নরেনের সপ্রশংস সে দৃষ্টির দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে শান্তা উঠে পড়লো অস্বস্তিতে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বলো দাদা—কবে আসবো?"

অবনী বললে, "আসবি—আসবি, তোর ভার নেবো বলেছি আমি যখন—তখন নেবোই। আমি আর একটু ম্যানেজ করে নিই, থাম।"

"আমি যাই এবার তবে—অনেকটা যেতে হবে, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে।" বলে শান্তা একটু ভাবিত হয়ে তাকালো নরেনের দিকে। বললে, "আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন নরেন দা?"

"নিশ্চয়ই"—নরেন বললে সাগ্রহে।

নরেনের ওই সাগ্রহ কণ্ঠস্বর শুনে সকলের অলক্ষ্যে শান্তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠলো। হঠাৎ তার মনে হলো—কোথায় যেন তার মস্ত বড় একটা বিজয় হয়ে গেল আজ। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্পগুজব করে নরেন আর শান্তা বেরুলো অবনীর বাসা থেকে।

ওরা হেঁটে চলেছে পাশাপাশি। নরেন নিস্তব্ধ—অন্যমনস্ক, আর শান্তার মুখচোখ আজ উচ্ছ্বসিত—কোথা দিয়ে যেন পূর্ণতার জোয়ার এসেছে তার মনে। ভয়ানক কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিন্তু নরেন যেন তার মনের কোন গহন তলায় তলিয়ে গেছে। শান্তার পাশে পথ হাঁটছে কি যেন ভাবতে ভাবতে।

চোখের কোণে তাকে কয়েকবার দেখলো শান্তা—তারপর সুকৌশলে তুললে এমন একটা প্রসঙ্গ যাতে নরেনের মত্ততা প্রবল। জিজ্ঞেস করলে, "আপনাদের স্ট্রাইক শুরু হচ্ছে কবে?"

নরেন একটু অবাক হয়ে বললে, "ঠিক আজ থেকে বারো দিন পরে।"

"কি হবে মনে হয়?" শান্তা হঠাৎ এমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করে স্ট্রাইক সম্পর্কে যে নরেন আবার একবার অবাক হয়ে যায় শান্তা সম্পর্কে।

এ সব বিষয়ে শান্তার যে কোন কৌতূহল থাকতে পারে—এ ধারণা নরেনের কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু আজ তার মন যখন কল্যাণীর ওপর একান্তভাবে বিরূপ, তখন এতোদিন ঘরের কোণের অন্ধকারে অপরিচিত শান্তার এ কৌতূহল দেখে খুবই ভালো লাগে নরেনের। নরেন বললে, "বুঝতে পারছিনে এখনও শান্তা।"

"এর মধ্যে আপনিও তো ছাঁটাই হয়ে যেতে পারেন ?"

"যে কোনো দিন।"

"কি হবে তা হলে !"

শান্তার কথায় শুধু আগ্রহ নয়—একটা সহৃদয় দুশ্চিন্তাও প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নরেনের—আর একজনের কথা, এমনি আর একজনের বিহ্বল আতঙ্ক। সে-ও ঠিক একদিন বলেছিল এমনি করে। কিন্তু সেদিন আর এ দিনের পরিবর্তনটা আজ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে বাজে।

শান্তা বললে নিজের মনে, "তবু নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার চেয়ে তা ঢের ভালো।"

"ভালো ?"

"ভালো বৈ কি নরেন দা।" শান্তার কথায় লাগলো একটা সূক্ষ্ম অভিমানের টান। বললে, "ভালো মন্দ কোনটা, তা-ও কি আমি বুঝি না মনে করেন ?"

নিঃশব্দে প্রতিক্রিয়ার একটা আবেগ ফুলে উঠলো যেন নরেনের বুকের মধ্যে। সেই মুহূর্তে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গেই মনে হলো তার—এতোদিন গেছে সে ওদের বাড়িতে কিন্তু এই মেয়েটাকে চিনতে পারেনি সে কোনোদিন, চেনবার চেষ্টাও করেনি কেন! ও থেকে গেছে মহামায়ার অন্দরেই শুধু নয়—যেন একটা মহৎ কিন্তু অপরিচয়ের অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার কল্যাণীর কথাও। সে বলেছিল—শান্তাই তাকে ভালবাসে, শান্তাকেই তার বিয়ে করা উচিত। নানা কথার চাপা একটা আবেগ নিয়ে অন্যমনস্ক নরেন হাঁটতে লাগলো শান্তার পাশে পাশে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে নরেন থমকে দাঁড়ালো। বললে, "আর না—এবার ফিরি শান্তা।"

"বাড়িতে আসবেন না ?" শান্তার কথায় আন্তরিক আগ্রহ।

"না—ফিরি এবার।" নরেন বিরস গলায় বললে।

শান্তা যেন একটু দমে গেল। তবু আবার সেই আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে বললো সে, "কাল যাবো আবার দাদার বাসায়—যাবেন আপনি?"

উৎসুক ছুটো চোখে তার প্রত্যাশা ভরা জিজ্ঞাসা—তার সামনে দাঁড়িয়ে নরেন বলতে পারলো না, সে যাবে না।

২৪

অবনীর নতুন বাসায় শান্তার যেমন একটি নতুন পরিচয় পেল নরেন—তেমনি দুর্বোধ্য একটি অপরিচয়ে নতুন রূপে প্রতিভাত হলো সুধা। দিনে দিনে সে একেবারে নীরব হয়ে গেল—এবং বাইরের ব্যবহারিক জগৎটাকে গুটিয়ে পাটিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে যেন একেবারে সংকুচিত হয়ে গেল। এদিকে ও-বাড়ির আলোচনায়, কল্যাণীর কথা প্রসঙ্গে, কখনো বা নরেনের আসন্ন ধর্মঘটের নানা খবরে এদের নতুন আসরটি যেমন জমে উঠলো দিনে দিনে—তেমনি সে-আসরের পাশ থেকে সুধা একেবারে নিঃশব্দে সরে গেল অথবা থাকলেও সে কোনো কথা বলে না।

নরেন একদিন বললে, "সুধার হলো কি?"

"কি হবে!" সুধা ম্লান হেসে বললে।

শান্তা টিপ্পনি কাটলো, "দিদির কথা বলি আমরা—হয়তো বউদির সে সব ভালো লাগে না।"

নরেনের মুখটা সহসা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সে বললে, "হয়তো অযথা নিন্দে করে ফেলছি তার আমরা—যেটা করা উচিত হয়নি। তার জন্যে দুঃখিত আমি সুধা।"

সুধা ফ্যাকাশে মুখে বলে উঠলো, "না না, তার জন্যে নয় নরেনবাবু—যেটা নিন্দের, সেটা সকলেই নিন্দে করবে বৈ কি। আমি মোটেই ওসব ভাবিনি।"

নরেন বললে, "তবু ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে একটা পরিবর্তন তোমার লক্ষ্য করছি সুধা—এ তুমি উড়িয়ে দিতে পারো না।"

শুধু নিঃশব্দে ম্লান একটু হেসে কথাটাকে সুধা এড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে—সেদিন তখনো অবনীর দেখা নেই। নরেন বললে, "অবনী যে এখনও ফিরছে না!"

উদাসীন ভাবে সুধা বললে, "কি জানি! দেরি হলে কিছু তো জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই।" বলে হাসলো সে ম্লান মুখে।

"চটে যায় বুঝি?"

"না! অভাবের অভিমান।"

সুধার বিষণ্ণ কথাগুলো অন্তর স্পর্শ করে নরেনের। মনে হয় তার—ওরই মধ্যে হয়তো সুধার দুর্বোধ্য ওই ঔদাসীন্যের কারণটা নিহিত আছে।

নরেন একটু তলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাড়ি থেকে বেরোয় সে কখন?"

"সকালেই।"

"দুপুরে ফেরে না?"

"আগে ফিরতো। এ ক'দিন তা-ও ফিরচে না।" সুধা ম্লান মুখে হেসে বললে, "হঠাৎ হুঁশ হয়েছে—টাকা রোজগার করতে হবে। ঘরে বসে থাকলে তো পেট ভরবে না।"—

"ঘুরুক, কিন্তু সকাল থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত!"

সুধা চুপ করে রইলো।

শান্তা হেসে বললে, "বুঝেছি, তাই বউদির মন খারাপ।"

নরেন মাথা নেড়ে বললে, "না না শান্তা, এ অবনীর অত্যন্ত অন্যায়। একা একা একটা মানুষের ভালো লাগে না-কি! আজ দুপুরে সে ফেরেনি?"

সুধা সসংকোচে বললে, "না।"

শান্তা মুখ টিপে হেসে বললে, "দাদা তো ও বাসায় দুপুরে বেরুতোই না। আমার মনে হচ্ছে—তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি একটা হয়েছে বউদি। ঠিক ধরেছি কি না বলো?"

সুধা কোনো উত্তর দিলে না। বুদ্ধিমান শান্তা ধরেছে ঠিকই। সেই একদিনের সামান্য দু-একটা কথার পর অবনী তার স্বর্গের চাবিকাঠির সন্ধানে এমনি ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে যে সারাটা দিন প্রায় সুধার একা একাই কাটে। কিন্তু সে সব কথা শান্তার সামনে বলতে প্রবৃত্তি হয় না সুধার। সে চুপ করে রইলো। এবং সে যে ব্যাপারটা চেপে গেল—এ আর দুর্বোধ্য রইলো না শান্তা বা নরেনের কাছে।

নরেন বললে, "অবনীর ওই এক বিশ্রী দোষ—ঝোঁকের মানুষ, ঝোঁকে চলে। যখন যেটা নিয়ে পড়বে সেইটেতেই দিশেহারা। ওর ওই দোষটি সয়ে নিও সুধা বউঠাকরুন। যাক, অবনীর স্বর্গে আজ কি কি রান্না হলো বলো।"

সুধা বিষণ্ণ হেসে বললে, "স্বর্গের রান্না—কত বলবো! পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা—"

"বটে! বটে!"

সুধা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলো, "আমার জন্যে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন নরেন বাবু?"

"কাজ!" নরেন কয়েক পলক এই মেয়েটির আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কি কাজ?"

সুধা সলজ্জে বললে, "কর্পোরেশনের কোন প্রাইমারী স্কুলে হয় না? ওটা আমি পারতে পারি। বোঝেনই তো"—

কথাটা আর শেষ করতে পারলো না সে। যেমন হঠাৎ সে কথাটা তুলেছিল—তেমনি করেই থেমে গেল, তবু এই অসম্পূর্ণ কথাটার মধ্যেই তার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা এমনি ভাবেই ফুটে উঠলো যে নরেন কয়েক মুহূর্ত তার সংকুচিত লজ্জিত মুখটার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

নরেন বললে, "ব্যাপার কি বলো তো সুধা!"

এমন সময় অবনী এসে পড়লো ওদের কথার মাঝখানে। তাকে হৈ-হৈ করে ছেঁকে ধরলো শান্তা ও নরেন দু'জনেই।

"এ তোমার ভারি অন্যায়—"

"হলো কি।" অবনী জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

"তুমি সেই সকাল থেকে বেরিয়েছ—আর এই এলে।" শান্তা বললে, "বউদি মুখ শুকনো করে বসে আছে একা একা।—এ কি!"

"তোদের ও-বাড়িতে সুখের জীবন।" অবনী খোঁচা দিয়ে বললে, "আমি গরীব মানুষ—খেটে খেতে হয়। বসে থাকলে খেতে পাবো?"

নরেন বললে, "তোমার এই নতুন বাসায় প্রথম দিকটায় কিন্তু তোমার মুখে ওই রকম কথা শুনিনি অবনী। মনের গরম না-কি ওই রকম একটা কথা বলেছিলে একদিন মনে হচ্ছে।"

বলেছিল বটে। তারপর পরিবর্তন এসেছে। সমুদ্রের ফেণার মতো সে অবনী শুকিয়ে শুকিয়ে কঠিন হয়ে গেছে, গেছে তার নির্বোধ প্রেম—আর তার সহস্র কল্পনা।

অবনী এক পলকে একবার শুধু দেখে নিল বিবর্ণ সুধাকে। তাতে সুধার বিবর্ণ মুখটা আরও বিবর্ণ হয়ে গেল।

অবনী বাজারের থলেটা সুধার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "চটপট কিছু করো সুধা—পেটের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে। ওরই মধ্যে তোমার সব আছে।"

"তার মানে। এখন রান্না হবে?" নরেন সুধার শুকনো মুখটার দিকে চেয়ে বললে, "এই তোমার স্বর্গের রান্নার নমুনা নাকি সুধা? ভাগ্যিস কিছু চেয়ে বসিনি!"

সুধা নীরবে বাজারের থলেটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

নরেন মৃদুকণ্ঠে বললে, "যাই হোক—বাড়াবাড়ি করো না অবনী। যতোটুকু বুঝেছি—সুধা মনে আঘাত পেয়েছে খুব।"

"কিছু বলেছে বুঝি?" অবনী জিজ্ঞেস করলে ভুরু কুঁচকে।

শান্তা হেসে উঠে বললে, "হ্যাঁ—তাই নিয়ে তুমি আবার ঝগড়া লাগাও আমরা চলে গেলে।"

অবনী চেপে গেল। শান্তার কথায় মুখটা তার খুব প্রসন্ন দেখালো না।

এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে নরেনের ছিল না। বরং সারাদিনের পরে ওদের দেখা-সাক্ষাতের মাঝখানে তারা একটা উটকো বাধার মতো। তাই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি চলি আজ অবনী।"

"বাঃ, আমিও যাবো তো।" শান্তাও উঠলো। বললে, "নইলে কে আমাকে অতোখানি পৌঁছে দেবে? চলুন।"

অবনী ওদের এগিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার অফিসের কি খবর নরেন?"

"সেই একই রকম। কাল সব শুনো।" নরেন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "তুমি যাও—আগে ঝগড়া-ঝাঁটি মেটাওগে, পেটও জ্বলছে নিশ্চয়ই। আমরা চলি।"

অবনী অবাক হয়ে বললে, "ঝগড়া-ঝাঁটি—কি বললে?"

নরেন সহাস্যে বললে, "বলি—একজনকে একা ফেলে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ! এ কার ভালো লাগে?"

"ও।" বলে অবনী হাসতে গিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল।

ওরা চলে গেল।

গলিটা পার হয়ে এসে শান্তা যেন নিজেকে শুনিয়েই বললে, "দাদার এ-বাসা ছেড়ে ও-বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে মনে হলেই গায়ে আমার জ্বর আসে।"

নরেন বললে, "কেন?"

"কি জানি!" শান্তা চলতে চলতে অন্যমনে বললে, "এখানে অভাব আছে, অনটন আছে—তবু আছে একজনের জন্যে আর একজনের ভাবনা—চিন্তা। দাদা-বউদির ওই সামান্য ঝগড়াটুকুর মধ্যে যা ফুটে বেরিয়েছে। আমার ভারি ভালো লাগলো।"

কথার ভঙ্গীতে যতোখানি হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ফেটে বেরুতে পারে—শান্তার কথাগুলো তেমনি। নরেন মুহূর্তের জন্যে ওর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালো। তারও ভালো লাগলো—এই মেয়েটার কথা, আবেগ, ভঙ্গী—আর সংবেদনশীল একটি হৃদয়।

ভালো লাগলো নরেনের সবটা। নরেন একটু হেসে বললে, "এদের গরীব বাসাটা তোমার খুব ভালো লেগে গেছে দেখছি।"

"দাদা প্রথম দিন বলেছিল—ওই না-কি তার স্বর্গ।" শান্তা বললে, "আজ মানি—ওটা স্বর্গই বটে।"

নরেন অন্যমনে বললে, "তোমার দাদার সংসার গরীব—ঠিকই। আরও গরীব—আরও দুর্বিপাকে পড়া পরিবার আছে। এই যেমন আমাদের ছাঁটাই দু'একজন কেরানী। চরম দুঃখের মধ্যে তাদের নতুন ধরনের সংসার দেখলে তুমি আরও খুশি হতে শান্তা।"

শান্তা অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে বললে, "দেখতে আমার ভারি ইচ্ছে করে। যাওয়া যায় না?"

"নিশ্চয়ই।" নরেন বললে, "একদিন নিয়ে যাবো তোমাকে একজনের বাড়ি। যাকে তুমি ওই স্বর্গ বলছো—দেখিয়ে আনবো। দেখবে—দারিদ্র্য বা অনটনের মধ্যে মানুষ মানুষের কত কাছাকাছি আসতে পারে। বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠছে সেই স্বর্গ।"

২৫

অবনীর নতুন বাসায় শান্তার আগমন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ালো। সুধা বোঝে—কতো বড় একটা চাপা আগ্রহ নিয়ে আসে সে প্রতিদিন। পেছনের বারোয়ারী চাতালে বিকেলের ছায়া নামলেই সুধা বুঝতে পারে—এবার সময় হলো শান্তার আসার। তার কিছু পরেই এসে পড়ে অফিসফেরতা নরেন, তারপর অবনী। ঘনায়মান ছায়া দেখে সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে বাইরের দরোজার কড়া নাড়ার জন্যে। কিন্তু সেদিন বড় অসময়েই কড়াটা নড়ে উঠলো। সুধা দরোজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়ালো। সামনে শান্তা নয়—কল্যাণী, পেছনে একটা ঝাঁকামুটের মাথায় সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় যতো বাজার—মাখন বিস্কুট থেকে শুরু করে শাড়ি-ধুতিটি পর্যন্ত।

সুধা অস্ফুট কণ্ঠে সবিস্ময়ে শুধু বললে, "কল্যাণীদি!"

"তাই বটে।" কল্যাণী একটু হেসে বললে, "জিনিসপত্তরগুলো আগে তুলে রাখো। তারপর না হয় তাড়িয়ে দিও হতভাগী কল্যাণীকে।"

"দিদি!" সুধা হাত চেপে ধরলো কল্যাণীর। সাদরে টেনে নিল তাকে ঘরের মধ্যে।

"বাবা, এই ঘর! অন্ধকার—ঠাণ্ডা-স্যাঁৎসেঁতে! তোমাদের সব অসুখ করবে—বলে দিলাম।" অত্যন্ত সহজ ভাবে কথা বলে কল্যাণী, কোথাও তার দ্বিধা সংকোচ নেই। বললে, "কই—রান্নাঘর কোন দিকে?"

বলতে বলতে সে ভেতরের এক চিলতে দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেল—যেদিকে সুধার রান্নাঘর। না, রান্নার কালি আজও কোথাও পড়েনি। কল্যাণী দেখলো সবই—বুঝলো সবই। মুখটা তার হয়ে গেল বিষাদ গম্ভীর। বললে, "আজও রান্না হয়নি তা হলে।"

তার সামনে সুধা আর দাঁড়াতে পারলো না। ছুটে পালালো। দু'চোখ জলে ভরে এলো তার। চোখ ঢাকলো দু'হাতে। ফোঁপাতে লাগলো বালিশে মুখ গুঁজে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কল্যাণী তার পাশে গিয়ে বসলো। মুখে তার আর কোনো কথা যোগাল না। আস্তে আস্তে সে সুধার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। নিঃশব্দ এই সঙ্গ ও স্পর্শটুকুর মধ্যে দিয়ে এই দুটি নারী যেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ হৃদয়ের উষ্ণতাকে একান্ত নীরবে অনুভব করতে লাগলো। কল্যাণী আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, "তোমার চিঠি পেয়ে আমার কি রাগ যে হয়েছিল বউদি—তোমার ওপরেই আমার রাগ হয়েছিল বেশী। তুমি চলে এলে কেন? ভেবেছিলুম—যাক, রাখবো না তোমাদের কোনো খবর। তারপর কাল শান্তা গিয়ে যখন মায়ের কাছে তোমাদের এই সব গল্প করছিল—তখন আর থাকতে পারলুম না।"

এমন সময় কড়া নড়ে উঠলো আবার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে অবনীর মৃদু কণ্ঠের ডাক, "সুধা!"

বিদ্যুৎস্পর্শচকিত সুধা ভয়ার্ত চোখে তাকালো কল্যাণীর দিকে। কান্নার মতোই শোনাল তার কথা, "তুমি কেন এলে দিদি!"

তারপর সে তাড়াতাড়ি শাড়ি কাপড়ের প্যাকেটটা তার ভাঙা তোরঙ্গের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে জিনিসপত্রের ঝুড়িটা টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরের এক কোণে। কল্যাণীকে ঠেলে নিয়ে গেল সেই রান্নাঘরের দিকে। তারপর শেকল তুলে দিলে ওদিককার দরোজায়।

ও-দিকে বেড়ে চলেছে অবনীর অসহিষ্ণু হাতের কড়া নাড়া।

চোখ মুখ মুছে সুধা মুহূর্তের মধ্যে সংযত হয়ে নিলে। তারপর দরোজা খুলে দিলো।

ঢুকলো অবনী ও নরেন।

নরেন সকলরবে বলে উঠলো, "জয় হোক সুধা বউ ঠাকরুন। অবনীর চাকরির ভোজটা তা হলে আজই হয়ে যাক।"

এ যেন এক অবিশ্বাস্য সুখবরের বিদ্রূপ। সুধা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইলো।

অবনী হেসে বললে, "যা হোক, আপাতত একটা জুটে গেল সুধা। কিন্তু পকেটের মধ্যে আজ তোমার বাজারের থলেটা একেবারে লজ্জায় লুকিয়ে আছে। ভাঁড়ারে তোমার কিছু থাকে তো করো।"

"ছি ছি অবনী।" পকেট থেকে টাকা বের করতে করতে নরেন বললে, "বাজারের পাশ দিয়েই এলুম—তুমি একটা রাসকেল, কিছু বললে না তো!"

সুধা নীরস কণ্ঠে বললে, "থাক নরেন বাবু, হয়ে যাবে কোনো রকমে। আপনারা বসুন।" বলে সে সন্তর্পণে রান্নাঘরের দিককার দরোজা খুলে বেরিয়ে ঝট করে শেকল তুলে দিলে ওপাশ থেকে। হতাশ হয়ে দাঁড়ালো কল্যাণীর সামনে গিয়ে।

কল্যাণী তখন নিশ্চিন্তে ঝুড়ির জিনিসপত্র মেলে বসেছে। মুখে তার না আছে দ্বিধা, না আছে ভয়। বরং হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনার চাপা কৌতুক একটা যেন তার মুখে। হাসিমুখে মৃদু কণ্ঠে বললে, "দাদার চাকরি হলো?"

"হলো তো।"—আনন্দ কোথায়, সুধার তখন কান্না পাচ্ছে।

কল্যাণী হেসে বললে, "তুমি উনুন ধরিয়ে দাও বউদি। ওদের খেতে দাও আগে। আচ্ছা—একটা রুটি আনানো যায় না? ওমা, ওই দেখো, বিস্কুটই তো আছে।"

সুধা প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে, "সবই তো হয় দিদি, কিন্তু—"

কল্যাণী নিঃশব্দে হেসে বললে, "তবে আর কি! এখন বিস্কুটের টিনটা কাটো। ওই মাখনের কৌটো।—"

কল্যাণী এমন ভাবে কথা বলে যেন কিছুই ঘটেনি।

ঘরের ভেতর থেকে সব কথাই ভেসে ভেসে আসে এই রান্নাঘরের কোণটুকুতে, ওদের দুই বন্ধুর কথাবার্তা, হাসি—বেকারের প্রথম চাকরির আনন্দ আর উত্তেজনা।

ওদের মধ্যে সহসা শোনা যায় শান্তার গলা। সে-ও এসে পড়েছে যথারীতি। শান্তা বললে, "কই—বউদিকে দেখছিনে যে!"

অবনী বললে, "আয়—বোস। তোর বউদি রান্নাঘরে!"

সুধার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে—পাছে সে এসে আবার এদিকের দরোজায় ধাক্কাধাক্কি করে।

এই সময়ে শোনা গেল—নরেন ঠাট্টা করে শান্তাকে বললে, "গরীব অবনীর গোলক ধাঁধাঁ দেখছি রোজই তোমাকে টান মারছে শান্তা।"

"আমি যে গরীব মানুষ।" শান্তা জবাব দিল, "বড়লোকদের মেজাজের সঙ্গে তাল দিতে পারিনে বলেই তো পালিয়ে পালিয়ে আসি।"

সুধা মুখ শুকনো করে তাকালো কল্যাণীর দিকে। কল্যাণীর সেই বিষণ্ণ সুন্দর মুখটা—তার সঙ্গে এখন মিশেছে একটা অন্যমনস্ক ঔদাসীন্য। একমনে সে তখন খাবারের থালা সাজাচ্ছে। সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে বললে, "যাও বউদি—ওদের খেতে দিয়ে এসো।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুধা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ালো। সন্তর্পণে শেকল খুলে খাবারের থালা নিয়ে এলো এ ঘরে।

নরেন সে থালার দিকে চেয়ে হৈ-হৈ করে উঠলো, "ইস—সুধা বউঠাকরুন সত্যি সত্যি দেখি একটা ভোজ দিয়ে দিলে! আহা, তোমার নিজের কাজটি যখন হবে তখন না জানি আরও কতো জিনিস খাবো।"

অবনী একবার থালা আর একবার সুধার মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, "এ সব আবার কোন স্বর্গ থেকে আমদানি করলে সুধা!"

"ম্যানেজ তুমি একাই করো কি-না।" বলে সুধা আর দাঁড়ালো না। সমস্ত মন তখন পড়ে আছে তার রান্নাঘরের কোণটুকুতে। সে তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে আবার ওপাশ থেকে শেকল তুলে দিয়ে কল্যাণীর কাছে ফিরে এলো।

ঘরের ভেতর থেকে নানান কথা ছিটকে ছিটকে আসে। বিশেষ করে অবনীর সেই বাঁকা প্রশ্ন আর শান্তার তীক্ষ্ণধার জবাব—সুধাকে তটস্থ করে তোলে।

অবনী বললে, "তারপর, তোদের বড় বাড়ির খবর কি বল।"

শান্তা একটু হেসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "খবর আজকাল নিত্যি নতুন। এই তো একটা ড্রেসিং টেবিল এলো।"

অবনী সহজ ঠাট্টায় বললে, "আহা, তাতে তুইও তো মুখ দেখবি—সাজগোছ করবি।"

"আমাদের আবার সাজগোছ।" শান্তা হেসে বললে, "এ-ই মস্ত বড় আয়না—মাথার চুলটি থেকে পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত যদি না দেখা গেল তো আর কি হলো। সাজগোছ সায়েবের পছন্দ হওয়া চাই তো!"

অবনীর আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

শান্তা কিন্তু বলে চললো, "আমরা গরীব মানুষ—আমাদের কথা কে ভাববে দাদা। আমরা সায়েবের মোটরে চড়ে ঘুরেও বেড়াই না, রাত দশটায় হাওয়া খেয়েও ফিরি না।"

অবনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভয়ানক কর্কশ শোনায়। বললে, "ও কি আজকাল অফিসের মোটরও পেয়েছে না কি?"

শান্তা তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচামারা গলায় বললে, "সে কথা নরেনদাকে জিজ্ঞেস করো—উনিই ভালো জানেন।"

কল্যাণীর মুখটা একটু একটু করে যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে সুধা বিচলিত। একটা চাপা যন্ত্রণায় সে উঠে দাঁড়ালো।

আবার শোনা যায় ও-ঘরের কথা।

শান্তা সকৌতুকে বললে, "দাদার চাকরি হতে না হতেই বউদির ভালো ভালো শাড়ি কিনে ফেললে দেখি।"

"শাড়ি! কোথায়?" অবনীর কণ্ঠে বিস্ময়।

"ওই তো"—

সুধার বুক কেঁপে উঠলো। হায়, শাড়ির প্যাকেটটা সে তোরঙ্গের ওপরে তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছে!

ও ঘরে আসন্ন একটা ঝড়ের আভাস কল্পনা করে উত্তেজিত সুধা কল্যাণীর হাত ধরে টেনে তুললো, "আর না—আর একটি মুহূর্তও না দিদি, তুমি আর এসো না—আমরা মরেও যদি যাই। চলো—ওঠো।"

শুকনো উদাসীন চোখ দুটো ভিজে উঠলো কল্যাণীর।

পেছনের দরোজা একটা দিয়ে বার করে দেওয়ার জন্যে সুধা কল্যাণীকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চললো। আজকের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক এই অবস্থাটা তার ভেতরে বাইরে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়েছে। বললে, "আমাদের কথা একেবারে ভুলে যেও তুমি। তোমার মনের মতো করে মানুষ করো বরং মিলু বিলুকে—দেখো, তারা যেন বেইমান না হয়।"

তারপর তার নারীসুলভ প্রাণ ঢালা আবেগের মাথায় হেঁট হয়ে কল্যাণীকে একটা প্রণাম করতে করতে বললে, "একটা শেষ প্রণাম করতে দাও দিদি। আমি জন্মান্তর জানিনে, ভাগ্য জানিনে কল্যাণীদি। মনে মনে শুধু এই কামনা করি, এবার যেন তোমার বোন হয়ে জন্মাবার ভাগ্য আমার হয়।"

ওদিকে রান্নাঘরের দিকে দরোজায় ধাক্কা এবং অবনীর তর্জন গর্জন তখন সমানে ফেটে পড়ছে। সুধা তাড়াতাড়ি কল্যাণীকে বিদায় দিয়ে দরোজা খুলতে ছুটে এলো।

দরোজা খুলে দিলে।

অবনী সগর্জনে বললে, "দরোজা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন ?"

"ধোঁয়া যাবে বলে।"

"এ কাপড়-চোপড় কে দিয়ে গেল ?" অবনী সক্রোধে শাড়ি কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে ধরলে সুধার সামনে।

ভয় পাওয়া সন্ত্রস্ত মুখটা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠলো সুধার। শুকনো গলায় বললে, "কল্যাণীদি।"

"তা আমি আগেই বুঝেছি।" অবনী সক্রোধে বললে, "এই ভিক্ষের দানকে লাথি মেরে ফেলে দিলে না কেন ?"

"ভিক্ষের দান কেন হবে!" সুধা অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "এ তার স্নেহের দান, ভালবাসার দান।"

"সুধা!" অবনী ধমকে উঠলো।

সুধা কঠিন কণ্ঠে বললে, "না, আজ তুমি ধম্‌কে আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে তোমাদের সকলের ঈর্ষা, অক্ষমতার—দারিদ্র্যের ঈর্ষা।"

"না—ঘৃণা।" অবনী আর একটা কথাও না বলে সবেগে চলে গেল সুধার সামনে থেকে। ঘরে গিয়ে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলে শান্তার দিকে। বললে, "বলে দিস—তার দানের প্রত্যাশী আমরা নই। রাস্তায় অনেক ভিখিরী আছে, তাদের দিতে বলিস।—আশ্চর্য তার স্পর্ধা!"

সেদিন বিকেলের বৈঠকটা এমনি করে ভেঙে গেল।

যাওয়ার সময় শান্তা বিকৃত গলায় নরেনকে বললে, "এ আবার এক ঢং। দিদির কি দরকার ছিল—ওদের মধ্যে এসে আবার ঝগড়া বাধাবার!"

নরেন কোনো কথা কইলে না। নীরবে সে শুধু শান্তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো ঘাড় নীচু করে।

২৬

অবনীর কথিত স্বর্গটা সেদিন অন্ধকারে স্তব্ধ। রাত তখন গভীর। গলিটা নিঃসাড়। সুধা জেগে বসে আছে তখনো জানালার গরাদ ধরে। এ গলির নেড়ি কুকুরটা অন্ধকারে কোথায় তার সযত্নে রক্ষিত শুকনো হাড়টা চিবোচ্ছে আস্তে আস্তে—তার জান্তব কুৎসিত শব্দটা অন্ধকারকে বীভৎস করে তুলছে যেন।

অবনী একা একা বিছানায় কিছুক্ষণ ছটফট করে উঠে বসলো। তাকিয়ে রইলো সুধার দিকে—চেষ্টা করলো তার মুখের ভাবটাকে বোঝার। কিন্তু কিছুই যেন বোঝা গেল না। সুধা যেন তার গভীর স্তব্ধতার মাঝখানে অন্ধকারে অতলস্পর্শী হয়ে বসে আছে। আজ হঠাৎ এ বাসায় কল্যাণীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে সেই যে সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে—তারপর থেকেই দু'জনে গম্ভীর নিস্তব্ধ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলছে নিঃশব্দ একটা আলোড়ন।

আস্তে ডাকলো অবনী, "সুধা!"

সুধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন জেগে উঠলো। বললে, "বলো।"

অবনী বললে, "রাত অনেক হয়েছে।"

"আসছি।"—বলে এক ভাবে সে কিন্তু বসেই রইলো।

অবনী ওর কাছে এগিয়ে এলো। কিছুটা ক্ষুব্ধ গলায় বললে, "তোমার হলো কি বলো তো?"

"কি হবে!" সুধা বললে শুধু।

"বদলে গেছ।" অবনী সক্ষোভে বললে, "সে তুমি আর নেই।"

"সে তো তুমিও নেই।"

অবনী একটু চুপ করে রইলো। তার পরিবর্তন যে একটা হয়েছে এবং ঝোঁকের মাথায় সেটা কিছুটা ইচ্ছাকৃতও বটে। তার সেই স্বর্গের চাবিকাঠির সন্ধানকে উপলক্ষ্য করে খানিকটা ক্ষোভে,

খানিকটা অভিমানে নিজেকে সে সুধার কাছ থেকে দূরে দূরে রেখেছে। সেই গূঢ় অভিমানটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে অবনী যেন নীরবে তার কৈফিয়ৎগুলো জড়ো করলো। বললে, "নরেন আর শাস্তার কাছে সেদিন অনুযোগ করেছ—শুনেছি। কিন্তু গরীব মানুষ আমি, পেটের ধান্ধায় ঘুরতে তো হবেই—না-কি?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে?" অবনী বললে, "তা ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে মরি কেন? সে তো তোমারি জন্যে। বোঝ না—তোমাকে আমি সুখী দেখতে চাই?"

কিন্তু সুধার কানে লাগে কথাগুলো—ঠিক এমনি দরাজ আবেগঢালা গলা শুনেছিল সে আরও একজনের—সে কল্যাণী। অবনীর মতো, কল্যাণীর কথাতেও ফাঁকি ছিল না কোথাও এ সে জানে; কিন্তু ওই কথাগুলো তখনও যেমন মনে করিয়ে দিয়েছে—সুধা একটা নিরুপায় বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনি আজও তার মনে হলো—তার জন্যে একটা লোকের পরিশ্রমের অন্ত নেই। এই পরিশ্রমে সে লোকটার আত্মতৃপ্তি যতটা থাক, সুধার দিক থেকে অসংকোচ গৌরব কোথায়? সুধা বললে, "ও বাড়িতে কল্যাণীদিও এমনি বলতো।"

"মানে?"

"ওতে বোধ করি সত্যিই আর একজনের সুখ নেই। তুমি কি ও বাড়িতে সুখী ছিলে?"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"আর কিছু নয়—মানুষের মান-অপমান, আনন্দ আর সুখের কথা বলছি।" সুধা তেমনি আত্মগত ভাবে কাছে থেকেও যেন বহু দূর থেকে কথা বলতে লাগলো। জীবনের পরিসর তার সামান্য কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরা। তার কথায় লাগলো সেই অভিজ্ঞতার সুর। সে বলে চললো, "তুমি যাকে আজ অপমান করে তাড়িয়ে দিলে—সেই কল্যাণীদির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানি আমি—সকলের জন্যে তার

আত্মবিসর্জন, তাও জানি। জানি তার আনন্দ আর সুখ। তাতে তার ফাঁকি ছিল না কোথাও—কিন্তু আমরা তাতে স্বস্তি পাইনি। বরং সবটা তোমাকেও বিঁধেছিল—আমাকেও বিঁধেছিল দিনের পর দিন।"

"বিঁধেছিলই তো।" অবনী সোজা কথায় বললে, "ওর ওই চাকরির দেমাক আর মাতব্বরী—"

সুধা বাধা দিয়ে বললে, "না,—তাকে আর যাই বলো—দেমাক বা অহংকার বলো না। সে সত্যি সত্যি সকলের বোঝা মাথায় তুলে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে তার আনন্দ আর গৌরব যতোটাই থাক—আমাদের আনন্দ বা গৌরব এতোটুকুও ছিল না। আজ ভাবি, সত্যিই সে কী ছিল—কতো বড় ছিল।"

"ও।" অবনী যেন এতক্ষণে সুধার কথা থেকে তার আসল মতলবটা বুঝে ফেললে। সে মতলব আর কিছু নয়—যেন কল্যাণীর প্রশস্তি। রাগ করে বললে, "তবে চলে যাও তুমি তার কাছে।"

"যাবো—তবে বোঝা হয়ে আর যাবো না।" সুধা নীরস কঠিন কণ্ঠে বললে, "যদি তার মতো কোনোদিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারি, যদি তার মতো অতো বড় করে আত্মবিসর্জন করতে পারি—তবেই গিয়ে দাঁড়াবো তার কাছে। নইলে তোমার মতো হয়তো তাকে ছোট করে ফেলবো।"

অবনী ক্ষুব্ধ ক্রোধে বললে, "আমার মতো?"

"হ্যাঁ, তোমার মতোই।" সুধা জোর দিয়ে বললে, "যে আত্মনির্ভর নয়—তার আত্মবিসর্জনেরও যে কোনো মূল্য নেই—এই কথাটা প্রতিটি দিন ধরে বুঝতে পারছি তোমার এই নতুন বাসায় এসে।"

অবনী হিংস্রভাবে বললে, "বুঝেছি, কল্যাণী এসে আজ তোমার মাথা বিগড়ে দিয়ে গেছে।"

সুধা তীব্রকণ্ঠে বললে, "ছিঃ, যাকে চেন না তাকে খাটো করবার চেষ্টা করো না।"

"দেখচি, তুমিই শুধু চিনেছ।" অবনী বললে, "ওরা সবাই ভুল করেছে—শান্তা, নরেন—ওরা"—

অবনীর কথা শেষ হলো না—সুধা বাধা দিয়ে বললে, "শান্তা! শান্তা কিসের জ্বালায় দিনের পর দিন ধরে এখানে বিষ ছড়িয়ে যায়—সে আমি জানি। জানি—নরেনবাবুরও জ্বালাটা কোথায়। কিন্তু তুমি ভুলে যাও কি করে তার সব কথা।"

"আমি ভুলতে চাই—তার নাম একেবারে মুছে দিতে চাই জীবন থেকে।"

"অকৃতজ্ঞ! যে তোমার ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ সব ঘিরে ছিল একদিন। যে তোমার দুর্দিনে বোঝা টেনে নিয়ে গেছে হাসি মুখে। আমাকে নিয়ে যেদিন বিপদে পড়েছিলে—কে সেদিন সাহস দিয়েছিল, সাহায্য দিয়েছিল তোমাকে? দিনের পর দিন কে টেনেছিল তোমাদের ওই অতোবড় সংসারের চাকাটা?"

এতোগুলো সত্যি কথার সামনে অবনী বোধ করি আজ থতমত খেয়ে চুপ করে রইলো। আর কোনো কথা যোগালো না তার মুখে।

সুধা বললে, "ভুলবে তুমি তাকে! ওই তো, কবে অসুখ হওয়ার পর থেকে কি টনিক খেয়েছিলে তুমি—আজও সে সেটি মনে করে দিয়ে গেছে! শুনেছে না কি, তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। বেইমানী করে তুমি ভুলতে পার—সে কিন্তু কিছুই ভোলেনি।"

হঠাৎ যেন বিচলিত হয়ে ওঠে সহজ অবনী। টনিকের সেই বোতলটার দিকে একবার তাকিয়েই নীরবে মুখ নীচু করে শুধু সে পায়চারী করতে লাগলো। তারপর অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে দাঁড়ালো গিয়ে সুধার সামনে—তার হাত দুটো মুঠো করে ধরে বললে, "আমাদের সামান্য এই গরীব ঘরটুকু থেকে ওসব কথা একেবারে মুছে ফেল সুধা। কে কবে কি ছিল—ভুলে যাও। আমি ভুলতে চাই। এখানে প্রতিদিনের অভাব অনটনেও আছে আমার স্বর্গের আনন্দ—সেই আমার পরম সত্য।"

"স্বর্গ! আনন্দ! স্বার্থপর!" সুকঠিন বিদ্রূপে সুধা বলে উঠলো, "আজ বুঝেছি—এ আমার লজ্জা, আমার অপমান।"

"সুধা!" অবনী যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। আর কিছু সে বলতে পারলো না—বেদনায় ও বিস্ময়ে চেয়ে রইলো শুধু সুধার দিকে।

সুধা বললে, "কল্যাণীদির যে আত্মোৎসর্গের আনন্দে ও-বাড়ি থেকে একদিন মন আমার লজ্জায় অপমানে কোথাও না কোথাও ছুটে পালাতে চেয়েছিল—তেমনি আবার আজও মন আমার পালাই পালাই করছে!"—

কিন্তু কোথায় যাবে সে!—

সে যাক আর না যাক—স্বর্গভ্রষ্ট অবনী আজ বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে। সুধার স্পষ্ট কথাগুলোয় তার উদয়াস্ত পরিশ্রমের আনন্দ আজ শুকিয়ে বিরস হয়ে গেল। মনে পড়লো তার স্বর্গ-কল্পনার অনেক কথা। একদিন শুরু হয়েছিল তা কল্যাণীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেকারের হীনমন্যতা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিল সে সেখান থেকে। তারপর সুধাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তার ভরাট কল্পনা। কিন্তু নিষ্ঠুর দুর্মূল্য দিনের নিঃশব্দ পীড়নে সুধার সংসারেও সে স্বর্গ তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার স্বর্গসৃষ্টির আত্মতুষ্টি কখন আঘাত করেছে সুধার নতুন জেগে ওঠা আত্মসম্মানবোধে। সেই মুহূর্তে কেবলি অবনীর মনে হয়—সব তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় করুণভাবেই মনে মনে বলে সে—তার স্বপ্নের তার কল্পনার কোনো মূল্য নেই, সে-সবের কোনো অস্তিত্ব নেই যেন জগৎ সংসারে।

অন্ধকারে চোখ রেখে অবনী ভাবতে লাগলো।

সে অন্ধকারে কড়মড় করছে শুধু সেই শুকনো হাড় চিবানোর শব্দটা। দারিদ্র্যপীড়িত নীরস একটা জীবনখণ্ডের মতো। শুকনো হাড়ের মতো সেটা যেন পড়ে আছে ওদের সামনে।

অন্ধকারে সেই দিকে চোখ মেলে সুধাও বসে আছে। কল্যাণীকে কেন্দ্র করে আজ যে নাটক ঘটে গেল—তাতে মন তার আলোড়িত। সেই আলোড়ন থেকে সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নরেনের ক্ষোভ, শান্তার ঈর্ষা, অবনীর হীনমন্যতা—সবটা আজ তার কাছে স্পষ্ট! এর মধ্যে পড়ে মন ছটফট করে তার—যদি সে কল্যাণীর মতো সমস্ত ক্ষুদ্রতার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো, যদি সে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারতো! কিন্তু কাজ কোথায়? অপচয়ের ক্ষুদ্রতা থেকে, নারী-জীবনের এই তুচ্ছতা ও হীনমন্যতা থেকে বাঁচার পথ কোথায়?

হাড় চিবোতে চিবোতে গলির কোণে নেড়ি কুত্তাটা গোঁ গোঁ করে উঠলো। বোধ করি তার কোনো স্বজাতীয় সেই সামান্য শুকনো হাড়টুকুই এসেছে কেড়ে নিতে। অন্ধকারে দেখা গেল না।

২৭

বিকেলটার জন্যে একটা উন্মন প্রতীক্ষা শান্তাকে সারাদিন এ-বাড়িতে উৎকণ্ঠিত করে রাখে। একটু কথা, একটু ছোঁয়া, পরিপূর্ণ একটি দৃষ্টি এ-বাড়িতে তাকে যেন অনুক্ষণ অনুসরণ করে ফেরে। বিকেলটার জন্যে ছটফট করে সে।

রোদের ছায়া একটু ম্লান হয়ে এলেই তাড়াহুড়ো পড়ে যায় তার। বেশ কিছুদিন ধরে এটা লক্ষ্য করেছেন মহামায়া। মহামায়া আর ঠেকাতে পারেন না তাকে রান্নাঘরের কাজে। রান্নাঘরের ধোঁয়া পোড়া ঝলসানো চিহ্নগুলোকে স্নানের জলে ধুয়ে মুছে সাজগোছের জন্যে কল্যাণীর ঘরে এসে খিল দেয় শান্তা।

সেদিন মহামায়া বললেন, "মিলু বিলুকেও সঙ্গে নিয়ে যা না।"

"আজ না মা।" শান্তা বললে, "নরেনদা আজ আমায় এক জায়গায় নিয়ে যাবেন।"

"স্বর্গ! আনন্দ! স্বার্থপর!" সুকঠিন বিদ্রূপে সুধা বলে উঠলো, "আজ বুঝেছি—এ আমার লজ্জা, আমার অপমান।"

"সুধা!" অবনী যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। আর কিছু সে বলতে পারলো না—বেদনায় ও বিস্ময়ে চেয়ে রইলো শুধু সুধার দিকে।

সুধা বললে, "কল্যাণীদির যে আত্মোৎসর্গের আনন্দে ও-বাড়ি থেকে একদিন মন আমার লজ্জায় অপমানে কোথাও না কোথাও ছুটে পালাতে চেয়েছিল—তেমনি আবার আজও মন আমার পালাই পালাই করছে!"—

কিন্তু কোথায় যাবে সে!—

সে যাক আর না যাক—স্বর্গভ্রষ্ট অবনী আজ বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে। সুধার স্পষ্ট কথাগুলোয় তার উদয়াস্ত পরিশ্রমের আনন্দ আজ শুকিয়ে বিরস হয়ে গেল। মনে পড়লো তার স্বর্গ-কল্পনার অনেক কথা। একদিন শুরু হয়েছিল তা কল্যাণীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেকারের হীনমন্যতা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিল সে সেখান থেকে। তারপর সুধাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তার ভরাট কল্পনা। কিন্তু নিষ্ঠুর দুর্মূল্য দিনের নিঃশব্দ পীড়নে সুধার সংসারেও সে স্বর্গ তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার স্বর্গসৃষ্টির আত্মতুষ্টি কখন আঘাত করেছে সুধার নতুন জেগে ওঠা আত্মসম্মানবোধে। সেই মুহূর্তে কেবলি অবনীর মনে হয়—সব তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় করুণভাবেই মনে মনে বলে সে—তার স্বপ্নের তার কল্পনার কোনো মূল্য নেই, সে-সবের কোনো অস্তিত্ব নেই যেন জগৎ সংসারে।

অন্ধকারে চোখ রেখে অবনী ভাবতে লাগলো।

সে অন্ধকারে কড়মড় করছে শুধু সেই শুকনো হাড় চিবানোর শব্দটা। দারিদ্র্যপীড়িত নীরস একটা জীবনখণ্ডের মতো। শুকনো হাড়ের মতো সেটা যেন পড়ে আছে ওদের সামনে।

অন্ধকারে সেই দিকে চোখ মেলে সুধাও বসে আছে। কল্যাণীকে কেন্দ্র করে আজ যে নাটক ঘটে গেল—তাতে মন তার আলোড়িত। সেই আলোড়ন থেকে সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নরেনের ক্ষোভ, শান্তার ঈর্ষা, অবনীর হীনমন্যতা—সবটা আজ তার কাছে স্পষ্ট! এর মধ্যে পড়ে মন ছটফট করে তার—যদি সে কল্যাণীর মতো সমস্ত ক্ষুদ্রতার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো, যদি সে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারতো! কিন্তু কাজ কোথায়? অপচয়ের ক্ষুদ্রতা থেকে, নারী-জীবনের এই তুচ্ছতা ও হীনমন্যতা থেকে বাঁচার পথ কোথায়?

হাড় চিবোতে চিবোতে গলির কোণে নেড়ি কুত্তাটা গোঁ গোঁ করে উঠলো। বোধ করি তার কোনো স্বজাতীয় সেই সামান্য শুকনো হাড়টুকুই এসেছে কেড়ে নিতে। অন্ধকারে দেখা গেল না।

২৭

বিকেলটার জন্যে একটা উন্মন প্রতীক্ষা শান্তাকে সারাদিন এ-বাড়িতে উৎকণ্ঠিত করে রাখে। একটু কথা, একটু ছোঁয়া, পরিপূর্ণ একটি দৃষ্টি এ-বাড়িতে তাকে যেন অনুক্ষণ অনুসরণ করে ফেরে। বিকেলটার জন্যে ছটফট করে সে।

রোদের ছায়া একটু ম্লান হয়ে এলেই তাড়াহুড়ো পড়ে যায় তার। বেশ কিছুদিন ধরে এটা লক্ষ্য করেছেন মহামায়া। মহামায়া আর ঠেকাতে পারেন না তাকে রান্নাঘরের কাজে। রান্নাঘরের ধোঁয়া পোড়া ঝলসানো চিহ্নগুলোকে স্নানের জলে ধুয়ে মুছে সাজগোছের জন্যে কল্যাণীর ঘরে এসে খিল দেয় শান্তা।

সেদিন মহামায়া বললেন, "মিলু বিলুকেও সঙ্গে নিয়ে যা না।"

"আজ না মা।" শান্তা বললে, "নরেনদা আজ আমায় এক জায়গায় নিয়ে যাবেন।"

মেয়ের লজ্জাসংকুচিত মুখটার দিকে চেয়ে মহামায়া এক পলকে অনেক কিছু ভেবে নিলেন। কৌতূহলীও হয়ে উঠলেন ভয়ানক। জিজ্ঞেস করলেন, "নরেন বুঝি ওখানে রোজই আসে?"

"আসেন।" চোখ নামিয়ে জবাব দিল শান্তা।

মহামায়া অনেক কিছু আন্দাজ করে নিলেন এক পলকে। ভাবলেন, যাক—হতভাগী মেয়েটার একটা ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়। তারপর হটাৎ যেন একটা ক্ষোভ উথলে উঠলো তাঁর নরেনের জন্যে। বললেন, "সে তো আর কই এ বাড়িতে আসে না!"—

"আমার দেরী হয়ে গেল মা।" বলে শান্তা তাড়াতাড়ি সাজগোজ করবার জন্যে ঘরে দরোজা দিলে।

মায়ের জিজ্ঞাসু খুশী-খুশী মুখটা মনে করে শান্তা যেন নিজের মনের কোন গোপন পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। মায়ের মুখটা মনে করে—ভালো লাগলো তার। নিজেকে দেখলো সে চেয়ে চেয়ে—ভালো লাগলো তার। বিকেল ঘন হয়ে আসছে—ঘন হয়ে আসছে একজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কাল। একটা উচ্ছ্বসিত ভালো-লাগা তাকে মুহূর্তে যেন পরিপূর্ণ করে তুললো। সেই ভালো-লাগা নিয়ে বড় আয়নার সামনে নিজেকে অনাবৃত করে দিল সে আস্তে আস্তে। তার পরিপূর্ণ বক্ষ আর কটিতট, তার জঘন আর উরুদেশ—প্রতিটি অঙ্গ কোন এক দুর্জ্জেয় ভালো-লাগার বন্যায় যেন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। একজনকে অনুভব করলে সে তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে। নিজের দুই বাহুর পীড়নে লজ্জায় সুখে নিজেকে পীড়িত করলো সে, দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলো কিছুক্ষণ—অনাবৃত আনন্দিত। তারপর নিজেকে সাজাতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

সাজগোছ শেষ করে আয়নায় হতাশ হয়ে চেয়ে রইলো সে। হায়—এ তো হলো না। মনে হলো তার—এতো জাঁকজমক করে একটি গরীব কেরানীর বাড়িতে যাওয়া নরেন কি পছন্দ করবে! করবে না—নিশ্চয়ই করবে না। আবার সব খুলে ফেললে সে।

নিজেকে সাজালো এবার সাদাসিধে করে। তারপর বিকেলের মলিন ছায়ার দিকে তাকিয়ে তার সারাদিনের উৎকণ্ঠা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো অবনীর বাসার উদ্দেশে।

কিন্তু কোথায় নরেন! সারাটা বিকেল কেটে গেল তার। বিকেল গড়িয়ে এলো সন্ধ্যে। সেই সন্ধ্যেও উত্তীর্ণ হলো। নরেনের দেখা নেই! অবনীর বাসায় শান্তা উৎকণ্ঠিত আগ্রহে শুধু ঘর-বার করতে লাগলো।

সন্ধ্যে পার করে দিয়ে নরেন এলো শেষ পর্যন্ত।

শান্তা নরেনের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠলো, "বাঃ, বেশ লোক আপনি। আপনার জন্যে আমি সেই কখন থেকে বসে আছি যাবো বলে।"

কোথায় যাওয়া, কেনইবা যাওয়া—এ সবের কোনো কিছুই মনে নেই নরেনের। সে কিছুটা অবাক হয়ে বললে, "কোথায় যাবে?"

শান্তা অধিকতর অভিমানে বললে, "ওমা, কিছুই মনে নেই আপনার! সেই যে বললেন, আপনাদের কোন কেরানীর বাড়ি নিয়ে যাবেন দেখাতে—"

এতক্ষণে মনে পড়লো নরেনের। বললে, "ও-হোঃ, তাই তো!"—

নরেনের এই এতোবড় একটা ভুল শান্তার ভালো লাগলো না। দমে গিয়ে চুপ করে গেল। সেই মুহূর্তে মনে হলো তার—আজকের গোটা আয়োজনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল।

অবনী শান্তার অভিমানক্ষুব্ধ মুখটার দিকে একবার চেয়ে নরেনকে বললে, "যেতে কোথায়?"

নরেন একটু হেসে বললে, "সে আমাদের গরীবের এক স্বর্গ দর্শনে। স্বর্গটা তো শুধু তোমারি একচেটিয়া নয় হে!"

ওই কথাটায় অবনী আজ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সুধার দিকে চেয়ে। গতকালই সে স্বর্গের অবসান হয়ে গেছে।

নরেন অবনীর বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, "সুধা বউঠাকরুন, একটু চা হবে কি?"

সুধা অবনীর দিকে চেয়ে সলজ্জে বললে, "হবে—কিন্তু দুধ নেই।"

"দরকার কি! তাই দাও না। বুঝলে নরেন"—অবনী যুক্তি সাফাই দিয়ে বললে, "দুধ দিয়ে আমরা চা খাই না। দিব্যি লাগে। কি দরকার দুধের? আজকালের এই ভেজাল দুধ—বা গুঁড়ো দুধ, সে কি ভালো?"

"হয়েছে হয়েছে অবনী"—নরেন হেসে বললে, "ওই চা-ই তোমার খাবো। আমি প্রাণপণে মানি, দুধটা অত্যন্ত খারাপ।" বলে তাকালো সে শান্তার দিকে। হেসে বললে, "এই তো ঠিক আমাদের স্বর্গের আভাস—তাকে দেখবার জন্যে আর কোথায় ছুটবে তুমি শান্তা? এই দেখো না, দুধ দিয়ে আমরা চা খাইনে—কারণ দুধটা খারাপ। চায়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিকের বালাই নেই—কারণ ওতে চায়ের স্বাদটাই নষ্ট। উনুনে আগুনই ধরে না—তবু আমরা কালিয়া কাবাব রেঁধে খাই। আমাদের স্বর্গের কথা আর কতো বলবো? অবনী বিড়ি দাও—বিড়ি দাও।" বলে নরেন হাসতে লাগলো।

কিন্তু সে হাসির সঙ্গে অবনী যোগ দিতে তো পারলোই না বরং অধিকতর আঘাতে তার মুখটা কালো হয়ে গেল। এবং তার মুখের দিকে চেয়ে সুধাও সহসা উঠে গেল সেখান থেকে।

নরেন ওদের ব্যাপার কিছুই বুঝলো না। সে বরং আরও একটা টিপ্পনি কেটে বললে, "এক নিঃশ্বাসে স্বর্গটাকে কেমন এঁকে ফেললুম দেখো অবনী। কই—বিড়ি দাও।"

"ওই যে, দেশলাইয়ের মধ্যেই পাবে।" অবনী জামা খুলতে খুলতে বললে, "দুটো আধ পোড়া বিড়ি আছে—ইচ্ছা হলে একটা খেতে পারো।"

নরেন সাগ্রহে দেশলাইয়ের দিকে হাত বাড়ালো।

তার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আধপোড়া বিড়ি একটা নিয়ে শান্তার নাকের ডগায় তুলে ধরে বললে, "আর এই আধপোড়া বিড়ি—ফেলে দিইনে, অতিথির জন্যে সযত্নে তুলে রাখি। এই তো আমাদের স্বর্গের জীবন।"

"এই আমার ঢের ভালো।" শান্তা অবনীর দিকে চেয়ে বললে, "কবে আমি তোমার এখানে আসছি—তুমি স্পষ্ট করে বলো দাদা।"

অবনী আর নরেন তাকালো চোখে চোখে। তারপর অবনী হাসি মুখে বললে, "ওরে থাম—আসবি আসবি। তার আগে তোর ভারটা আর কারুর ঘাড়ে যদি চাপাতে পারি—তো বাস, ম্যানেজ করে ফেললুম।"

অবনীর কথায় চুপ করে গেল শান্তা। আর মনে মনে ভাবতে লাগলো অবনীর হাসি মুখের হালকা কথাটার গুরুত্ব এবং নরেনের সঙ্গে তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময়। তার মনে হলো—এই দুটি বন্ধুর মধ্যে তাকে নিয়ে হয়তো কিছু একটা কথা হয়ে গেছে। নরেনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালো সে—কিন্তু নরেন তখন চায়ের পেয়ালায় গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে অবনীর অর্ধভুক্ত বিড়িটায় চোখ বুজে মৌজ হয়ে গেছে।

একমনে চা খাওয়া শেষ করে নরেন মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—বললে, "এবার তা হলে চলি সুধা বউঠাকরুন। দিব্যি চা খেলুম। যাওয়ার সময় তোমায় সুখবর একটা দিয়ে যাই। তোমার চাকরি হয়ে গেছে।"

অবনী কিছুটা যেন হকচকিয়ে তাকালো একবার সুধার দিকে, তারপর নরেনের দিকে। সুধা যে নরেনকে চাকরির কথা পর্যন্ত বলেছে, তার কিছুই সে জানে না। মনে একটু আঘাত লাগে তাই। অবাক হয়ে বললে, "চাকরি!"

"দস্তুর মতো চাকরি।" নরেন ভঙ্গী করে বললে, "এ-কালের সত্যটাকে তুমিই একেবারে ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ ভাই। সত্যদ্রষ্টা ঋষি তুমি প্রায়—এবার নাম নাও অবনানন্দ! চাকরিতে মেয়েদের পোয়া বারো। আর আমরা হতভাগা, চাকরির সন্ধানে কেউ ঘুরছি হন্যে হয়ে, কেউ ঝুলছি ছাঁটাইয়ের মাথায়। যাই হোক, সুসময়ে হতভাগা নরেনকে মনে রেখো সুধা বউঠাকরুন।"

লজ্জা ও আনন্দের চাপা আভাসে অপরূপ হয়ে সুধা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ সে কথাই বলতে পারলো না। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "সত্যি বলছেন—না-কি—"

নরেন অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললে, "যেমন সত্যি চন্দ্র, যেমন সত্যি সূর্য, যেমন সত্যি—"

এবার সুধা অস্থির হয়ে বললে, "দোহাই আপনার, ভালো করে বলুন।"

নরেন বললে, "আগামী কাল সকালে তৈরী থেকো—তখনি বুঝতে পারবে সত্যি কি-না। আজ ঝাড়া ছুটি ঘণ্টা ধরনা দিয়ে বসে এক মাতব্বরের সঙ্গে সব ঠিক-ঠাক করে এসেছি, তিনি কথা দিয়েছেন।" শান্তার দিকে চেয়ে বললে, "সেইজন্যে আজ আসতে এতো দেরি হয়ে গেল।"

এ কথায় শান্তার খুশী হওয়ার কথা নয়, এর ওপরে আবার সুধার চাকরির খবর। সবটা তার খুবই খারাপ লাগছিল, মুখটা তার গোমড়া হয়েই রইলো।

সুধা সলজ্জ আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায়—কি কাজ ?"

"যা চেয়েছিলে—মাস্টারনি, তবে কর্পোরেশন না। দেশী সাহেবদের মেজাজ বড় ভারি।" নরেন হাসতে হাসতে বললে, "আপাতত একটা ছোট্ট ইস্কুলের শিশু বিভাগে। এখন এইতেই লেগে যাও। তারপর একটু কষ্ট করে খেটে খুটে পড়ে যদি দু'একটা পাস করতে পারো আর একটা ট্রেনিং নিয়ে নিতে পারো—তখন সামনে মস্ত বড় সড়ক খোলা। জয় হোক।"—বলে নরেন যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো। শান্তার দিকে ফিরে বললে, "শান্তা, যাবে না ?"

"চলুন।"

শান্তা নীরবে নরেনকে অনুসরণ করলো। নীরবেই সে হেঁটে চললো নরেনের পাশে পাশে—মুখে তার যেন কোনো কথাই যোগালো না কিছুক্ষণ। সুধার চাকরির খবরটা হঠাৎ কোথায় যেন তার সব গোলমাল করে দিয়েছে এবং একটা চাপা ঈর্ষা তার মনের

মধ্যে ছটফট করছে। তার মনে হচ্ছিলো—এমন একটা খবর নরেন যদি তাকে কোনোদিন দিতো। কিন্তু তার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। নেই বলেই তার ক্ষোভ। এবং এই ক্ষোভটা তার মনের বাঁকা পথ দিয়ে ফুটে বেরুলো শেষ পর্যন্ত। আপন মনে একটু হেসে বললে, "আবার সেই চাকরি! এবার আবার কি হয় দেখুন।—"

"কি হবে!" নরেন ওর কথার ধরন বুঝতে না পেরে তাকালো ওর মুখের দিকে।

শান্তা তেমনি একটু বাঁকা হেসে বললে, "আগেও তো এমনি একজনের চাকরি করে দিয়েছিলেন।—তার তাতে সবাই পুড়ে মরি।"

নরেন চুপ করে রইলো।

শান্তা বললে, "এমনি ছিল কতো পরামর্শ—কিসে তার ভালো হবে না হবে।"—

একটা তীব্র যন্ত্রণার আভাসে নরেনের মুখটা কালো হয়ে উঠলো। কোনো কথাই সে আর বলতে পারলো না।

শান্তা হেসে আবার বললে, "অন্যের ভালো করে করেই আপনার দিন গেল।"—

২৮

গাম্ভীর্য অবনীর ধাতে সয় না। সেটা না ছিল তার চোখে মুখে—না ছিল তার মনে। তবু সেই রকম একটা রসকষহীন ভাব নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তার ভেতর-বাইরেটা আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে চেপে বসছিল। কৈশোর যৌবনের স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। কল্যাণীর কথা এখন একটা তিক্ত স্মৃতি মাত্র। এমন কি, সুধাকে নিয়ে তার যে দরিদ্র অথচ সহজ এক স্বর্গের কল্পনা, তাও ভেঙে দিয়েছে সুধা। ফলে চিরদিন মনের যে আকাশটা তার স্নিগ্ধ না হোক, স্বচ্ছ ছিল—সেখানে মেঘ জমেছিল আশাভঙ্গের, মেঘ জমেছিল কেমন একটা ক্ষোভের—ব্যর্থতার, বিরসতার। এমন কি, তার বহুকাঙ্ক্ষিত

সেই চাকরিটা হওয়ার পরেও—সেই মেঘের কালো ছায়াটুকু কাটেনি। থেমে গেছে তার কাব্য আবৃত্তির গলা, কবিতার বইগুলো মুখ ঢেকেছে আবার সুটকেসে, বাঁশীটা চাপা পড়েছে আবার কোন ছেঁড়া কাপড়ের তলায়—থেমে গেছে তার সহজ রসিকতা। অথচ সুধার সেবা বা সান্নিধ্যের অভাব হয়নি, তেমনি আগের মতো পেয়েছে তাকে একান্ত কাছে, তবু একটা ঠাণ্ডা আনন্দহীনতা বিরাজ করেছে তার চারিদিক জুড়ে। তার মধ্যে অবনী চুপ করে গেছে দিনে দিনে আর মুখে চোখে তার ফুটে উঠেছে একটা ম্রিয়মাণ ছায়া। এই ছায়া নিয়ে চাকরি করেছে সে দশটা-পাঁচটা, ঘুরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে—ঘনিয়ে গেছে সুধার কাছে। মনে মনে বলেছে—জীবন এই রকমই! এমনি করে এ শহরের লাখ লাখ মানুষ—কেরানী, চাকুরে, ভদ্রলোক কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে, যৌবন পার করে প্রৌঢ়ত্বে—বার্ধক্যে গিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে তার স্বর্গের কল্পনার ব্যাপারটা একান্তই ছেলেমানুষী এবং ক্ষণস্থায়ী ও অলীক। কে জানে, এমন সব কল্পনা ও ছেলেমানুষী আর কেউ করে কি-না! এই বাঁধা-ধরা স্বল্প পরিসর জীবন ও অবসরের মধ্যে সে সব ছেলেমানুষীর সময়ই বা কোথায়! ও হলো দু'দিন নতুন বউ নিয়ে অবিবাহিত জীবনের সাধ-আহ্লাদ-গুলোকে একটুকু চেখে দেখা। এমনি করে আনন্দহীন একটা মেঘ জমেছে তার ভেতর-বাইরে জুড়ে।

কিন্তু সে মেঘটাকে জমে ঘনঘোর হতে দিল না সুধার চাকরি। নরেনের চেষ্টায় সত্যি সত্যি তার একটা স্কুল-টিচারি জুটে গেল। উল্টেপাল্টে গেল বাঁধা জীবনের ছক। সুধার নতুন জেগে-ওঠা মনের সহস্র সাধ-আহ্লাদের ঝাপটায় কোথায় উড়ে গেল অবনীর মনের আনন্দহীন মেঘের ছায়া। নতুন সংসারটুকুর জীবন বইতে শুরু করলো নতুন এক খাতে। নতুন একটা মোহ আর আনন্দ যেন এসে বাসা বাঁধে বস্তির ওই অন্ধকার ছোট ঘরটায়।

অফিসে চারটে বাজলেই সবাই কলম গুটোয়—তারপর কাগজপত্র ফাইল এদিক ওদিক করতে করতে বাকি একটা ঘণ্টা কোনো রকমে

কাটলে হয়। সওদাগরী অফিসের মন্থর কর্মধারা। কিন্তু সেদিন পাঁচটা বাজতে চললো—অবনীর ওঠার নাম নেই।

পাশের টেবিল থেকে তারানাথবাবু চশমা মুছতে মুছতে বললে, "কি ভায়া, আজ হলো কি! অন্য দিন চারটে বাজতে না বাজতেই উস্‌খুস করো!—এ্যাঁ, বউমার সঙ্গে ঝগড়া না-কি?"

অবনী একটু হেসে বললে, "না—এমনি।"

"উঁহুঁ", তারানাথবাবু বললে, "লুকোতে পারবে না ভায়া। তোমার মুখ-চোখ বলছে।"

অবনী একটু হেসে বললে, "না—এই একটু কাজ এগিয়ে রাখছি।"

"কি জানি ভায়া।" তারানাথবাবু বললে, "গিন্নির সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে আমাদেরও ওই রকম কতো কাজ বেড়ে যেতো। শুধু কি আপিসে দেরি, আরও পাঁচ জায়গায় মস্ত মস্ত সব দরকারী কাজ সেরে রাত দশটা-এগারোটার আগে ঘরে ফিরতুম না। ওদিকে মাগী ভেবে মরতো নানা দুশ্চিন্তায়।"

আশপাশের ছোকরা কেরানীরা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

অবনী বললে, "তারপর?"

"তারপর আর কি।" তারানাথবাবু এক গাল হেসে বললে, "রাত্তিরে খুব ভাব হয়ে যেতো।"

অবনী শেষ পর্যন্ত বলে ফেললে, "আমার কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়নি তারানাথ দা। আমার স্ত্রী এখানে আসবেন—তাই একটু অপেক্ষা করছি।"

প্রৌঢ় তারানাথবাবু কেমন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বললে, "উনি আসবেন! এই এখানে? বলো কি ভায়া?"—

"সিনেমায় যাবেন—তাই এখান থেকেই"—বলে অবনী একটু হাসলো। তারানাথবাবুর বিস্ময়াহত মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, "উনি নতুন চাকরির মাইনে পেয়েছেন—তাই আমাকে আজ সিনেমা দেখাচ্ছেন।"

"তোমাদের উনি আর ইনির হিসেব আলাদা না-কি ভায়া?"

"না তা নয়—মানে"—অবনী থেমে গেল। ঠিক সুধার সামান্য একটু নির্বোধ খেয়ালকে যে সে কেমন করে প্রকাশ করবে, ভেবে পেল না।

তারানাথবাবু বললে, "কি জানি ভাই, তোমাদের স্বাধীন জেনানাদের কাল, বুঝিনে।" এ ব্যাপারটার আনন্দটুকু ভাবতেও তার ভালো লাগছে—আবার লাগছেও না। যতো হোক, পুরানো এক কালের মানুষ তারানাথবাবু। শেষ পর্যন্ত টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে, "তোমাদের নতুন কালের নতুন ধরন ভাই। দু'জনে মিলে সিনেমায় যাও আর জাহান্নমেই যাও, আমার পাঁচটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন ধরতে না পারলে ওদিকে মাগী আবার ভেবে আকুপাকু করে হামলে মরবে।"

ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। তারানাথবাবুর দিকে চেয়ে ছোকরা কেরানীরা হেসে উঠলো।

অফিস খালি করে চলে গেল সবাই একে একে। অবনী বসে রইলো একা।

খানিক বাদে দারোয়ান এসে খবর দিলে সুধার। কাগজপত্র গুটিয়ে অবনী উঠলো।

সামান্য কটাই বা টাকা—মাত্র এ মাসের দিন পনেরোর মাইনে। কিন্তু সেইটুকুই হাতে পেয়ে সুধার আর আনন্দের সীমা নেই। সিনেমা দেখবে—অবনীকে দেখাবে, এটা কিনবে, ওটা কিনবে। সবটা মিলে কেমন একটা নতুন স্বাদ লাগে জীবনের।

সিনেমা থেকে বেরিয়ে সুধা বললে, "আমার টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনার ছিল—নিউ মার্কেটে নিয়ে চলো।"

"একেবারে নিউ মার্কেট!" অবনী একটু অবাক হয়ে হাসলো।

সুধা সলজ্জে হেসে বললে, "আমি যাইনি কখনো। শুনেছি কতো জনের কাছে। অনেক দিনের ইচ্ছে—"

"চলো তা হলে।"

কেনা হলো জিনিস অবনীরই বেশী—তার জামা, তার রুমাল,

মায় তার একটা সুন্দর সিগ্রেট কেস পর্যন্ত। আর একটা খোকা 'ডল'।

কেনার চেয়ে দেখাই বেশী সুধার। মার্কেট থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো সে। সামনে বিলিতি কেতায় সাজানো একটা রেস্টুরেন্ট—ঝকমক করছে নিওনের আলো, ঝলোমল করছে তার আসবাবপত্র। সুধা চেয়ে চেয়ে বললে, "চলো—চা খাই একটু। অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুই খাওনি তুমি।"

রেস্টুরেন্টে ঢুকলো ওরা। চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে সুধা অদ্ভুত একটা আরামে চোখ বুজলো। কিন্তু এ আরাম তার বেশীক্ষণ রইলো না। চায়ের সঙ্গে কি-ই বা এমন খেয়েছে কিন্তু তার বিল দেখে সুধার মুখ শুকিয়ে গেল। কেনা-কাটার পর যে ক'টা টাকা ছিল তা গুণে দিয়ে বাইরে এসে সে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "অমন জানলে কখ্খনো ওখানে ঢুকতুম না।"

অবনী হেসে বললে, "বাঃ, খাবে—দাম দেবে না!"

"তাই বলে অতো···!" সুধা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "ও আমাদের জন্যে নয়। এখন চলো—হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাই।"

"সর্বনাশ!" অবনী প্রমাদ গুনলে। বললে, "এতো রাত্তিরে এই চার মাইল রাস্তা?—দোহাই তোমার, ট্রামের ভাড়া আমি দিচ্ছি।"

সুধা বললে, "কখ্খনো না—আজ তুমি একটি পয়সাও দেবে না।"

অবনী স্নিগ্ধ চোখে তাকালো সুধার দিকে। আজ ওর নিজের পয়সা খরচ করার আনন্দ। সে আনন্দ যেন উপচে পড়ছে চোখে মুখে। তবু চার মাইল হাঁটার ভয়ে আর একবার বললে, "ট্রাম ভাড়ায় ক'টাই বা পয়সা যাবে!—"

সুধা বললে, "ইস, ও পয়সার বুঝি আর হিসেব নেই! চলো না—কথায় কথায় চলে যাই হেঁটে। জানো—ঘুরে বেড়াতে আজ আমার বড় ভালো লাগছে। এমন করে ঘুরিনি তো কোনো দিন।"

কথাটা কানে লাগে অবনীর। কয়েক পলক সে মুগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো সুধার দিকে।

সুধা কটাক্ষ করে বললে, "মনে রেখো, এখন থেকে একটু হিসেব করে ভেবেচিন্তে চলতে হবে।" তারপর আবার তার সেই আপসোস, "উঃ, কতগুলো টাকা রেস্টুরেন্টে নষ্ট করলুম—ভেবে দেখো একবার।"

টাকার শোকে ম্রিয়মাণ সুধা—হেঁটে সে আসবেই। সেই চার মাইল পথ তার পাশে পাশে হেঁটে আসতে আসতে অবনীর শুধু এই কথাটাই মনে হতে লাগলো—তার নিজেরি খেয়াল-খুশিতে এতোদিন ভাসিয়ে নিতে চেয়েছে সুধাকে কিন্তু তারও যে একটি স্বতন্ত্র খেয়াল-খুশি আছে, হিসেব আছে—অস্তিত্ব আছে, এতোদিন তার এমন পরিপূর্ণ একটি পরিচয় যেন সে পায়নি। আজ পেয়েছে সে জীবনে একজন পথ-হাঁটার সঙ্গী, খেয়াল-খুশির আনন্দের সঙ্গী। শুধু চার মাইল নয়—এমনি জীবনের অনেক…অনেক পথ যেন সে অক্লান্তভাবে হেঁটে যেতে পারে।

পরের দিন ছিল কি একটা ছুটির দিন।

সকালেই নরেন এসে হাজির। কৃত্রিম ক্ষোভে সুধার দিকে চেয়ে বললে, "যাই হোক, তবু দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু এরকম একটা কাণ্ড হবে—আগে জানলে তোমার চাকরি আমি কিছুতেই হতে দিতুম না ঠাকরুন।"

সুধা হেসে বললে, "কেন!"

"কেন!" নরেন সক্ষোভে বললে, "এমন করে সত্যি সত্যি পথে বসিয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ তোমরা! বাড়িতে এসে আর পাইনে। ভেঙে দিলে বিকেলের এমন আড্ডাটা!"

অবনী আর সুধা চোখে চোখে চেয়ে হাসতে লাগল।

অবনীর সামনে ছিল কি একটা হিসেবের খাতা। সেই দিকে চোখের খোঁচা মেরে নরেন বললে, "কি একটা হিসেব হচ্ছিল যেন।"

খাতাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সুধা বললে, "থাক—ও আপনাকে আর দেখতে হবে না।"

নরেন হেসে বললে, "কি অবনী, আবার কোনো প্ল্যান-ট্যান ম্যানেজ করছো না-কি?"

অবনী হো হো করে হেসে উঠলো। এ তার সেই পুরানো হাসির আমেজ—ফিরে এসেছে আবার। অবনী বললে, "না ভাই—প্ল্যান এবার সুধার। কাল থেকে ঘুরে ঘুরে মরছি তার পেছনে পেছনে।"

"বটে বটে!"

"গত মাসের দিন পনেরোর মাইনে পেয়েছে। তারই এ্যাডভেঞ্চার! ছ'জনে কাল বাড়ি ফিরেছি রাত বারোটায়।—সে আবার কি কাণ্ড শোন।"—

"না, কখ্খনো তুমি বলতে পাবে না।" সুধা শাসিয়ে উঠলো।

অবনী হাসতে হাসতে বললে, "মাইনের টাকা পেয়ে হঠাৎ ওঁর খেয়াল হলো—উনি আমাকে সিনেমা দেখাবেন। তাই কাল অফিসে গিয়ে হাজির।"

সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, চড়া বিল, নিউ মার্কেটের বাজার—মায় সেই চার মাইল পথ হেঁটে রাত বারোটায় বাড়ি ফেরা, বলতে অবনী কিছুই বাদ দিলে না। সুধা বসে রইলো লজ্জায় সংকোচে।

ব্যাপার সামান্যই—তবু এর মধ্যে কোথায় যেন একটা অসামান্যতার ছোঁয়া আছে। তাই আশ্চর্য রকম ভালো লাগছে নরেনেরও—ভালো লাগছে ওদের ছ'জনকে। ভালো লাগছে সুধার হঠাৎ জেগে-ওঠা খেয়াল-খুশি—আর অবনীর পরিতৃপ্ত মুখটা। ভালো লাগছে বস্তির এই অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরটা।

নরেন চোখ ফিরিয়ে দেখলো—ঘরটার সাজগোছেরও একটা ছিমছাম পরিবর্তন এসেছে। নতুন জিনিস একটা চোখে পড়লো—বড় একটা খোকা 'ডল'।

নরেন হেসে বললে, "কি অবনী, এবার ওসবও আসতে আরম্ভ করেছে দেখছি যে!"—

সুধা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে পালালো। দরোজার কাছে একটু উঁকি দিয়ে বলে গেল, "আজ আপনি কিন্তু এইখানে খেয়ে যাবেন নরেনবাবু।"

যাওয়ার সময় নরেন সুধাকে বললে, "আর দিন দুই বাদে আমাদের স্ট্রাইক শুরু হচ্ছে ঠাকরুন। এবার এক হাতে লড়াই আর এক হাতে ভিক্ষের ঝুলি। হতভাগাদের চাঁদার তহবিলে তোমার অকৃপণ হাত থেকে যেন দুটো পয়সা বেশীই ঝরে পড়ে।"

সুধা গ্রীবাভঙ্গী করে বললে, "সে আমি আন্দাজ করে আগে থেকেই আলাদা রেখে দিয়েছি। ওর আর আমার—"

নরেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এই বে-হিসেবী হঠাৎ চাকরি পাওয়া মেয়েটার দিকে। স্মিতহাস্যে বললে, "কি বলবো—লক্ষ্মী তোমার ঘরে চিরকাল বাঁধা থাকুন, তোমার হিসেবী-বেহিসেবী হাতটা ঝরে পড়ুক এমনি সবার জন্যে, সকলকে এমনি চিরকাল দিয়ে থুয়ে খেও। তুমি হও আমাদের নতুন কালের নতুন লক্ষ্মী ঠাকরুন।"

সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনায় মেশানো অদ্ভুত একটা মনের অবস্থায় নরেন সেদিন বিদায় নিলে। সারা পথটা শুধু ভাবতে ভাবতে গেল: ওরা সুখী—ওরা পেয়ে গেছে যেন দুর্লভ কোন এক পূর্ণতার সন্ধান।

২৯

শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেল নরেনদের অফিসে।

প্রথম দিন দুয়েকের ঝড়ো ঝাপটায় মেতে রইলো নরেন। তবু এরই মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে ঘুরে যায় অবনীদের বাসা হয়ে। সারাদিন ঝড়-ঝাপটা বিবাদ বিতর্কের পর এখানে ফিরে আসে যেন সে একটা সপ্রেম শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধতার মধ্যে। শান্ত হয়ে আসে উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রী। যতো রাত হোক—অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যায়।

সন্ধ্যের পরে শান্তাও আসে, থাকে কিছুক্ষণ, উসখুস করে—উৎকর্ণ হয়ে থাকে একজনের পদশব্দের জন্যে। কিন্তু সে লোকটা আসতে এতো রাত করে যে তার আর থাকা হয় না। এমনি

না-দেখা-শোনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল ক'দিন। মনের গভীরে তার প্রতীক্ষা আর ধৈর্য দুইই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিনে দিনে।

তারপর একদিন দেখা হয়ে গেল। নরেন ঢুকলো হুড়মুড় করে। এসে প্রতিদিনের মতো বিছানাটায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, "কই সুধা বউঠাকরুন, একটু চা হবে কি?"

রান্নাঘর থেকে সুধা হাসিমুখে উঁকি দিয়ে বললে, "আসছি।"

শান্তা কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল। এই লোকটার আজ দেখা পেয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার চাপা বিক্ষোভ। কিন্তু নরেনের ক্লান্ত রুক্ষ মুখটার দিকে চেয়ে সে থমকে গেল। নরেনের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে একটু হেসে বললে, "বাব্বা, ক'দিন আপনার দেখাই নেই!"

"ফুরসুৎ কই শান্তা।" নরেন বললে, "তবু রাত হলেও—তোমার দাদার স্বর্গটা ঘুরে যাই একবার।"

তারপর যে কি কথা বলবে শান্তা, ভেবে পেল না। অথচ এ ক'দিনে জমে উঠেছে মনের অসংখ্য কথা। সেই জমা কথার চাপ বোধ করি তাকে কিছুক্ষণের জন্যে রুদ্ধকণ্ঠ করে দিলে।

নরেন চা-টুকু শেষ করলে আস্তে আস্তে। তার পর উঠে পড়লো। বললে, "ভয়ানক মাথা ধরেছে। আজ চলি সুধা বউঠাকরুন।"

"ওমা, আমিও যাবো তো।" শান্তাও উঠে দাঁড়ালো।

নরেনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে শান্তার আজও সেই উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা। রোজই যেমন তার মনে হয়েছে—কি জানি, নরেন হয়তো তাকে কিছু বলবে।

নরেন বললে সেদিন, "মেজাজ-টেজাজ বড় বিগড়ে আছে শান্তা, চলো একটু বেড়িয়ে ফিরি আজ। ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না এখুনি।"

শান্তা যেন ধন্য হয়ে গেল। বুক কেঁপে উঠলো তার অকারণ আশংকায়। বললে, "চলুন।"

এসে বসলো ওরা সেই পার্কে—ঘাসের ওপরে, যেখানে নরেন এসে বসেছিল আরও একদিন। সঙ্গে সেদিন ছিল কল্যাণী। শহর

সীমান্তের জনবিরল পার্ক—ঠাণ্ডা অন্ধকারে দূরে দূরে ছড়ানো ইলেকট্রিকের ছোট ছোট আলোকপিণ্ড। তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এলোমেলো গাছের গুঁড়ি। সৃষ্টি করেছে আলো-ছায়ার অন্তরাল। সেই আলো-ছায়ার অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে নরেন যেন নীরবে তার মনের মধ্যেই ওই রকম একটা দাগকাটা জায়গা খুঁজতে লাগলো।

শান্তা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের অফিসের খবর কি? স্ট্রাইক শুরু হচ্ছে কবে?"

"স্ট্রাইক তো কাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। তাই ক'দিন বড্ড কাজের চাপ—নানা দুশ্চিন্তা।"

"ও, তাই আপনার দেরি হয়ে যায় আসতে! আজকে আমি যে কতক্ষণ আশা করে বসেছিলুম।" শান্তার মনের চাপা ক্ষোভটা মিটলো এতক্ষণে। বললে, "আমি বুঝতেই পারিনি আপনাদের স্ট্রাইকের ঝামেলা। যাক, স্ট্রাইকে সবাই নিশ্চয় যোগ দিয়েছে—এক আমার দিদিটি আর তার বড় সাহেবটি ছাড়া?"

"না—আরও কয়েকজন অফিসার আছেন, অফিসের পুরানো বিশ্বাসী চাকরের দলও কিছু আছে।" নরেন বললে আস্তে আস্তে।

"দিদিকে দেখলেন?"

"দেখলুম। অফিস ছুটির পরও কি সব টাইপ করছিল।—তারপর বড় সাহেব ডাকতে উঠে গেল।"

শান্তা মুখ বেঁকিয়ে বললে, "টাইপ না ছাই—ওই বড় সাহেব কখন ডাকবে তাই ঢঙ করে বসে থাকা।" তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, "আমি থাকছি না আর ও-বাড়িতে। এই সব শোনার পর ইচ্ছে হচ্ছে—আমি এখুনি চলে আসি।"

নরেন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

শান্তার বুকের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন চলছে। তার বহু দিনের প্রতীক্ষা, তার কামনা ও আশা—যেটা দীর্ঘদিন ধরে কেবলি ঘুরপাক খেয়ে মরেছে মনের মধ্যে, নিজেকে কেন্দ্র করে কেবলি তার অন্ধ প্রেমকে সহস্রবার ধরে গড়েছে আর ভেঙেছে—সেইটে আজ যেন

সে আর চেপে রাখতে পারছিল না। নরেনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার মতো এমন নির্জন—এমন একান্ত স্নিগ্ধ একটি মুহূর্তও পায়নি সে কোনোদিন। কিন্তু নরেন গম্ভীর, কিছুটা অন্যমনস্ক এবং নীরব। তবু শান্তার সর্ব ইন্দ্রিয় আজ যেন সকলরবে কথা বলে উঠতে চাচ্ছে।

শান্তা বললে, "দাদা একদিন বলেছিল—ওই বস্তির অন্ধকার ঘরটাই তার স্বর্গ। সে যে কতো বড় সত্যি কথা!"—নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগের চাপে শান্তা যেন নিজেই থেমে গেল।

নরেন আস্তে আস্তে বললে, "স্বর্গ বলে ওটাকে তা হলে মানো?"

"মানি বৈ কি।" শান্তা জোর দিয়ে বললে, "অভাব অনটন ওদের আছে ঠিক—কিন্তু ওদের ভালোবাসার কাছে সে সব তুচ্ছ।"

নরেন তেমনি অন্যমনে বললে, "জীবনে ওইটাই কি সব শান্তা?"

নরেনের কথার ধরনে শান্তার মনে হলো, নরেন যেন তাকে পরীক্ষা করছে। জানতে চাচ্ছে—তার ভালোবাসার গভীরতা কতখানি—ধরনটাই বা কেমন। তাই অবনী ও সুধার ভালোবাসাকে একমাত্র অবলম্বন করে সে যেন আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "সব—ওইটাই সব, আমার কাছে ওর চেয়ে বড় আর কিছু নেই।" তারপর সেই আর একদিনের মতো একটু অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বললে, "মুখ্যু মানুষ, বেশী কিছু বুঝিনে হয়তো, কিন্তু ভালো মন্দ কোনটা—এটুকু বুঝতে পারি।"

এ অভিমানের সুর নরেনের লক্ষ্য এড়ায় না। স্নিগ্ধ গলায় সে বললে, "সেটুকুই যথেষ্ট শান্তা। ওইতেই তুমি জীবনে সুখী হবে। ওর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।"

অদম্য একটা উচ্ছ্বাসে শান্তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো। যাকে নিয়ে তার সমস্ত সুখ দুঃখের কল্পনা—সেই লোকটার কাছ থেকে আশীর্বাদের মতো ওই রকম একটা কথা শুনে সে আর নিজেকে আজ যেন ধরে রাখতে পারলো না। উচ্ছ্বাসে আনন্দে আবেগে দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে শুধু বার বার করে বললে, "আমি জানি না—আমি জানি না।" ...

নরেন তেমনি আস্তে আস্তে স্নিগ্ধ গলায় বললে, "আমি জানি।" একটু থেমে আবার বললে, "একদিন তুমিও জানবে।"

কি জানবে শান্তা—কে জানাবে তাকে, কে দেবে তাকে সেই পরম কামনার বস্তু?—সে যে স্বয়ং নরেন! কিন্তু নরেনের কথা থেকে সেই কথাটা সে বুঝতে পারলো না স্পষ্ট করে। তেমনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "ও বাড়িতে আমার একটুও ভালো লাগছে না—একদিনও না।"

নরেনের কণ্ঠ ক্লান্ত—যেন পরিবেশের সঙ্গে, নানা পরিবর্তনের সঙ্গে—এমন কি তার নিজের সঙ্গেও দিনের পর দিন যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত। সান্ত্বনা দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "হবে—তোমার ব্যবস্থা একটা হবে শান্তা। ও বাড়িতে তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি।"

নরেনের গলায় যে সহানুভূতি ও স্নিগ্ধতা ছিল—সেইটাই যেন তাকে ধন্য করে দিলে। নরেনের শেষ কথাগুলোকে সে পরম আশ্বাস বলে গ্রহণ করে চুপ করে বসে রইলো। অন্তর তার পরিপূর্ণ। নরেন একটু নড়ে বসতেই বুকের রক্ত তার হঠাৎ ছলাৎ করে উঠলো। শির্ শির্ করে উঠলো সর্বাঙ্গ। কেঁপে উঠলো ছুটো হাত। তার মনে হলো—হাত ছুটো বোধ হয় এবার মুঠো করে ধরবে নরেন। তারপর ···

কিন্তু না, নরেন বসে রইলো একভাবে—চিন্তামগ্ন চোখে তার কবেকার ধ্যানে কে জানে! ওদের ছ'জনকে ঘিরে সন্ধ্যের অন্ধকার তখন ঘন হয়ে আসছে।

৩০

সেদিন অবনীর নতুন বাসার খিড়কী দিয়ে চোরের মতো বিদায় নেওয়ার পর সারাটা পথ কল্যাণী শুধু এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এসেছিল—এই তার ঠিক হয়েছে। এই রকম চূড়ান্ত একটা অপমানেরও তার দরকার ছিল, এ জগতের প্রেম-প্রীতি বন্ধুত্ব মানুষ-জন চেনার দরকার ছিল তার। এ একরকম তার ভালোই হলো। চূড়ান্ত

আঘাতের লেজুড় ধরে যে তিক্ত বিদ্রূপের ভাব একটা মনুষ্যচরিত্রে স্বভাবতই এসে পড়ে—কল্যাণীর চরিত্রে ও মনে তেমন একটা ভাবের উদয় হতে কিছুমাত্র দেরি হলো না। ঘরে ফিরে এসে বার বার সে নিজেকেই শোনালো—লেখা-পড়া শিখে, চিরকালের নারীভাগ্যের শেকল ভেঙে, শ'কয়েক টাকা মাইনে পেয়ে চারদিকে একেবারে সৌভাগ্যের ছড়াছড়ি তার। প্রেম দিলে তাকে ঘৃণা আর কুৎসা। পরিবার-পরিজনের প্রীতি ও বন্ধুত্বের জ্বালায় প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত আর মা মহামায়া দিলেন বানচাল সংসারের মনোরম ভার। কি সুখের জীবন একখানা তার। ...

ঠিক আছে—বলে সব কিছুকে সে ঝেড়ে ফেলে দিলে। রইলো এক কর্তব্য এখন—অফিস আর ঘর। মনে মনে বললে, এটুকু না থাকলে সে আজ হয়তো মরে যেতো। তারপর প্রায় মহাআক্রোশে সে অফিসের কাজে মন ঢেলে দিলে। যতো হোক—জীবনে কোনো দিন একজন মহা একটা উপকার করেছিল অর্থনৈতিক মুক্তির কথাটুকু বলে।—ভাগ্যে সেটুকু সে পেয়েছে—নইলে আজ অসম্মানিত এক মৃত্যু ছাড়া আর তার কোনো আশ্রয় ছিল না। সেই মুক্তির আশ্রয়টুকু আজ হলো তার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু সেখানেও দিন কয়েকের মধ্যে শুরু হয়ে গেল স্ট্রাইক। তারই মধ্যে পরম আক্রোশে সে অফিসে যেতে লাগলো সহকর্মীদের কুৎসিত টিটকারীর মধ্যে দিয়ে—এক আশ্রয় হুভার সাহেব আর তার হুড-ঢাকা মোটর গাড়িটা।

ধর্মঘটের তৃতীয় দিন। ডিরেক্টর সাহেবদের কি একটা গোপন বৈঠক হয়ে যাওয়ার পর এক হুভার সাহেব ছাড়া সবাই চলে গেল।

সারা অফিসটা নির্জন। কয়েকটা ভুতুড়ে আলো জ্বলছে এখানে ওখানে। খাস কামরার বাইরে শ্রান্ত ক্লান্ত বুড়ো বেয়ারাটা চোখ বুজে বসে আছে একটা টুলের উপর। ঘরের ভেতরে ভারি জুতোর শব্দ একটা শোনা যাচ্ছে শুধু অশান্ত পায়চারিতে।

ধর্মঘটের অফিস। কয়েকটা অফিসার আর কল্যাণীর মতো কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছাড়া সবাই ধর্মঘটের পক্ষে। কলকাতা অফিস টলোমলো—তার তরঙ্গ লেগেছে গিয়ে বোম্বের হেড অফিসে, সেখান থেকে সারা ভারতের কয়েকটা শাখা-প্রশাখায়।

মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে হুভারের—ভারী গম্ভীর মুখটাকে মনে হয় আরও ভারী, আরও গম্ভীর। পায়চারি করতে করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো হুভার। জটিল চিন্তার ঘূর্ণিপাক থেকে যেন চোখ তুলে তাকালো সে কল্যাণীর দিকে।

"মিসেস চ্যাটার্জি!"—

কল্যাণী ঘুরে তাকালো বড় সাহেবের মুখের দিকে।

"তোমাদের নামে আমি হেড অফিসে লিখলুম।—এ অফিস কদর বুঝুক তার যোগ্য কর্মচারীদের—যারা ঝড়-ঝাপ্‌টার মুখে দাঁড়িয়েও অফিসের মর্যাদা রক্ষা করে।"

কে জানে—আরও হয়তো কিছু মাইনে বাড়বে। কিন্তু আজ ফ্যাকাশে মুখে চেয়ে রইলো কল্যাণী। ধর্মঘটী লোকগুলোর ক্রুদ্ধ আস্ফালন আর হুভারের ভারী মুখটা—হঠাৎ যেন আজ তাকে ভীত করে তুলে।

হুভার বললে, "ওই নরেন মুখার্জিই তোমাকে এনেছিল এই অফিসে একদিন—কিন্তু দেখো সেই স্কাউন্‌ড্রেলটার কাণ্ড। সবাইকে ক্ষেপিয়ে আজ সে অফিসের সর্বনাশ করতে বসেছে।"

অসহায় চোখে চেয়ে কল্যাণী বসে রইলো পাথরের মতো।

"জানি—তোমার সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল।"

"ছিল—এখন নেই।" ভয়ে ভয়ে বললে কল্যাণী। মনে পড়লো, এই বন্ধুত্বের কথা আরও একদিন তুলেছিল হুভার।

"স্বাভাবিক, না থাকাই স্বাভাবিক—একটা বদমাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশী দিন রাখা যায় না।" হুভার একটু থেমে বললে, "কিন্তু অফিসের স্বার্থে, আমাদের সকলের স্বার্থে তোমার পুরানো বন্ধুত্বটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে যে কল্যাণী।"

কল্যাণী সভয়ে তাকিয়ে রইলো। কথাগুলো যেন হাতুড়ি পিটতে লাগলো তার বুকের মধ্যে। কি করবে সে—কি করতে হবে তাকে।

"জানি ওই স্কাউন্ড্রেলটা তোমাকে ভালোবাসতো—যদিও তোমার অযোগ্য সে, তবু—"

হুভার থেমে গেল কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে। সে মুখটা তখন হয়ে গেছে কাগজের মতো সাদা। কে যোগ্য আর কে অযোগ্য—এ বিচার করছে এমন একটা লোক, যে তার চাকরির খোদ মালিক। বিচার তার খাঁটি হোক কি ঝুটা হোক—তার সামনে কল্যাণী বসে রইলো একান্ত অসহায়ের মতো। খোদ মালিকের বিরুদ্ধে কি বলবে আর সে!

তার এ অসহায়তাকে কেয়ার না করেই চাকরির মালিক বলে গেল গড় গড় করে, "যেমন করে হোক—এই ধর্মঘট থেকে ওকে সরাতে হবে, ফেরাতে হবে। যতো টাকা লাগুক—অফিস তোমাকে তা দেবে।"

"আমি!" কল্যাণী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

"হ্যাঁ—এ শুধু তুমিই পারো। তোমার একটা ভ্রূভঙ্গীই ও চরিত্রহীনটার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু পুরানো বন্ধুত্বটা তোমার একটু ঝালিয়ে নিতে হবে।"

কথা শুনে কাঠ হয়ে বসে রইলো কল্যাণী। পিতৃসদৃশ যে লোকটার ওপরে মনে মনে নির্ভর করেছিল একদিন—সে লোকটা যেন হঠাৎ তার রূপ পরিবর্তন করেছে। সহসা মনে হলো তার, সামনে যেন একটা প্রকাণ্ড দানব দাঁড়িয়ে আছে। আর সে অপেক্ষা করছে তার বিরাট একটা গ্রাসের সামনে।

"অবশ্য—এ অফিস তার জন্যে তোমাকে তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দেবে। কতো টাকা চাও, বলো।"

হায় রে হৃদয়! কবেকার সেই মনের বাঁধন।··· সেটাকে এ লোকটা যেন এক নিমেষে টেনেহিঁচড়ে এনে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে দিলে। তার ওজন কতো? দাম কতো?

"কতো চাই?" হুভার তাকালো স্থির দৃষ্টিতে।

প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয় করা। সে যেন একটা ভাড়াটে··· একটা বারবনিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই শান্ত নীরব নিরীহ মেয়েটার ভিতরে যেটুকু প্রতিরোধ শক্তি ঝিম্ মেরে ছিল, সেটা যেন তাকে ঠেলা মেরে দাঁড়া করিয়ে দিলে। সে বলতে চাইলে, "আমি এ অফিসের স্টেনোটাইপিস্ট—আর কিছু নয়। আমার কাজ কারুকে ভুলিয়ে সর্বনাশ করা নয়।" কিন্তু কিছুই সে বলতে পারলো না। ঠোঁট দুটো নড়লো অস্পষ্ট কথা-গুলোকে যেন চেপে চেপে। হুভারের ভারী মুখটার দিকে তাকিয়ে একটা পুঞ্জিত ঘৃণা মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। হায় রে, এই লোকটার ওপরে সে একদিন নির্ভর করেছিল তার স্বপ্নের ভাবীকালের জন্যে!···

হুভার বললে, "এর জন্যে বাইরে কোথাও যদি যেতে চাও"—

"না।"

"তবে?" হুভার বললে, "এ-তো শুধু একটা আমোদ!—ক'টা দিন ওকে একটু সরিয়ে রাখা। একটু ফ্রি হও—সাহসী হও, নইলে জীবনে উন্নতি করবে কি করে? জানোই তো কল্যাণী, আমি তোমার শুভার্থী।"

"আপনি কি মনে করেন—"

তার উত্তেজিত মুখটা দেখে বুদ্ধিমানের মতো সবটা এক নিমেষে বুঝে নিলে বোধ হয় বড় সাহেব। কল্যাণীর বক্তব্য ফেটে পড়ার আগেই বললে, "ঠিক আছে—অতোটা তুমি পারবে না, এই তো? বুঝেছি, যতোই হোক, ভারতবর্ষের মেয়ে ইওরোপের মেয়ে নয়।"

"আপনি আমাকে যা ভাবছেন"—গলা কেঁপে উঠলো কল্যাণীর।

"তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবছিনে মিসেস চ্যাটার্জি। আমি ভাবছি শুধু অফিসের কথা—তার মর্যাদার কথা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কাগজ কলম নাও—লেখ।"

কল্যাণী সভয়ে চেয়ে রইলো।

"নাও—লেখ। একটু মোলায়েম করে লিখবে নিশ্চয়ই—তোমাদের ভাষা তোমরাই বোঝ ভালো—আমি আর কতটুকু বাঙলা জানি।" হুভার নিঃশব্দে সহজভাবে একটু হেসে বললে, "কাল সন্ধ্যের পর নরেনকে গড়ের মাঠের পশ্চিমে—কি ধরো চাঁদপাল ঘাটে আসতে বলো একবার; এই—একটু বিশেষ কথা-টথা আছে—এই বলে আর কি।"

"কি—কি বলতে চান আপনি!" কল্যাণীর গলা কেঁপে উঠলো।

হুভার বললে, "এইটুকু লিখে তুমি ওর কাছে ওটা পাঠিয়ে দাও—তারপর তোমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। এমন কি, নির্দিষ্ট জায়গায় তোমার না গেলেও চলবে।"

কি করবে ওরা—যদি সে আসে ··· যদি সে আজ সাড়া দেয় হঠাৎ তার ডাকে!—কল্যাণীর মনে হলো—সে যেন নিজেই একটা গুপ্তঘাতকের তীক্ষ্ণধার ছুরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই উদ্যত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া তার সমগ্র বিস্মৃত অতীত যেন এক মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরলো। সেই তার প্রেম আর এই তার অর্থ নৈতিক মুক্তির চেহারা! বুক কেঁপে উঠলো তার।—

"লেখ তা হলে।"

"আমি পারবো না।" কল্যাণী আর্তনাদ করে উঠলো।

"এর জন্যেও অফিস তোমাকে টাকা দেবে। কতো চাও? তা ছাড়া আরও উন্নতি আছে। তোমার যোগ্য কর্মের সম্মান দেবে এ অফিস।"

"চাই না—টাকা চাই না আমি।" কল্যাণী শেষ মুহূর্তে রুদ্ধ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

"তোমার পদোন্নতি—তোমার সম্মান—"

একটা খ্যাপা দ্যুতি ঝলসে উঠলো ওর চোখে। কল্যাণী মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলো, "চাইনে এই সম্মান, চাইনে পদোন্নতি"—

"মিসেস চ্যাটার্জি!"

"না—আমি কাজও চাইনে আর এ অফিসে।"

"আমি তোমার শুভার্থী—এখনও বলছি, এ অফিসের সম্মান বাঁচাও, তোমার ভালো হবে।"

কিন্তু তার নিজের সম্মান? তার সমগ্র নারীসত্তা যেন শেষ মুহূর্তে এসে মাথা ঠেলে দাঁড়ালো। মাথা ঝাঁকিয়ে সে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "সম্মান—সম্মান!—সম্মান নেই শুধু আমার, সম্মান নেই শুধু একটা মেয়ের।" তারপর ঝড়ের বেগে ছুটে বেরোতে গেল সে ঘর থেকে।

হুভারের কণ্ঠস্বর বদলে গেল এক লহমায়। হুম্‌কির ভঙ্গীতে বললে, "মিসেস চ্যাটার্জি! বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ কিন্তু!"

কল্যাণী ক্রোধে আর অপমানে ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, "তাই যাবো। ওই চার শ' ক্ষুধার্ত কর্মচারীর কাছে গিয়ে বলবো—কতো বড় শয়তানীর হিসেব হয়ে গেছে আজ এই ঘরে বসে।"

"মিসেস চ্যাটার্জি!"—ধমকে উঠলো হুভার।

কল্যাণী আর দাঁড়ালো না। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। বেয়ারাটা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলো—কথা কাটাকাটি, হুভারের গর্জন। মুহূর্তে সে সরে গেল কল্যাণীর সামনে থেকে।

এমন সময় ডাক এলো ভেতর থেকে।

"বেয়ারা!"...

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ভারী অসহিষ্ণু হাতে ঘণ্টাটা বাজতে লাগলো টং টং করে।

সেদিন ঘরে ফিরে এলো কল্যাণী আচ্ছন্নের মতো। তার স্বপ্ন-দেখা চোখ আজ পাংশু—আর সাবলীল দেহভঙ্গিমায় এসেছে দুঃসহ ক্লান্তি।

সেই ক্লান্তির বোঝা টেনে টেনে সে ঘরে ফিরলো। এসে চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ অসাড়ের মতো। ছাড়লো না সে অফিসের কাপড়-চোপড়,—এমন কি পায়ের জুতোটিও। বসে বসে চোখ পড়লো তার ঘরের এক কোণে চৌকিতে সাজানো সেই পায়ের ছাপের

কাগজটা। মনে পড়লো—কবে কতো বছর আগে কে যেন এক অসূর্যম্পশ্যার পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল শেষ আলতা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল সে তার নিজের জুতোপরা দুটো পায়ের দিকে—সামান্য ছোট্ট একটু জীবনে অনেক ছোটাছুটি করে যে পা দুটো আজ শ্রান্ত ক্লান্ত, আর যেন চলতে পারছে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো কল্যাণী। জুতো দুটো পা থেকে খুলে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে কিছুক্ষণ বসে রইলো ঝিম্ মেরে। তার কানের কাছে—মর্মের কাছে কে যেন বিদ্রূপের মতো বার বার করে বলতে লাগলো: তোমার মুক্তির স্বপ্ন—তোমার অর্থনৈতিক মুক্তির আনন্দ—তোমার আত্মনির্ভরতা! ··· এই কি তার আসল রূপ?

মহামায়া তার ঘরে উঁকি মেরে থমকে গেলেন। কল্যাণীর রক্তহীন মড়ার মতো মুখটার দিকে চেয়ে তিনি যেন কেমন একটা অমঙ্গলের আশংকায় চম্‌কে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে তোর! শরীর খারাপ?"

প্রথমটায় কল্যাণীর গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হলো না—সভয়ে শুধু সে মায়ের দিকে চেয়ে রইলো।

মহামায়া চিন্তাকুটিল মুখে ঘরের ভেতরে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "কি, কথা বলছিস না যে!"

কল্যাণী নীরস গলায় বললে শেষ পর্যন্ত, "আমার চাকরি করা শেষ হয়ে গেল মা।"

"শেষ হয়ে গেল! কেন?"

"সে আমাকে জিজ্ঞেস করো না মা।" কল্যাণীর কথায় মিনতি।

"এ কী ছেলেখেলা!" মহামায়া পলকে অস্থির হয়ে উঠলেন। অসহিষ্ণু গলায় বললেন, "কি হয়েছে—বল আমাকে।"

কল্যাণী নীরবে মুখ নীচু করে বসে রইলো তবু।

মহামায়া কঠিন কণ্ঠে ফেটে পড়লেন, "হলো কী! বল!"

কল্যাণী বললে, "একদিন তুমি তো আমার এই চাকরি করা পছন্দ করতে না মা।"

কল্যাণীর চোখ শুকনো, মুখ শুকনো—কথাগুলোও কঠিন। কিন্তু মহামায়া যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওরে—সে চাইনি তোরই সর্বনাশের ভয়ে—ওই নরেনের জন্যে। কিন্তু আজ তুই সকলের সর্বনাশ ডেকে আনছিস যে হতভাগী—চলবে কেমন করে! বাঁচা এই সংসার।"

কল্যাণী নীরব। সে যেন পাথর।

"কেন—কেন চাকরি করবি নে?" মহামায়া চিৎকার করে উঠলেন আবার।

কল্যাণীর মুখে যন্ত্রণার আভাস। নিজেকে সংযত করে বললে, "ওরা আমাকে দিয়ে অন্য কাজ করাতে চায়—খারাপ কাজ মা।"

"কি কাজ—কি তাতে এমন তোর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো।"

প্রচণ্ড একটা আঘাত খাওয়া মুখে কল্যাণী তাকিয়ে রইলো মহামায়ার ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখটার দিকে। মহামায়া যেন মরিয়া—চাকরি চাই, অর্থ চাই—এ পরিবারের অচল চাকা ঠেলবার লোক চাই, যেমন করে হোক। সে মুখের দিকে চেয়ে কল্যাণী একেবারে যেন স্তব্ধ অসহায়ের মতো বসে রইলো। অসহ্য গলায় বলে উঠলো, "ওরা আমাকে দিয়ে নরেনদা-কে একটা খারাপ চিঠি লেখাতে চায়। অথবা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেখানে হোক চলে যেতে বলে।"

"তাই যা।" কেন এই যাওয়া—কি তার পরিণাম, অতো বোঝবার মতো মনের অবস্থা নেই মহামায়ার, সব সংস্কার—সব গোঁড়ামির বালাইও যেন আজ ক্ষুধার সামনে তুচ্ছ ক্ষুদ্র হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আগে বাঁচ—বাঁচা এ সংসার।"

"তুমি মা হয়ে এই কথা বলছো মা! সে যে বড় লজ্জার ব্যাপার —সে যে বড়"—অবরুদ্ধ আবেগে অসহ্য যন্ত্রণায় কল্যাণী উঠে দাঁড়ালো।

মহামায়া মরিয়া গলায় আবার বললেন, "তবে চিঠি লেখ। সে যে চিঠিই হোক—লেখ। লিখতে হবে তোকে—নইলে বাঁচবি কি করে হতভাগী?"

কল্যাণী যেন আর্তনাদ করে উঠলো, "পারবো না—আমি পারবো না।"

"পারবি না! কেন পারবি না?" মহামায়া একরোখা গলায় বললেন, "নরেন তো তোর অচেনা নয়। তবে লিখতে দোষ কি, কে জানছে?"

কেউ জানবে না। তবু অর্থের মূল্যে কেনা তার এই প্রেমের অভিনয়টুকু—যার জন্যে হুভার মোটা টাকা হাঁকতেও কসুর করেনি, সেটা আজ তার সমস্ত বিকৃতি ও বীভৎসতা নিয়ে চোখের সামনে প্রতিভাত। মনে হয়—এরা যেন সবাই আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্যে তার পবিত্র হৃদয়টা নিয়ে নোংরা হাতে টানাটানি করছে।

"না না—না।" কল্যাণী হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো এবার।

কল্যাণীর কান্না শুনে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বারান্দায় থম্‌কে দাঁড়ালো শান্তা।

মহামায়া আবার হাউমাউ করে উঠলেন, "তবে কে বাঁচাবে এ সংসার? একজন চলে গেল তার বউ নিয়ে। তুটো বাচ্চাকে মানুষ করবে কে? আর একটা ধাড়ী মেয়ে বসে আছে ঘরে। কে বিয়ে দেবে তার? ওরে, তুশ্চিন্তায় আমার যে গলা দিয়ে ভাত নামে না হতভাগী।"

কল্যাণী শুধু ফোঁপাতে লাগলো।

মহামায়া বললেন, "তবে মেরে ফ্যাল বাচ্চা তুটোকে তোর নিজের হাতে গলা টিপে—আর বিয়ের যুগ্যি ওই ধাড়ী বোনটাকে বল, তার বিষ নিঃশ্বাসে এ সংসারে আর অকল্যাণ ডেকে না এনে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ুক। তাই বল—তাই বলে দে তুই।—কি পাপ সব জন্মেছিল আমার পেটে, হা ভগবান!" অভিসম্পাত দিতে দিতে মহামায়া নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দোর দিলেন।

শান্তা দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। এ সংসারে সে একটা বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস—অকল্যাণ, মায়ের এ কথাটা প্রচণ্ড আঘাত করলে তার অভিমানে। মনে মনে বললে—কালই চলে যাবে সে অবনীর

বাসায়—সুঃখের সেই স্বর্গে। আর কানে বাজতে লাগলো তার নরেনের পুরুষ কণ্ঠের আশ্বাস :

"হবে—হবে—হবে।"

না, সে আর ভয় করে না।

৩১

শান্তা পরের দিন চলে এলো অবনীর বাসায়। হাতে খবরের কাগজের মোড়কে শুধু খান দুই শাড়ী।

অবনী বললে, "কি রে, এমন অসময়ে?"

শান্তা বললে, "ও বাড়ির পাট তুলে দিয়ে চলে এলুম দাদা।"

"শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি চলে এলি?"

"ও বাসায় আর থাকতে বলো না দাদা। আমি নাকি অকল্যাণ, আমার নিঃশ্বাসও বিষ।"

"কে বললে—কল্যাণী?"

"মা।" শান্তা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "দিদিও কি আর মনে মনে ওই বলে না ভাবো?"

সুধার দিকে চেয়ে অবনী চুপ করে গেল।

সুধা জিজ্ঞেস করলে, "মায়ের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করেছ না-কি?"

"আমি কেন করতে যাবো।" শান্তা বললে, "কাল বাড়ি ফিরে শুনলুম—দিদির সঙ্গে মায়ের কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি চলছে। সেই সব নিয়েই বোধ করি দিদি আর অফিস গেল না। ও বাড়িতে আর আমায় ফিরে যেতে বলো না দাদা।"

অবনী বললে, "থাক তবে। কিন্তু ওদের মতলবটা কি?"

শান্তা ঠোঁট উলটে বললে, "কে জানে।"

সুধা জানতে চাইলো, "মায়ের সঙ্গে কল্যাণীদির ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়নি তো?"

শান্তা অশান্ত গলায় বললে, "মায়ের আদরের মেয়ে—তার কোনো খবর আমি জানি না বউদি। ওদের বড়লোকী মেজাজের

আমি নাগাল পাইনে।" শেষে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, "তুমি বরং একটা চিঠি লিখে সব খবর নাও—তুমি তো চিঠিপত্র লেখ।"

সুধা আর অবনী মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলে—কেউ আর কোনো কথা বললে না।

আপাতত ও প্রসঙ্গ চাপা পড়লো।

সারাটা দুপুর মনে মনে অপেক্ষা করে রইলো শান্তা। হাজার সাজানো কথায় নিজেকে সে প্রস্তুত করে রাখলো—যে কথা সে আজ বলবে নরেনকে। বলবে—নরক থেকে সে মুক্ত হয়ে এসেছে। বলবে যেমন করে হোক, তার সেই দুঃখের—কষ্টের স্বর্গের জন্যেই চলে এসেছে সে ঃ সেইটেই তার জীবনের ধ্রুব সত্য। দীর্ঘদিনের কামনা।

আস্তে আস্তে বিকেলের ছায়া যতো মলিন হয়ে আসতে লাগলো, ততো অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলো সে। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলো সে গলির দিকে চেয়ে—কখন একটা পরিচিত পদশব্দ শোনা যাবে ··· শোনা যাবে একটা পুরুষ কণ্ঠ।

শেষ পর্যন্ত শান্তার সেই বিকেল এলো।

নরেনের ক্লান্ত গলা শোনা গেল বাইরে, "অবনী আছ ?"

বুক কেঁপে উঠলো শান্তার। ধড়মড় করে সে উঠে দাঁড়ালো।

অবনী বললে, "এসো নরেন।"

নরেন ঘরে ঢুকলো।

অবনী চমকে উঠলো নরেনের চেহারা দেখে। সে যেন ঝড়ে-পড়া একটা ভাঙা জাহাজ। তার চোখে মুখে কেমন একটা ভাঙাচুরো ক্লান্তি। তার মধ্যেও সে যেন স্তব্ধ—ধ্যানস্থ। সবটা জুড়ে কেমন একটা অনিবার্য অসহায়তা ফুটে বেরিয়েছে তার পুরুষ কঠিন মুখে আজ।

তার মুখের দিকে চেয়ে অবনী বললে, "ছাঁটাই লিস্টে আর ক'টি নাম যোগ হলো ?"

"পুরো লিস্ট বলা যায় আজই বেরুলো।"

"তোমার নাম ?"

"এক নম্বর।"

এটা প্রত্যাশিত। তবু চুপ করে রইলো সব ক'জনেই।

"কিন্তু আজ আর ওইখানেই থামলে চলবে না অবনী—আরও একটা জিনিস জানার আছে।" নরেন ম্লান হেসে বললে, "দ্বিতীয় নাম কার জানো ?"

জিজ্ঞাসু চোখে চাইলো সবাই।

নরেন বললে, "কল্যাণী।"

"কল্যাণী !" ...

এটা অপ্রত্যাশিত। সব ক'জনকেই বিস্ময়াহত স্তব্ধ করে দিলে।

শুধু শান্তা সকৌতুকে বলে উঠলো, "নরেনদা এমন সব মজার কথা বলেন !"—

নরেন তেমনি গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে বললে, "কথাটা চমকে ওঠার মতোই বটে।"

অবনী বলে উঠলো, "কল্যাণীর তবে চাকরি নেই আর ?"

শান্তা বললে, "না থাকলেও দিব্যি চলে যাবে। টাকা তো কম জমায়নি।"

শান্তার কথা চাপা দিয়ে অবনী বলে উঠলো, "তুই থাম শান্তা। কি বলছো তুমি নরেন—বুঝতে পারছিনে।"

"হ্যাঁ, তোমাদের মতো—আমার মতো সকলেই ভেবেছে, যেন ঠাট্টা। কিন্তু এতো বড় সত্যি, আর অবাক কাণ্ড—বিশ্বাস না করবারই কথা বটে।"

সুধা দুটো স্থির গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালো অবনীর দিকে। অবনী চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার বুকের মধ্যে একটা বিস্মৃত আবেগ যেন বহু দিন পরে আবার ধীরে ধীরে মাথা ঠেলে উঠছে। অস্থির গলায় সে শুধু বললে, "একটু খুলে বলো নরেন—আমি বুঝতে পারছিনে কিছু।"

"প্রথমটায় আমিও কিছু বুঝতে পারিনি অবনী।" নরেন আস্তে আস্তে বললে, "সবটা ভুল বুঝেছি আমি—আমরা সবাই, কেউই বুঝতে পারিনি তাকে। দারিদ্র্যের জ্বালায় প্রতিহিংসায় ক্ষোভে অফিসের সবাই কম অন্যায় করিনি তার ওপরে। নানা কুৎসিত কথায় বিঁধেছি তাকে প্রতিদিন।"

"সে সব তবে মিথ্যে?"

"তার চেয়ে বড় মিথ্যে আর কি হতে পারে অবনী?" নরেনের মুখে যন্ত্রণার আভাস। আত্মগত ভাবে সে বলে উঠলো, "ভেবেছিলুম—সে একেবারে মরে গেছে। কিন্তু না, মরেনি সে। সে বেঁচে আছে তার সব মর্যাদা সব গৌরব নিয়ে।"

তার কথা—তার সেই তদ্গত মুখের দিকে চেয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল শান্তার মুখ। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না আর। মনে হলো, জিভটা যেন তার ভেতরের দিকে টেনে ধরছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের সামনের দৃশ্যমান বস্তুগুলো। কোনো রকমে শক্ত হয়ে বসে রইলো সে।

অবনী পায়চারি করতে লাগলো ঘরময় অস্থিরভাবে। তারপর হঠাৎ নরেনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "চাকরিটা তার ঠিক কেন গেল?"

নরেন বললে, "বড় সাহেবের বেয়ারা নাকি কাছাকাছি কোথায় ছিল—হুভারের সঙ্গে ওর সব গরম কথা কাটাকাটি শুনেছে। বেয়ারাও বলতে পারলে না ঠিক। কি সে-সব জানিনে, তবে কিছু একটা হয়েছে। তাতে আমাকে সে কতখানি বাঁচিয়েছে জানিনে, তবে বাঁচিয়েছে সে নিজেকে—বাঁচিয়েছে এ দেশের গোটা মেয়ে জাতটার সম্মান।"

সুধা দম বন্ধ করে শুনছিল—বললে, "তারপর?"

নরেন বললে, "সে না-কি চাকরি ছেড়ে দেবে—বড় সাহেবের কাছে এই বলে চলে এসেছে। কিন্তু তার ব্যাপারে টনক নড়ে উঠেছে ওদের। ধর্মঘট আর না বাড়তে দিয়ে আপোস করার শর্ত পাঠিয়েছে।"

"তবে তো সব গোলমাল চুকে গেল।" অবনী বলে উঠলো।

নরেন বললে, "না অবনী, ওদের শর্ত হলো—সব দাবীই ওরা আমাদের মেনে নিতে রাজি আছে বটে—কিন্তু শুধু কল্যাণী ছাড়া। অফিসের কাজে সে নাকি বিপজ্জনক, অবিশ্বাসী—"

"শুধু কল্যাণী—শুধু কল্যাণীর চাকরি থাকবে না!" অবনী কেমন একটা যন্ত্রণায় সারা ঘর আবার পায়চারি করতে লাগলো। নরেনের সামনে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাদের ইউনিয়নের কি মত—কি বলে সবাই?"

নরেন চিন্তাকুটিল কপাল তুলে বললে, "আজ রাত্রে তারই জরুরি মিটিং আছে অবনী।"

শান্তা যেন আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বলে উঠলো, "তোমাদের কথার মাথা মুণ্ডু আমি কিছুই বুঝিনে। কি জানি বাবা! এই বড় সাহেবের মোটরে মোটরে ঘোরা, এই রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরা—এই ঘন ঘন মাইনে বাড়া—"

নরেন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইলো শান্তার মুখের দিকে। তারপর ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, "ছিঃ, এত অপবিত্র মন তোমার শান্তা!"

"কি আমার—" একটা সুতীব্র কঠিন আঘাতে শান্তা যেন আর্তনাদ করে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

নরেন তেমনি ঘৃণাভরা কণ্ঠে বললে, "অপবিত্র, নোংরা—জঘন্য। তোমার দিদিকে তুমি চেন না শান্তা।"

শান্তা এক পলক চোখ বুজলো—মনে হলো, তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। তার বহু স্বপ্ন-কামনায় গড়া সৌধটা ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে।

কল্যাণী নির্মল—কল্যাণী তার মর্যাদায় গৌরবে তেমনি দীপ্তিময়ী: এই কথাটা অবনীকে যেন আবার অস্থির করে তোলে আজ অনেক কুৎসিত মিথ্যার পরে। তার ভেতরের মাথা ঠেলা আবেগটা তাকে যেন ঠেলে তুলে দিয়ে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেবলি

পায়চারি করিয়ে বেড়ালো। হঠাৎ ভরা গলায় বলে উঠলো সে, "সে খাঁটি—সে সাচ্চা, তোমরা কেউ বোঝনি তাকে। আমি জানতুম, সে অতো সহজ নয়—অতো সস্তা নয়।"—

"ইউনিয়নের মিটিং-এ আজ কি হবে জানিনে। তার ওপর নির্ভর করছে তার সঙ্গে আমার দেখা করা। হয়তো কাল সকালে আমাকে যেতে হবে।" নরেন বললে, "কিন্তু কোন মুখে দাঁড়াবো গিয়ে আমি তার কাছে, অবনী।"

সুধা স্থির গলায় বললে, "আমি যাবো।"

সে মুখের দিকে চেয়ে অবনী অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলো, "তাই চলো সুধা—এ বাসা তুলে দিয়ে চলে যাই কাল সকালে।" অবনীর গলা ফেটে পড়লো তার সহজ ভাবাবেগে, "অনেক দিন এক সঙ্গে চলেছি, স্বপ্ন দেখেছি, মানুষ হয়েছি—আজ সে একা পড়ে গেছে ; মিলু বিলু শান্তা—সবাইকে আমি তার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি!" বলতে বলতে বিক্ষুব্ধ অনুশোচনায় দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো এই উচ্ছ্বাসবহুল লোকটার। নরেনের একটা হাত চেপে ধরে বললে, "তোমরা জানো না নরেন—সে আমার কতোখানি মন জুড়ে আছে। এ বাসায় এসেও সে আমাকে অস্থির করে তুলেছে প্রতিদিন। জানো, আসবার সময় সে বলেছিল—তুমিও ভুল করবে দাদা। দিনের পর দিন নানা কথা শুনেছি তোমাদের মুখে আর প্রতিটা দিনই মনে পড়েছে তার সেই কথা।"—

এই দু'টি বন্ধু গভীর অনুশোচনার স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

অবনী বললে, "তোমরা অনেক কথা বলে গেছ দিনের পর দিন, ভুল বুঝিয়েছ—ভুল বুঝেওছি নিজে। কিন্তু রাগের মাথায় যাই ভাবি আর যাই করি, মনে মনে জানতুম—সে কী।"

সুধা বললে, "আমি জানি, আমার চেয়ে তুমিও তা বেশী জানো না।"

এই ক'জনের বিক্ষুব্ধ আবেগের বিস্ফোরণের মাঝখানে শান্তা যে কখন উঠে গেছে—কেউ জানে না। শুধু একপাশে পড়ে আছে তার কাগজে জড়ানো সেই শাড়ীর বাণ্ডিলটা।

অবনী অশান্ত ভাবে আবার পায়চারি করতে লাগলো।

নরেন উঠলো—বললে, "আমি যাই অবনী। আমার মিটিং আছে। কাল সকালে তোমরা তা হলে যাচ্ছ ?"

"যাচ্ছি বৈ কি নরেন, পারলে আমি আজই ছুটে যেতুম।" ভেতরের একটা চাপা যন্ত্রণার তাড়নায় সে আবার বলে উঠলো, "আজ একেবারে একা পড়ে গেছে সে—কি করছে, কি ভাবছে, কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"আমি যাই।"—নরেন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ও-বাসা থেকে বিদায় নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলো সে। আজ একা—সঙ্গে শান্তা নেই, এ কথাটা একবার তার মনেও পড়লো না। পথ হাঁটতে লাগলো অন্যমনে। তার আশা বিশ্বাস আর স্বপ্ন-কামনার নষ্ট অতীত মোহের দিন আবার ফিরে এসেছে বহুদিন পরে। তার হঠাৎ আলোর ঝলকে সে যেন স্তব্ধ—দিশাহারা।

৩২

অনেক অতন্দ্র রাত্রির মতো এ-ও একটি রাত কল্যাণীর। আজও সে বিনিদ্র—তন্দ্রাহীন, শুধু নেই আর তার স্বপ্নদীপ্তি। বরং সবটা দুঃসহতায় ভারাক্রান্ত। কালি ঢালা অন্ধকারে তার আঁকা ছবিগুলো সব আজ ঢাকা পড়ে গেছে কোথায়। মিলু বিলুর যে ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দূরাগত এক ভাবীকাল উজ্জ্বল হয়ে উঠতো একদিন—সে জায়গায় দেখে সে আজ দুর্বহ দায় আর দায়িত্ব : ওই কচি মুখ দুটোয় তার যেমন করে হোক দু'মুঠো অন্ন যোগাতে হবে। আর সেই অরক্ষণীয়া শান্তা—তার বোঝা তাকে বহন করতেই হবে। নিরম্বু উপবাসক্লিষ্ট মহামায়ার মুখে কঠিন আদেশ : চাকরি করতে

হবে—বাঁচতে হবে। আর অফিসে ছভারের সেই ভারী গম্ভীর মুখটা —তার নির্দেশ তাকে মানতেই হবে। হায়রে, কোথায় গেল তার মুক্তির উদ্বেল আনন্দ—স্বপ্নব্যাকুল মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ। বরং সবটা আজ দুঃসহ বোঝার মতো চেপে ধরেছে তাকে। নিঃশব্দ তরঙ্গে ফুলে ফুলে কিছুক্ষণ কাঁদলো সে। রাত তখন গভীর।

অশ্রুসিক্ত চোখে যেন সান্ত্বনার আশায় কল্যাণী একবার মুখ তুলে তাকালো আলতা-পরা পায়ের ছাপটার দিকে। মা মহামায়া বলেছিলেন—"ওইখানে আছে তোর সব সান্ত্বনা, সব সাহস।"

মায়ের সতীধর্মের আদর্শ!—যার অলিখিত বিধান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিরোধার্য করে গেছে শুধু এ বাড়ির বউরাই নয়, আরও হাজার হাজার মেয়ে। কিন্তু জীবনে যে কাউকে পেল না, তার কাছে ও দুটো পায়ের ছাপ বেদনা, আঘাত আর শূন্যতা ছাড়া কি দিতে পারে? তার কাছে ওটা আশ্রয় নয় বরং যেন তার একটা দুর্বহ যন্ত্রণারই প্রতীক।

কোথায় সান্ত্বনা? বরং ওই দুটো পায়ের ছাপের ওপর হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে, অগ্নিদগ্ধ—আর্তনাদে ভয়ংকর একটা অপরিচিত মুখ। সে কোন সুদূর অতীতের নারীকণ্ঠের সুতীব্র এক আর্তনাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায় আজকের কালের স্টেনোটাইপিস্ট কল্যাণী চাটুজ্যের অবরুদ্ধ কান্নার তরঙ্গ। তফাৎ কোথায়? শুধু অত্যাচার, বাঁধন আর পীড়নের ধরনটা আজ পরিবর্তিত। একটু পালিশ করা—তাই সূক্ষ্ম। মুক্তি কোথায়! শান্তি কোথায়! সান্ত্বনা কোথায়! বহু স্তর পার হয়ে এসেও কান্নায় অভিশপ্ত চিরকালের সেই এক নারী।

না, সে বিশ্বাস করে না আর মোহাচ্ছন্ন অতীতে—বিশ্বাস করে না পালিশ করা বর্তমানে! আর ভাবীকাল,—আজকের অন্ধকার রাতটার মতোই কালি-ঢালা, দুঃসহ দুর্ভার। একমাত্র যন্ত্রণা ছাড়া তার কোনো রূপ, কোনো আশা বা আশ্বাস তার চোখে পড়লো না।

চোখ পড়লো বাবার ছবিটার দিকে—তার নীচেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের পোশাকে তোলা তার ছবি, অবনীর ছবি। মনে

পড়ে বাবার কথা। বলেছিলেন—শিক্ষার কথা—মুক্তির কথা। স্বপ্ন দেখেছিলেন সারাজীবন ধরে—সুখী সুস্থ সবল এক বংশধারার। সেই কথা মনে করে একটা ব্যর্থতার বেদনা ও বিদ্রূপ ছাড়া কিছুই মনে আসে না আর।

বাবার ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলায় সে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে—"বলে দাও, বলে দাও, কি করবো আমি। কি করবো—"

সারাটা রাত কেটে গেল তার ছটফট করে।

তারপর সুড়ঙ্গের মতো এ গলিটার অন্ধকার পাৎলা হয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে—কোথায় কোন মেঘমুক্ত আকাশের প্রান্তে ভোর হচ্ছে এখন, তা দেখা যায় না এ গলি থেকে। সেই আলোর রং ফেরার দিকে চেয়ে বসে রইলো কল্যাণী: কতো অজস্র অতীত যেন মনে পড়ে এই ভোরের রং ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। জীবন ছিল ··· আশা ছিল ···স্বপ্ন ছিল ···

অতন্দ্র রাতের সমস্ত গ্লানি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো সে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে—জ্বালা করছে চোখ দুটো। দরোজা খুললো।

দরোজার কড়ায় গোঁজা কি একটা কাগজ উড়ে পড়লো মেঝেতে। শান্তার হাতের লেখা। তুলে ধরলো চোখের সামনে। শান্তা লিখেছে:

> দিদি, তোমার স্বপ্ন ও সাধ সার্থক হোক এই প্রার্থনা করি। আমি শুধু একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই বোঝাটা সরিয়ে নিয়ে গেলুম।

নানা আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো কল্যাণীর। প্রথমেই ছুটলো সে মহামায়ার ঘরে। শান্তা নেই। আর্তনাদ করে ডাকলো, "মা—শান্তা কই। শান্তা—"

ছুটলো সে বাইরের ঘরে। দরোজা যেমন বন্ধ থাকে, তেমনি আছে। কাল অনেক রাত করে ফিরে এসেছে—এ সে জানে। কিন্তু কোথায় গেল সে! কেমন একটা গভীর আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো তার। ছুটে গেল বাথরুমের দিকে।

ভেজানো দরোজাটা ঠেলে আর্তনাদ করে উঠলো কল্যাণী।

আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় শান্তার বিশ বছরের বহু আয়োজন ও পুঞ্জিত কামনার দেহটা ঝুলছে দেওয়ালের গায়ে।

মহামায়া মাথা কুটছেন তাঁর আজন্মের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা আউড়ে আউড়ে। ভয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে মিলু বিলু। চেঁচামেচিতে জেগে উঠেছে পড়শীরা। আসছে দু'একজন করে। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি।

কল্যাণীর চোখ মুখ যেন পাথর হয়ে গেছে। শান্তার চিঠিটা আর একবার তুলে ধরলো তার চোখের সামনে। একটা লাইন আগুনে পোড়ার জ্বালা ধরিয়ে দেয় তার মনে—"দিদি, তোমার স্বপ্ন ও সাধ সার্থক হোক।"—

"স্বপ্ন ও সাধ!"···

কথাটা যেন একটা সুকঠিন বিদ্রূপ ও অপমানের মতো ঘিরে ধরে তাকে চারদিক থেকে। মিলু বিলুর ভয় পাওয়া ফ্যাকাশে মুখ—তারা যেন নিঃশব্দে বলছে, কি করবে বলেছিলে যেন আমাদের নিয়ে?··· সেই পায়ের ছাপ, বাবার ছবি, তার ছবি, অবনীর ছবি—ঘরের প্রতিটি আনাচে-কানাচে স্বপ্ন আর সাধ কথাটা যেন ব্যঙ্গের মতো ঘুরছে। এই ঘর তার অনেক কল্পনা—অনেক স্বপ্নের সাক্ষী। দেখতে দেখতে একটা খ্যাপামী তার অগ্নিবর্ণ দ্যুতি নিয়ে ফুটে ওঠে কল্যাণীর চোখে।

সেই অগ্নিদ্যুতি নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে প্রথমেই—নিজের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেওয়া ছবিটার ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "মুক্তি!—ভাবীকালের সুস্থ ও সুখী জীবন। স্বপ্ন দেখেছিলে?"—টেনে ছিঁড়ে আনলো ফটোটাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "আত্মপ্রবঞ্চনা!" ফটোটাকে আছড়ে দিলে মেঝের ওপরে। ঝনঝন করে উঠলো কাচ ভাঙার শব্দ।

তারপর খ্যাপা দৃষ্টিতে তাকালো পায়ের ছাপটার দিকে। ব্যঙ্গভরে মনে মনে বললে, "এই না-কি সান্ত্বনা—শেষ আশ্রয়।"—

ফুঁসে উঠলো সে, "মিথ্যে কথা!" টান মেরে আনলো সে পায়ের ছাপখানা—সেটাকে ছিঁড়ে ফেললে কুটি কুটি করে। ঝন্‌ঝন্‌ করে ছত্রখান হয়ে পড়লো পূজার উপাচার—ধুনুচি, ধুপদান, ফুলের মালা।

তারপর খ্যাপা চোখে খুঁজতে লাগলো সে—আর কি করবে—আর কোন মিথ্যার আশ্রয়গুলোকে আজ সে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেবে!

"স্বপ্ন আর সাধ!"···

বহু স্বপ্ন ও কল্পনার সাক্ষী এই ঘর—এই পরিবেশ, তার সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বেলে দিলে।

ছুটে গিয়ে সে একটা ছোট স্যুটকেস খুললো। কয়েকটা কাপড়-জামা টেনে গুছোলো। হঠাৎ সেগুলোর মধ্যে থেকে ঠক করে মেঝের ওপর পড়লো একটা ছোট ফটো। আগুন চোখে তাকালো কল্যাণী—ছবিটা নরেনের। তার হাসি হাসি মুখটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হলো—সে যেন আজও বলছে—"মুক্তি—তোমার অর্থ নৈতিক মুক্তি! তোমার মর্যাদা—তোমার আনন্দ!"··· কথাগুলো আজ যেন তাকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করে। দাঁতে দাঁত চেপে কল্যাণী ফুঁসে উঠলো আবার, "মুক্তি! আনন্দ! শেকলে বাঁধা কুকুরের আনন্দ!" ফটোটাকে সে ছিঁড়ে ফেললে কুচি কুচি করে। তারপর দ্রুত হাতে স্যুটকেস গুছোতে লাগলো।

এ ঘরে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার স্বপ্ন আর সাধের সুকঠিন বিদ্রূপ নিয়ে এখানে যেন সে এক মুহূর্তও আর বাঁচতে পারবে না। এখান থেকে এখন ছুটে পালাতে পারলে সে বাঁচে।

৩৩

অবনী ঠেলাগাড়ি ডেকে তার ঘরের জিনিসপত্র বোঝাই করছিল—এমন সময় পাড়ার একটি ছেলে ছুটে এসে খবর দিয়ে গেল, শান্তা গলায় দড়ি দিয়েছে।

"শান্তা!"—অবনী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

সুধা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আর কল্যাণীদি ?"

ছেলেটি বলতে পারলো না।

অবনী হতাশ চোখে তাকালো সুধার দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "সুধা !"

"চলো তাড়াতাড়ি, জিনিসপত্র এখন থাক পড়ে—আগে ট্যাক্সি ডাকো।" সুধা তাড়া দিল, "কালকের আঘাত সহ্য করা শান্তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে-সব কথা বলবো তোমাকে পরে। যাও তাড়াতাড়ি—এখন আমার কেমন ভয় করছে কল্যাণীদির জন্যে।"

অবনী বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ডেকে আনলো।

উন্মুখ আগ্রহে গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল সুধা। ট্যাক্সি আসতেই সে ছুটে গিয়ে উঠে বসলো। দম চেপে বললে, "তাড়াতাড়ি যেতে বলো।"—

কলকাতার শহর তখনো ভালো করে জেগে ওঠেনি। সেই জনবিরল ফাঁকা রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে অতীত কয়েক মাসের ঘটনা যেন দ্রুত ভেসে যায় অবনী আর সুধার চোখের সামনে দিয়ে। কারুর মুখেই আর কথা যোগায় না। একান্ত নিঃশব্দে দু'জনকেই হানা দেয় বারবার শান্তার মুখটা। হানা দেয় কল্যাণীর কথাও—যে তার অনেক সাধ আর কল্পনা নিয়ে কোনোদিকই শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারলো না। সমস্তটার আঘাত সহজ অবনীর মনে বড় তীব্র হয়ে বাজে আজ। নির্মম কাল তার সমস্ত দুর্ভার আর দুঃসহতা দিয়ে ঘিরে ধরে যেন তাকে—তার মাঝখানে পড়ে ব্যাকুল চোখে চেয়ে থাকে সে। না, কিছুই তার করায়ত্ত নয়—শুধু তার আশা ছাড়া, বুকের গোপন গভীরের স্বপ্নগুলি ছাড়া।

অবনীর অস্ফুট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো, "শেষ কালে শান্তা এই রকম একটা করে ফেললে!" …

সুধা স্থির গলায় বললে, "মনে মনে সে অনেক বেশী আশা করেছিল। নরেনবাবু তাকে হতাশ করেছেন। সে-সব কথা পরে শুনো। মেয়েদের পাগল করা অন্ধ ঈর্ষার তুমি কিছুই জানো না।"

মুক্তির অনেক বড় বড় ধাপ্পা। চরম করে বুঝেছি—মায়ের সেই সতীর পায়ের ছাপের মতো কানাকড়িও যার মূল্য নেই। মানিনে—আর কিছুই মানিনে আমি।"

নরেন কখন এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল—অধৈর্য হয়ে এগিয়ে এলো সে বারান্দার দিকে। তাকে দেখে কল্যাণীর চোখ যেন দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো। হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ওই লোকটার বহু দিনের বহু গালভরা কথা। তীব্র বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে আবার বলে উঠলো সে, "অর্থনৈতিক মুক্তি, আত্মমর্যাদা—জীবনের আনন্দ!" ··· ফুঁসে উঠে বললে, "শেকলে বাঁধা কুকুরের আনন্দ ··· টাকার মূল্যে কেনা যতো মানুষের পণ্য! ওই ভণ্ডামীর ধাপ্পায় আর ভুলিনে।"

"ভুলো না কল্যাণী।" নরেন স্থির অবিচলিত গলায় বললে, "যা মিথ্যে, মেনে নিও না তাকে তুমি। পরম সত্যি বলে যাকে বুঝেছ—তাই দিয়ে গড়ে তোলো তোমার ঘর। আমি এসেছি তোমার চারশো সহকর্মীর বুকের জোর আর মনের সাহস নিয়ে। তুমিই এবার ভিৎ গেঁথে দাও সেই ঘরের—যেখানে তোমার বাবার আত্মবঞ্চনা থাকবে না, তোমার মায়ের ব্যর্থ সংস্কার থাকবে না, শান্তার মতো মিথ্যে সুখ-দুঃখের ধারণাও থাকবে না।"

নরেন এগিয়ে এলো আরও কাছে—সামনাসামনি। চোখে চোখে তাকালো কল্যাণী—চোখে ওর সেই খ্যাপা দীপ্তি, উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। অবিচলিত নরেন এগিয়ে এসে মুঠো করে ধরলো ওর একটা হাত। ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "যে ঘরের জন্যে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে, আমিও অপেক্ষা করে আছি, গড়ে দাও তুমি সেই ঘর। আমাকে ক্ষমা করো। আজ আমি সময় অসময় মানিনে, শুভ-অশুভ মানিনে—দু'হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে।"—

নরেনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অগ্নিদ্যুতি যেন বাষ্প হয়ে এলো কল্যাণীর চোখে, এতক্ষণে জল নেমে এলো ওর চোখের কোণ বেয়ে।

কেঁপে উঠলো অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকানো একটা বেদনার জমাট পাহাড়। তারই উৎক্ষেপে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো তার মন। হঠাৎ মনে হলো—চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা যেন দুলে উঠলো। তার মধ্যে স্থির ভাস্বর হয়ে আছে শুধু একটি লোক—দাঁড়িয়ে আছে তার মহাগ্রহের মতো গোটা জীবনটাকে আলোকিত করে, হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে সে মহাভিক্ষুর মতো। তাকে ফেরাবার শক্তি আজ তার আর নেই। দু'হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো কল্যাণী। টলে পড়ছিল—অবনী ধরে ফেললে দু'হাত দিয়ে।

মহামায়া তখন মাথা কুটছেন তাঁর ঠাকুরের সামনে। আর কল্যাণীর ঘরটা তারই ব্যর্থ ভ্রষ্ট অতীতের মতো ভাঙাচোরায় ভরা। ছেঁড়া ছড়ানো কাগজপত্র-ছবি, কাচের টুকরো, ভাঙা ফ্রেম। তার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে ধুনোচি ধূপদান আর শুকনো ফুলের মালা। এখানে ওখানে কয়েকটা পুরানো ভাঙা বাক্স টানা—সবটা এলোমেলো ভাঙা ঘরের মতো। তারই মধ্যে পড়ে আছে শান্তার চিঠিটা।

তারপর হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে ঢুকলো সে ঘরে। ঘুরপাক খেতে লাগলো ছেঁড়াটুকরো কাগজের জঞ্জাল। তার মধ্যে ঘুরতে লাগলো শান্তার চিঠিটা—যেন একটা ভুতুড়ে কাগজ। উড়ে উড়ে পড়ছে এখান থেকে ওখানে—এ-কোণ থেকে ও-কোণে পথভ্রষ্ট ক্ষুধার্ত প্রেতাত্মার মতো।

৩৪

স্তব্ধতা শুধু ক'টা দিনের জন্যে, শূন্যতা শুধু একজনের জন্যে। এ শহরের দুরন্তবেগ জীবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় তার কথা! দুর্যোগের ঝাপ্টা কেটে আবার একালের প্রতিদিনের মতো ভোর হলো অবনীদের ঘরে—ভোর হলো আবার এ গলিতে। ভোর হলো এ শহরের লাখ লাখ মানুষের।

দশটা বাজতে না বাজতে খালি হয়ে যায় এ গলির ঘরগুলো। গলি ছেড়ে বেরোয় কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়। শুধু পুরুষ নয়—শতাব্দী-উত্তীর্ণ এ কানাগলি থেকে বেরোয় আজ মেয়ে-বউও।

আগে খালি হলো কল্যাণীর ঘর। নরেন আর তার অফিসের কয়েকজন সহকর্মী এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেল কল্যাণীকে। শূন্য ঘরটা ঝিম্ মেরে রইলো স্তব্ধতায়। তার সরু সরু ইটের পাঁজর থেকে সুদূর অতীত শতাব্দী যেন ঠাণ্ডা চোখ মেলে দেখলো : শেষ পর্যন্ত এ বাড়ির সেই মেয়েও গেল চাকরির লড়াই করতে! ···

তারপর খালি হলো সুধার ঘর। সুধা ইস্কুলে গেল মিলু বিলুকে সঙ্গে নিয়ে। এ ঘরটাও ঝিমোতে লাগলো তার শতাব্দী শীতল স্তব্ধতায় : শেষ পর্যন্ত ঘরের বউও বেরিয়ে গেল রোজগার করতে! ···

বাকি শুধু মহামায়া। তিনি আছেন বটে কিন্তু তাঁর ঘরে সাড়াশব্দ নেই। স্মৃতির সামনে সুদূর অতীত মেলে দিয়ে পাথরের মতো একভাবে বসে আছেন তিনি। গোটা বাড়িটা তাঁরই মতো নিঝুম নিস্তব্ধ—আর তার ঠাণ্ডা পায়ের তলায় মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ জনবিরল গোটা কানা গলিটাই পড়ে রইলো প্রাগৈতিহাসিক অজগরের মতো। তার ছায়া-ছায়া কালো চোখ মেলে সে-ও যেন মহামায়ার মতো, শতাব্দী-উত্তীর্ণ পুরানো বাড়িটার মতো চেয়ে আছে শূন্যে—বিলীয়মান, অদৃশ্য, স্বপ্নের মতো অতীতের দিকে। ক্বচিৎ এক-আধটা ফিরিওয়ালার ক্লান্ত ডাক শোনা যায়—মুহূর্তে চকিত হয়ে ওঠে সারা গলিটা। তারপর আবার ঝিমোয় শতাব্দীর পুরাতন স্বপ্নে, পুরাতন, নোনাধরা বাড়িগুলোর ছায়ায় ছায়ায় :

··· সে কতদিন আগে, এই পথ দিয়ে না একদিন পাল্কীতে এসেছিল সেই যে আট বছরের একটি বউ! ··· পরনে লাল চেলি, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর হাতে ছিল তার কাজললতা। এসেছিল আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায়। গ্রাম তখনো শহর হয়নি, পায়ে চলার পথটাকে তখনো গলা চেপে ধরেনি ইট কাঠ পাথরে। তাই দক্ষিণের এক জলার ধারে উঁকি মেরে সে দেখতে পেয়েছিল—পাঁচ-ছ' বছর

যেতে না যেতে সেই সতীলক্ষ্মী বউটি একদিন এসে দাঁড়ালো জলার ধারে। আবার যেন সাজিয়েছে তাকে বিয়ের কনের মতো। কপাল ভরে দিয়েছে সিঁদুর, পা ভরে দিয়েছে আলতা। চোখের জল মুছতে মুছতে তুলোট কাগজের ওপর কে যেন তার পায়ের ছাপ নিয়ে কপালে ঠেকালো। তারপর সে চলে গেল জলার ওপারে—শ্মশানে। জলার এপারে দাঁড়িয়ে এয়োরা করলো শঙ্খধ্বনি। তারপর দেখেছিল সে চিতাগ্নির শিখা। খোল করতাল আর ঢাকঢোলের শব্দেও চাপা পড়েনি—এমন একটা দিগন্তভেদী চিৎকারে হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল সে, কেঁপে উঠেছিল তার দু'পাশের আমবাগানের হাওয়া। সতীলক্ষ্মী বউটি সেই যে গেল—আর তো ফিরে এলো না সে কোনো দিন। ···

আরও অনেক—অনেকদিন পরে সেই ঘরে এলো আবার একটি বউ। ফুটন্ত পদ্মের মতো ডাগর মেয়েটি। বিয়ে হয়েছিল বুড়ো বরের সঙ্গে—স্বামীর বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ। তবু তার মুখে ছিল না অসন্তোষের এতটুকু ছায়া। কোন গাঁয়ের কোন অরক্ষণীয়া মেয়ে—আইবুড়ো নাম ঘুচেছে, এই তার ভাগ্য। বছর যেতে না যেতে কোলে এলো ছেলে। তারপর প্রতি বছরে একটি করে—কখনও বা দুটি। স্বামী বেঁচে ছিল তার দশ বছর। এই দশ বছরে দিয়েছিল সে মোটমাট তেরটি সন্তান—এই আমবাগানের ছায়ায় অনেক প্রজার বসতি। তবু কাঁদতো সে—কেন কাঁদতো কে জানে! ওই আম-বাগানের ছায়ায় মজা দীঘির ঘাটে জল আনতে আসতো সে—পেট ভরে জল খেতো আঁজলা আঁজলা করে, তারপর ভরা কলস নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে যেতো, ক্লান্ত—ক্ষুধার্ত—সন্তান-ভারাতুর! তারপর একদিন মারা গেল তার বুড়ো স্বামী। পেটে এসেছে তখন ত্রয়োদশ সন্তান। লোকজন স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল জলার ওপারে শ্মশানে। জীর্ণ কংকালসার মেয়েটা তার বারোটা ছেলেমেয়ে নিয়ে লুটোপুটি করে কেঁদেছে এই পথের ধুলোয়। তারপর কি হলো একদিন কে জানে—মেয়েটা কান্নাভেজা চোখে

নামলো দীঘির ঘাটে। সন্ধ্যে হলো—রাত হলো। একে একে সবাই চলে গেল জল নিয়ে। কিন্তু কই—সেও তো আর উঠে এলো না।

তারপর কেটে গেল আরও কতদিন। কত পরিবর্তন এলো সেই মৃত্তিকার গন্ধে আমন্থর পায়ে চলার পথের দু'পাশে। দীঘি বুজে হলো পার্ক। কেটে সাফ হলো আমের বন, এদিক ওদিক চলে গেল পিচের রাস্তা। কোঠায় কোঠায় বাঁধা পড়ে গেল সে। কানা আমতলা লেন। তারপর অনেক—অনেক দিন পরে ওই বাড়িটায় জন্ম নিলো আবার একটি মেয়ে। কতো স্বপ্ন দেখলো সে এই কানাগলির পথ দিয়ে যেতে-আসতে, কত পুরানো দিনের সাধ-আহ্লাদ মেশানো ছিল তার সেই স্বপ্নের সঙ্গে—ঘর-সংসার করবে, ছেলেপুলে হবে—একভাবে কেটে যাবে জীবন সেই পুরানো দিনের ঢঙে। কিন্তু হলো না। একালের লোকগুলো একদিন কড়িকাঠ থেকে নামালো তার বিশ বছরের যৌবনপুঞ্জিত দেহটা—নিয়ে চলে গেল মর্গে।

সারা গলিটা অপরাহ্নের বিজন স্তব্ধতায় ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে : কই সে-ও তো ফিরে এলো না আর !···

কানাগলি ছাড়িয়ে অদূরে তখন একালের গর্জমান রাজপথের দু'ধারে নগরের দুরন্তগতি সুকঠোর জীবন, দীপ্ত—সূর্যকরোজ্জ্বল আলোয় পুড়ছে।
